দ্বিতীয় পর্ব ঃ

(সাহিত্য বিচার পর্ব)

।। দ্বিতীয় পর্ব ।।

প্রথম অধ্যায়

কবি ও কবিতা

হাংরি সাহিত্যের মুখ্যতম বিকাশ কবিতার মধ্যে। ১৯৬১ সালে যে বুলেটিনটি বেরোয় তা কবিতারই ইস্তাহার। ১৯৬২ সনে 'সম্প্রতি' কাগজে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব'-প্রকাশ লাভ করে। রাষ্ট্র কর্তৃক ধরপাকড় এবং সমকালীন বঙ্গদেশে যে আলোড়নের উত্তাপ হাংরিরা সৃষ্টি করেছিলেন তার জন্য দায়ী ছিল কবিতাই। সুতরাং হাংরি সাহিত্য আলোচনায় কবিতাই হচ্ছে প্রধান উপাদান। হাংরি-কবিতাবলী সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত সংখ্যায় সুপ্রচুর। তার মধ্যে প্রধান ধারার মোটামুটি পঁচিশ বৎসরকালের উল্লেখযোগ্য ফসলগুলিকেই আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

ক. মলয় রায়চৌধুরী —

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও কবি মলয় রায় চৌধুরী। তাঁর জন্ম পাটনায়, ইমলিতলায়, ১৯৩৯ সালে। আদি নিবাস হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায়। মামার বাড়ি — যশোর। মলয়ের দাদামশায় কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। মলয়ের বাবার ঠাকুর্দা যদুনাথ বড়িশা-বেহালার সাবর্ণ চৌধুরী পরিবার থেকে বিতাড়িত হন উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় পরিবারের বালবিধবাকে বিবাহের জন্যে। এই সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকেই জব চার্ণক কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের ইজারা নিয়ে ছিলেন। মলয়ের বাবার নাম রঞ্জিত রায়চৌধুরী, মা অমিতা রায়চৌধুরী। তাঁর বাবা ছিলেন পাটনার একজন নামকরা ফোটোগ্রাফার আর্টিষ্ট। তবে তাঁর বাবা ও মা স্কুলে পড়াশুনো করেন নি। পড়াশুনোর পাট মলয়ের প্রজন্ম থেকেই শুরু। মলয় ছয় বছর পড়েন মিশনারি স্কুলে। তারপর ম্যাট্রিক পর্যন্ত ব্রাহ্মস্কুলে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে অর্থনীতিতে সাম্মানিক স্নাতক এবং ১৯৬০ সালে এম. এ. পাশ করেন। ১৯৬১ সালে মলয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৬৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর পাটনায় নিজের অফিসে মলয় গ্রেপ্তার হন। ষড়যন্ত্র ও অশ্লীল কবিতা লেখার অভিযোগে ১২০ বি এবং ২৯২ ধারায় কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তাঁকে তোলা হয়। ২০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে একমাসের জেল ১৯৬৫-তে। ১৯৬৭তে হাইকোর্টের রায়ে বেকসুর খালাস এবং সাহিত্য থেকে বিযুক্তি। ঐ সালেই ব্যাঙ্কের চাকরিতে তিনি যান নাগপুর এবং ১৯৬৮ সালে সহকর্মী সলিলা মুখোপাধ্যায়কে বিয়ে করেন। ১৯৭১ সালে লখনউতে কৃষি-বিশ্লেষকের নতুন চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৮২ সালে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। ১৯৮৩ সাল থেকে আবার লেখালেখি শুরু করেন নানা ধরনের লেখা —

কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ - নিবন্ধ, জীবনী, সাক্ষাৎকারগ্রহণ প্রভৃতি। ১৯৮৭ সালে মলয় গ্রামোন্নয়ন বিশেষজ্ঞের চাকরি নিয়ে মুম্বাই চলে যান। ১৯৯৪ সালে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হয়ে কলকাতায় ফেরেন। ১৯৯৭ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

মলয় রায়চৌধুরীর প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'শয়তানের মুখ'। প্রকাশকাল আষাঢ় ১৩৭১ (ইং ১৯৬৪)। প্রকাশক, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ঠিকানা দেওয়া আছে ৩২/২ যোগীপাড়া রোড, কলিকাতা ২৮। এই কাব্যগ্রন্থে ৪০টি কবিতা, তিন ফর্মার বই। শয়তানের মুখ নয়, কবি নিজেরই মুখের ছবি দেখতে চেয়েছেন এখানে। প্রেম, শিল্প, নর, নারী, ইত্যাদি সম্পর্কে মলয়ের একটা তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ আছে। কাব্যিকতা নেই, অনুভূতির চেয়ে বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদ, ক্ষোভ, অস্থিরতা যা আছে তারও নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ নেই। সেদিক থেকে অনেক কবিতাকেই নৈরাজ্যপূর্ণ বলা যায়। লক্ষণীয়, গ্রন্থের প্রথম কবিতাটিতে গ্রাম্য পথের যাত্রাকথা রয়েছে। কবি বলেছেন,

"গোরুর গাড়ির চাকা ডেকেছিল গ্রাম্যপথে রাতে।

ঘুম ভেঙে, অন্ধকারে, দরজা খুঁজেছি সারাঘর —"[১]

কিন্তু কবি কোথাও যেতে পারেননি। ঘরেই রয়ে গেছেন। শুধু "চাকার শব্দ ততক্ষণে গড়িয়েছে দূরে" (অমীমাংসিত আবাস)। এই প্রয়াস ঘটেছে রাতের ঘন অন্ধকারে। গ্রন্থের শেষ কবিতায় শহুরে জীবনের অনিবার্যতা অমোঘ হয়ে রয়েছে। সেখানে ভোরের প্রসঙ্গ পাচ্ছি। কবিতার নামও 'কল্পদ্রুম'। সমগ্র কাব্যগ্রন্থটির মধ্যে কোথাও কবি ব্যক্তিত্বটির কিঞ্চিৎ অগ্রগমণ ঘটেনি। তিনি স্থাণু, স্থবির, দ্বিধাগ্রস্থ এক যুবাই থেকে গেছেন। মধ্যবিত্ত অরাজনৈতিক বাঙালী তরুণের কিছু কিছু অসুস্থতাই এই কবির সম্বল। গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতায় বলেছেন, " জলের

ভেতরে
হাত ডোবালে আমি
বুঝতে পারি আমার হাত
ভাঙা
জলে
তা সোজা মনে হয় মৃত্যু
প্রেম
দ্বিধা
পাপ
(আমি)।"[২]

আবার কখনও বা ক্রোধ ও চীৎকার কিছু কার্য-কারণহীন উচ্চারণ হয়ে উঠেছে মাত্র। যেমন,

"এভাবে বিদীর্ণ করো প্রেম শিল্পে কবিতাকে এ মুড়ো ও মুড়ো
নিমীল কুমারী বুক নখে ছেঁড়ো নিষ্পেষণে ভালোবাসা দ্বিধা
প্রতিক্ষণ দগ্ধবাক অযাচিতে ছিন্ন করো অবলা গোলাপ
বিজনে গহন রৌদ্রে, ভেঙে তুলে সচ্চরিত্র আমূল শিমূল

কখনও বা বলেছেন, "আমাকে ধোলাই দাও হে ঈশ্বর পচে গেলুম মরে গেলুম মাগো ... ধোলাই।"[৩] তবে কয়েকটি কবিতায় লক্ষ করি যে, দৃশ্যমান এই সভ্যতার প্রতি কবির কিছু বিদ্বেষ রয়েছে। এর পিছনে নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ নেই। আছে শিল্প, সাহিত্যগত কারণ। ঐতিহ্য ও সংস্কারের প্রতি বিরূপতা। 'একিলিসের গোড়ালিতে নিক্ষিপ্ত তীরের প্রতি' কবিতায় তিনি বলেছেন বহুকথা। তার কয়েকটি লাইন এরূপ ঃ

(ক) মাইকেলের অস্তিত্ব বিলোপের জন্য মানিক বাঁড়ুজ্জ্যেকে খুন
জারজ নিরো যাদের নখরে ছিন্নবিচ্ছিন্ন নন্দকুমার[৪]

(খ) মলয় রায়চৌধুরীর ভবিষ্যদ্‌বাণী
একিলিসের গোড়ালিতে নিক্ষিপ্ত তীরের প্রতি আমার ফতোয়া
আর চীৎকারের প্রতিদ্বন্দ্বী এই বীভৎস শব্দাবলীকে আর এর
ধ্বনি প্রতিধ্বনিকে ইতিহাস একদিন চূড়ান্ত ঘোষণা করবে
হায়ারোগ্লীফ
সময়
ক্ষোভ! ঘৃণা! ভয়! রাষ্ট্র! দুঃখ! অনুর্বরতা! হতাশা! পাপ!
সংশয়! ক্লান্তি! অবিশ্বাস!"[৫]

গ) ক্ষত্রিয়দের পিরামিড হাঁ করে ধূলিকণা তবু, নীলনদের চ্ছলৎছল আবহমানকালে
প্রতিটি ক্ষত্রিয়ের উত্থান ও পতন অবশ্যম্ভাবী
অথচ নশ্বর গোলাপ নিয়ত
আমার আত্মার যন্ত্রণায় গোলাপের পাপড়ি ঝরানোর ...

ঘ) বিমানবন্দর সমগ্র পৃথিবী জুড়ে সুরক্ষিত আর কাঁটা তারের
বাইরে আমার পচা লাশের গ্যাঁজলা

স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদেরা বিস্মৃত বলে জ্যান্ত বাণীবমনকারী মেশিনের

নামে সরণি ও শহর।

ঙ) ... ঈভের যোনি থেকে কেবল সভ্যতার কঙ্কাল নির্গত এবং

আলেকজান্ডারের সমাধি

আজ নিশ্চিহ্ন বলে হাওয়ায় ঈসকিলাস আমাকে ডাকছেন।[৬]

বোঝা যায়, সাম্রাজ্যবাদী রাজপুরুষ, ক্ষমতাগর্বী শাসককুল এবং রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান যন্ত্রের প্রতি কবির বিরূপতা ব্যাপক। যে রাষ্ট্রব্যবস্থা সাহিত্য ও সংস্কৃতির যথার্থ সৃজনশীলতাকে বিনষ্ট করতে উদ্যত তারই বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদ। ব্যক্তিকে রাষ্ট্র কখনই মেনে নেয়নি, বিশেষত প্রথাবিরোধী সৃজনশীল ব্যক্তিত্বকে। কবির আত্মার যন্ত্রনা ও সংক্ষোভ সেই কারণেই।

সমগ্র কাব্যটিতে মলয় বহুবার শিল্প ও কবিতার কথা বলেছিল। ফলে মলয়কে কবির চেয়ে একজন কবিতা ও শিল্পভাবুক মনে হতে পারে। কেননা তিনি বলেন, 'শিল্প যূপকাষ্ঠ' (সেনেট)। কখনও বলেন, 'আব্রহ্ম শিল্পের পাঁকে আমি' (নুয়ে যাও গুপ্তচর)। কখনও বা বলেন, 'কবিতাকে চূণকাম করবো না যযাতি' (ধোলাই)। তাঁর কবিতার নামও 'শিল্পের বিরুদ্ধে', 'কবিতার প্রতি,' 'স্পর্শের প্রহরে শিল্প' প্রভৃতি। নিজের উমার্গগামিতা, ক্রোধ, অস্থিরতার সঙ্গে স্বীয় আর্ট বিষয়ক দৃষ্টিকোণকে মলয় মিশিয়েছেন এ ভাবে ঃ

ক্ষিপ্রহাত, ছিন্নমুন্ড, কয়েক ঝলক রক্ত, লক লকে জিভ

উল্লোল স্ফূরিত হিংস্র সারি সারি ভীষণ জল্লাদ ...

... 'খচ্' করে শব্দ এক, আমার কর্তিত দেহ, দেখি

ছটপট করিতেছে মেঝের উপরে গর্তে ! "কেমন বল্লুম শালা

জেদে গোঁয়ার্তুমি করিসনে, শিল্প-ফিল্প গ্যাঁড়াকল বহুদিন শেষ হয়ে গেছে

(মেঘনাদের পুনরুজীবন)।

নিজেকে নিয়ে মলয় আরও যে ছবি ও ব্যাখ্যান তুলে ধরেন তা আরও নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ হয়ে ওঠে এই ভাবে ঃ

মৃত্যু দিনের পোষাকে নাচে আমার কঙ্কাল, প্রতিরাতে প্রেমিকাপালক

ছোঁয়াময় মরাচূড়া বেঁধে ঘোরে ঘাণিগোরু জনগণ মৃতপ্রায় হাঁটে ঘিরে ছোঁয়া

উত্তপ্ত গলিত স্বর্ণে পোড়ে পদ বৃক্কমেরু মহান পাপের মেনেলাস

— (অপসৃয়মান গ্রীষ্মাবলীর টোটেম)।

এ ছাড়া অনর্গল শব্দের পর শব্দের ব্যবহার অনেক সময়ই অনন্বয়ী হয়ে উঠেছে। কিছু কিছু শব্দবন্ধও উৎকট, যথা - মরাচূড়া, বৃক্কমরু, পিয়াতসাপেরুজ্যা, অক্কপলয় ইত্যাদি। দেশবিদেশের সাহিত্য ও মিথোলজি থেকে নানা অনুষঙ্গের যথেচ্ছ ব্যবহার মলয়ের কবিতাকে জটিল করেছে। আসলে, এ কাব্যে শয়তানের মুখের চেয়েও শয়তানের মুণ্ডুটিই অধিক প্রকট। 'মেঘনাদের পুনরুজ্জীবন' কবিতায় একটি কাটা মুন্ডু'র ছবি আছে - তা যেমন মেঘনাদের, তেমনই কবিরও। এই উৎকটতাই মলয়ের কাব্যের চাবিকাঠি।

মলয় রায়চৌধুরীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'জখম' প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালের ৯-ই জুন। প্রকাশক জেব্রা প্রকাশনী। একটি দীর্ঘ কবিতা নিয়েই সমগ্র কাব্যগ্রন্থটি। পৃথিবীর নানা ভাষায় কবিতাটি অনুবাদিত হয়েছে। ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় এটিকে অনুবাদ করেছেন কার্ল ওয়েসনার। স্প্যানিশে অনুবাদিকা মার্গারেট র‍্যানডাল।

কবিতাটির বিষয়বস্তু হল পরিপার্শ্বের সঙ্গে একজন সংবেদনশীল তরুণের তীব্র মানসিক টানাপোড়েন। প্রচন্ড আবেগের তরল স্রোত যেন বইছে সারা কবিতায়। অ্যালেন গিনসবার্গের 'ক্যাডিশ' জাতীয় কবিতার পরোক্ষ প্রভাব যেন এখানে অনুভব করা যায়। তবে এর প্রেক্ষিত দেশজ এবং মাদকসেবনজাত প্রতিক্রিয়া নয়, চতুর্দিকের নৈরাজ্য বিরোধিতার ব্যাপারটিই প্রধান। ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্র ও সমাজের দ্বন্দ্ব তাকে যখন ক্রমেই নিঃসঙ্গ করে দেয়, তখন সে কিভাবে ক্রুদ্ধ, অস্থির ও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে তারই একটি বিস্তৃত ছবি 'জখম' কাব্যে মলয় রায় চৌধুরী চিত্রিত করেছেন। একদিক থেকে দেখতে গেলে এ কাব্য আধুনিক যুবসম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতার, অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে তীব্র প্রতিবাদের। সে জন্য এখানে কোনো বিষাদের ছায়া নেই, আবার রাজনৈতিক দর্শনের আরোপও ঘটেনি। কবি বলছেন —

চাঁদোয়ায় আগুন লাগিয়ে
তার নীচে শুয়ে আকাশের উড়ন্ত নীল দেখছি এখন
দুঃখে কষ্টের শুনানি মুলতুবি রেখে
আমি আমার সমস্ত সন্দেহকে জেরা করে নিচ্ছি ...
আমার সামনে সমস্ত দৃশ্য ধেবড়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি
কারুর সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না আমার।"

কবি বুঝতে পারেন না কেন

'পরমাণুশক্তির উন্নয়ন সত্ত্বেও হারানো ছেলেরা
ভেসে উঠছে পচা ডোবায়।'

এবং

'আমি জানি না কেন ১ জনকে মৌলালিতে মারা মানে খুন
রাজশাহীতে মারা মানে দেশপ্রেম'।[৭]

কবি লক্ষ করেন,

মানুষই মানুষকে শেখাচ্ছে পড়াচ্ছে শৃঙ্খলার গুণ ও হিটলারের আত্মকথা

অথবা

অনেক পুতুলেরও নীতিবোধ জেগে উঠছে আজকাল

অথবা

কোলকাতার প্রতিটি রাস্তায় পড়ে রয়েছে ধ্বস্তাধ্বস্তির মুনাফাকারী চিহ্ন।[৮]

যতো এই সব অসঙ্গতি দেখছেন ততই কবি পীড়িত বোধ করছেন। আত্ম পীড়িত। ফলে বলছেন,

ওফ আমার ভালো লাগছে না এইসব
আমি মরে যাবো আমি মরে যাবো আমি মরে যাবো
আমার দুঃখকষ্ট বুঝতে না পেরে
ভেতরে ভেতরে আমার হাড়গোড় চিড় খেয়ে যাচ্ছে।[৯]

যদিও তিনি জানেন

'কিছুই হল না আমার পৃথিবীরো কিছু হবে না শেষ অব্দি'।
তখন 'নিজের শরীরের ভেতর দিকেই আজকাল থুতু ফেলছি আমি
আয়নার শঠ পারা থেকে খুঁটে তুলছি আমি
আমার হিংস্র চোখ মুখের আত্মত্রানকারী ছাপছোপ।'[১০]

নিজেকে আক্রমণ ও ক্ষত বিক্ষত করাও একসময় অসম্ভব হয়ে উঠছে। তাই 'নিজের পায়ে কুঠারাঘাত কোর্তে গিয়ে কুঠার ভেঙ্গে যাচ্ছে।' নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি নয়, আঘাতের মধ্য দিয়ে ধ্বংশই করতে চাইছিন কবি ঃ

''নতুন চামড়া দেখবে' বলে আমি আমার ঘায়ের মামড়ি খুঁটে ফেলছি এখন
আস্তিনের নীচে আধপচ' দগ দগ ঘা লুকিয়ে
সকলের সঙ্গে হাত নেড়ে কথা বোলে যাচ্ছি
মুখের চামড়ার নীচে আমার খুলি সবসময় হাঁ কোরে হাসছে ...
মরা মানুষের হতাশ জামাকাপড় পরে তারি খোঁজে ঘুরেছি রাস্তায় রাস্তায়।''[১১]

এই কাব্যে মলয় এক ভয়াল সময়ের অশ্বারোহী। হাতে তাঁর বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের তলোয়ার। উদ্দেশ্য ও পরিণতিহীন সেই যুদ্ধ। শুধুই একটা ঝড়, যেন একটা প্রলয়ের আশঙ্কা। তবে তা যূথবদ্ধ নয়, একক ব্যক্তির অনবরত এক আত্মিক লড়াই ঃ

"ওফ্
প্রতিহিংসা আমাকে জের্বার করে তুলছে
নিজের সঙ্গে শলাপরামর্শ এঁটে ঠিক কোর্ছ কি করে প্রতিশোধ নেওয়া যায়
একটা একটা চোটে ফেটে গুঁড়িয়ে যেতে চাইছে
আমার কঙ্কালের সমঝদার ঘরদোর
আক্রমণের আগে আমি ২ দন্ড জিরিয়ে নিচ্ছি
ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাবার পর আমি উঠে দাঁড়িয়ে ফুঁসছি আর গর্জ্জাচ্ছি
বালামচি দিয়ে চোটজখম ঝালাই কোরে
স্রেফ ন্যাংটা হাতে লড়ে যাচ্ছি ২৫ বছর
সমস্ত কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য,
আমার চোখ মুখ থম থম কোর্ছে এখন।"[১২]

মলয় রায় চৌধুরীর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আমার অসীমাংসিত শুভা।' এটিও একটি দীর্ঘ কবিতা মাত্র। প্রথম প্রকাশ ১৩ই মাঘ ১৩৭১ (ইং ১৯৬৫)। প্রকাশক, জেব্রা প্রকাশনী। 'জখম' কাব্যেরই তীব্রতর রূপটি এ কাব্যে অভিব্যক্তি পেয়েছে। তবে এখানে প্রশ্নকাতরতা নেই, রাষ্ট্র ও জাতির কোনো প্রসঙ্গও উত্থাপিত নয় এখানে। কবি ব্যক্তিটি পুরোপুরি এ ক্ষেত্রে নিজের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছেন। মলয়ের 'প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটি নিয়ে মামলা হয়েছিল। ঐ কবিতাটিরই যেন সম্প্রসারিত ও সংশোধিত রূপ 'আমার অমীমাংসিত শুভা।' অস্তিত্বের যে অসহনীয় অস্থিরতার কথা বার বার এখানে কবিকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে তার মূল কারণ কী তার স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। তবে শুভা নামে একটি নারীকে আশ্রয় করে মলয় তার আকূতি ও নিরাসক্তি, প্রেম ও ঘৃণার, হৃদয় ও মগজের দ্বৈরথ ঘটাতে চেয়েছেন। কখনও কখনও মনে হয় যৌন কামনা বা তার অতৃপ্তির জন্যেও কবিচিত্তের এই অনিকেত চাঞ্চল্য ঘটতে পারে। নইলে কেন বলবেন,

> শুভা আমাকে তোমার ও অখিলের মাঝখানে গিয়ে শুয়ে পড়তে দাও
> শান্তি দাও, শুভা শান্তি দাও।' এবং 'আমার চূড়ান্ত আশ্রয়হীনতার মধ্যেও লাখ লাখ কুমারীর গর্ভঘর ফাঁকা পড়ে আছে কেন বুঝি না।' বলছেন, 'ধরা পড়ে যাচ্ছে যে আমার শরীর আমাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে

শুভার সমস্ত ন্যাকামি ধরা পড়ে যাচ্ছে ... এই শুভাগ্রাফের ফাঁকে ফাঁকে দীপালি রায়কে ভালোবাসার ইচ্ছে চাগাচ্ছে আমার নন্দিতার ফর্সা গালে কষে ১টা চড় মেরে আলতো করে চুমো খাবার ইচ্ছে হচ্ছে।'[১৩]

সুতরাং এই কাব্যের তথাকথিত যন্ত্রণাকাতরতা ও অস্থিরতার ভিত্তিভূমিটি খুব দৃঢ় নয়। কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর অনন্যতার জন্যই কবিতাটির অনেক অংশ পাঠকদের ভালো লাগে। মলয়ের কাব্যের ভাষারীতির আলোচনা প্রসঙ্গে তার উদাহরণ দেওয়া যাবে।

আসলে, মলয়ের কাব্যে ব্যক্তিজীবনের নৈরাশ্য বা অসন্তোষের চেয়ে কালের যন্ত্রণাকে মূর্ত করবার প্রয়াসে একধরনের তিক্ততা লক্ষ করা যায়। ব্যক্তি অনুভূতির গাঢ়তার চেয়ে তাই প্রধান হয়ে ওঠে বুদ্ধিবাদিতার ছাপ। মনে হয়, প্রেম, মৃত্যু বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি কাব্যের প্রচল বিষয়গুলিকেই তিনি কবিতায় রূপ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

মলয় রায়চৌধুরীর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'মেধার বাতানুকুল ঘুঙুর', ১৯৮৭র জানুয়ারীতে প্রকাশিত। প্রকাশক, মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা। তিন ফর্মার বই। ৩৪টি কবিতা সম্বলিত। এখানে এক প্রৌঢ় মধ্যবিত্তের গলার আওয়াজ শোনা যায়। ক্ষোভ, চীৎকার আছে, পরিপার্শ্বের প্রতি বিরূপতা আছে, আছে সিনিসিজিমও। প্রচলিত সামাজিক ভাষা, দাম্পত্যজীবন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতি কবির মনোভঙ্গী স্পষ্ট ঃ

'ওগো স্তন্যপায়ী ভাষা পিপীলিকাভুক মুখ চোরা
ভূচর খেচর জলচর দাম্পত্যজীবনে তুষ্ট একশিঙা ...
স্থলে বিচরণকারী উদবিড়াল গন্ধগোকুল বিনোদিনী
শব্দগহ্বর খেয়ে নোকরশাহীর রাজ্য এনেছো এ দেশে' (ঘৃণপোকার সিংহাসন)।
নারীকে বলেছেন, 'ফ্যান টাঙাবার ওই খালি হুক থেকে
কণ্ঠে নাইলন দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়ো'

এবং

'দোলো লাশ নামাবার জন্যে আছি আমি' (বিজ্ঞানসম্মত কীর্তি)।

'শুদ্ধ চেতনার রহস্য' কবিতাতেও একই ধরনের কথা বলেছেন কবি। আত্ম হত্যায় প্ররোচনা দেবার মতো অপরাধ ও বিকৃতিতে অনেকগুলো কবিতাই পূর্ণ। অমানবিকতা ও ঘৃণার দাহ কুৎসিতাকার পায় কবি যখন বলেন,

'মানুষীর মরা মাংস কেমন জানি না

আধ পোড়া স্তন খেয়ে দেখবো তোমার'। (অভ্যন্তর, ওফ)।

জীবন সম্পর্কে দুঃসহ তিক্ততা ও ঘৃণা প্রকাশ করবার জন্যই এসব পংক্তির অবতারণা। হয়তো এ কারণেই হৈ হল্লা ও হুমকির বাতাবরণও মেলে এ কাব্যে ঃ

'দরোজায় লাথি মেরে বেহায়া চীৎকার তুলছি মাঝরাত্তিরে
যারই বাড়ি হোক এটা খুলতে হবেই নাতো ভেঙে ঢুকে যাবো
সামলাও নিজস্ব স্ত্রীলোক বাঁদি সোনাদানা ইষ্ট দেবতা'

(বাড়ি দখল)।

পরিণতিও জানা কবির ঃ

লুমপেন বলে তোরা ঘিরে ধরবি
আরেকবার ছিটকে পড়বো ফুটপাতে মুখে গ্যাঁজলা নিয়ে

(মেশোমশায় পর্ব)।

মলয়ের এই কাব্যগ্রন্থে সত্তর দশকের অরাজক রাজনৈতিক খুনোখুনি ও অস্থিরতার ছবিটিও দেখা যায়। যেমন ঃ

অন্ধকারে জুতোর ঠোক্করে টের পাই কারুর মাথার খুলি
পায়ে লেগে ছিটকে পড়ল কিছু দূরে। দেখি টর্চ বাতি জ্বেলে
পোয়াতি নারীর মাথা কেটে কিছুক্ষণ আগে ফেলে গেছে কেউ
... এখন পুলিশ এসে
ধরে যদি আমাকেই? কী প্রমাণ দেবো? (নিক্তি)।

কিংবা ভোর রাতে দরোজায় গ্রেপ্তারের টোকা পড়ে
একটা কয়েদি মারা গেছে তার স্থান নিতে হবে (অস্তিত্ব)।

এবং আবলুশ অন্ধকারে তলপেটে লাথি খেয়ে ছিট্‌কে পড়ি
পিছমোড়া করে বাঁধা হাতকড়া, স্যাঁতসেতে ধুলোভরা মেঝে
আচমকা কড়া আলো জ্বলে ওঠে চোখ ধাঁধায়
এক্ষুনি নিভে গেলে মুখে বুটজুতো পড়ে দু'তিনবার
কষ বেয়ে রক্ত গড়াতে থাকে টের পাই।' (আলো)। -

এ ভাবেই তাঁর কবিতায় সময়ের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই কাব্যে মলয় সমস্ত নোংরামী, তিক্ততা, আঘাতকে সহ্য করে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকার

কথাই বলেছেন। এটাকে এক ধরণের সদর্থকতা বলা যায়। 'জখম' থেকে 'আমার অমীমাংসতি শুভা' পর্যন্ত 'আমি মরে যাবো, আমি মরে যাবো' বলে তিনি চীৎকার করেছিলেন। কিন্তু সেই অস্থির নৈরাশ্যকে এখানে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা দেখতে পাই। কেননা তিনি বলেছেন, —

'দেখে নিস তোরা মাটিতে গোড়ালি ঠুকে পৃথিবীর চারিধারে জ্যোতির্বলয়

গড়ে যাবো'

(মেশোমশায় পর্ব)।

মনে হয়, উদ্দেশ্যহীন কোনো শব্দ গ্রন্থিলতা থেকে একটা সাময়িক অর্থময়তায় যাচ্ছেন। বলেছেন, 'একসঙ্গে সব আলো নিভে গেলে পরবর্তী আক্রমণ সহ্য করবার জন্যে নিজেকে তৈরী করে নিই।'! আলো। এখানে সমকালীন পুলিশী অত্যাচারের ছবিটিকেই নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন কবি।

সামগ্রিকভাবে মলয়ের কবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে তা হল তা নিছক একজন ব্যক্তিমানুষেরই প্রতিক্রিয়া। 'আমি' নামক ব্যক্তি অহংটির প্রকাশকেই তিনি মুখ্য মনে করেছেন। সামাজিকতার কোনো আদল সেখানে নেই। এ জন্যে ব্যক্তির স্বৈরাচার দু'একটি তীব্র ফুলকির মতো দেখা গেছে — অসামাজিকতার সমূহ চাপ কখনই রচিত হয়নি। কখনও কখনও 'তুমি' বলে মলয় যাকে সম্বোধন করেছেন, তাকে প্রেমিকা, স্ত্রী ইত্যাদি বলে ভাবাই যায় না। ঐ নারীর হৃদয়, মস্তিস্ক, কমনীয়তা কিছুই নেই। শরীর ও যৌন ব্যবহারে ঐ নারীকে একটি যান্ত্রিক কাঠামো বলে বোধ হয়। কারণ তার মধ্যে সৃষ্টিশীলতার ব্যাপার নেই। কবিকে সে কোনো শান্তি ও আশ্রয়ও দিতে পারছে না। নারীর সঙ্গে কবির যৌনতা শেষ পর্যন্ত অর্থহীন ও অস্থিরতার আর্ততায় পর্যবসিত হচ্ছে। এছাড়া মলয়ের কবিতায় আবেগের বাষ্প নয় লাভা আছে। কথার মধ্যেও বক্রতা, সাংকেতিকতার অভাব। সরাসরি স্পষ্টভাষায় কথা বলতে তিনি ভালবাসেন। হৃদয়ের চেয়ে বুদ্ধিকে গুরুত্ব দেন বেশী। নিসর্গ নয়, নগরসভ্যতাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। অনেক সময় বোদলেয়ারের প্রভাবও এসেছে। নারীর শরীর, স্তন, চুল, গন্ধ, ঘাম, প্রেমপাংশু গণিকা, পূঁজ, শ্লেষ্মা, পিত্ত, কফ, নিষিদ্ধ বিষ, অন্ধকার, কঙ্কাল, কঙ্কালের নৃত্য ইত্যাদি সবই ফরাসী প্রতীকবাদী কবি থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন। কবিতা মলয় লিখে গেছেন টানা গদ্যে, অনলঙ্কৃত ভাষায়। বক্তব্যের উপরই জোর দিয়েছেন, ইঙ্গিতের প্রতি নয়। এ সব কারণে স্বাভাবিকভাবে তাঁর কবিতায় দুর্বোধ্যতা এসেছে। কিন্তু অনেক নিষিদ্ধ অপশব্দের প্রয়োগ তিনি করেছেন যেগুলি কবিতার কোনো শক্তিবৃদ্ধি করেছে বলে মনে হয় না। আসলে, মলয়ের শব্দ প্রয়োগ সম্পর্কে এ কথাই বলতে হয় যে, তাঁর শব্দাবলী অমোঘ নয়। নির্দিষ্ট ঐ শব্দগুলি অনায়াসে পাল্টে দেওয়া যায়, আর তাতে তাঁর কবিতার

কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে না। তাঁর কবিতার শিরোনাম কবিতার বক্তব্যের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেলানো দুষ্কর। কিন্তু কবিতার নামগুলো নতুন ধরনের, কানে লেগে থাকে যেমন, 'অন্তরঙ্গ বহির্মুখ,' 'যূপ কাঠুরিয়া,' 'কোকিল ও সাঁজোয়া', 'নিম্নাভিমুখী হৃদয়স্থাপন', 'মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর' 'ঘৃণপোকার সিংহাসন', 'শুদ্ধ চেতনার রহস্য', ইত্যাদি। মলয়ের প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'শয়তানের মুখ'-এ অল্পস্বল্প হলেও রোম্যান্টিকতা উঁকি দিয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন',

বাঁধনহারা অন্ধকারে আড়াল তোলে

পাপড়ি ঢাকা স্তনে

আলোছায়া উরুর কোনে যোনির কাছে কুটুম ঠোঁটদুটি

(স্পর্শের প্রহরে শিল্প)।

কিংবা

'লাথি মেরে হটাবো তলোয়ার

তোমার ত্রস্ত স্তনে হাত

দেবো আজ তৃণের ফুল পায়ে' (হিংস্র বারোক)।

কিন্তু 'জখম' কাব্যে যখন তিনি নিজেকেই আক্রমণের বস্তু করলেন তখন রোম্যান্টিকতার এই স্বল্প-সৌরভটুকুও অন্তর্হিত হয়ে গেল। এক অর্থহীন শূন্যতার মধ্যে নিজেকে তিনি ছড়িয়ে দিলেন। উন্মাদের মতো পরস্পর বিরোধী কথা বলে তিনি বোঝালেন যে, তিনি আহত, রক্তাক্ত, ক্রুদ্ধ এবং দিশাহীন ঃ

'নতুন চামড়া দেখবো বলে আমি আমার ঘায়ের মামড়ি খুঁটে ফেলছি এখন

আস্তিনের নীচে আধপচা দগ দগে ঘা লুকিয়ে

সকলের সঙ্গে হাত নেড়ে কথা বলে যাচ্ছি

মুখের চামড়ার নীচে আমার খুলি সবসময় হাঁ কোরে হাসছে। (জখম)।[১৯]

প্রশ্ন জাগে, 'নতুন চামড়া' কী নতুন সময়? 'ঘায়ের মামড়ি খুঁটে দেখা কি নীরবে সব স্বীকার না করে সাময়িক স্থিতিকে ভেঙে ফেলা? চামড়ার নীচে খুলির হাসি কি সমস্ত রকম ভাণের প্রতিবাদ? আবার, এই যে কথা বলে যাওয়া, বাক্য স্রোতের অন্তহীন অনর্গলতা - তা মলয়ের জখম সত্তারই উদ্ভাসন। পরবর্তী কাব্য 'আমার অমীমাংসিত শুভায়' একই বোধের অভিব্যক্তি। তবে চিত্রকল্প রচনার অভিনবত্ব বেশ চোখে পড়ে। যথা ঃ

(১) আমার চোখের পাতাগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে

দেখতে পাচ্ছি।[১৫]

(২) ঘাসফড়িঙের চোখের ভেতর দিয়ে দেখচি শুভার ঝাপসা
থুত্নির উত্তেজক মেলা।[১৬]

(৩) আমার পিঠে চাবুকের দাগ ফুঁড়ে বেরোচ্ছে
হাজার হাজার নারীর চোখের পাতা[১৭]

(৪) আমি দেখছি ১ হাত জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে কোলকাতা[১৮]

মলয়ের কাব্যের অরেকটা গুণ তার অ্যাবসার্ডিটি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই এটা রয়েছে। যেমন ঃ

(১) বিচ্ছিন্ন ধড়ের বুকে বেজে চলে আদিগন্ত লাউডস্পীকার
জুমরাতে (মেঘনাদের পুনরুজ্জীবন ঃ শয়তানের মুখ)

(২) জন্ম ও মৃত্যুর আগে গ্লিসারিনের ধর্ম প্রত্যেককে
পালন করে যেতে হয় শুভা
আমাকে ঐ নিষ্পলক
পদ্মের ভেতর দিয়ে তোমারা ম্লেচ্ছ হৃদয় পর্যন্ত চলে যেতে
দাও' (আমার অমীমাংসিত শুভা)।

(৩) 'গোখরোর মাথায় খুলে উঠছে জাপানী হাতপাখা আর
মানুষের জীবন্ত পাঞ্জা' (জখম)।

এসবের কারণে মলয় তাঁর কবিতায় কখনই একটা সামগ্রিকতার বৃত্তাভাস আনতে পারেন নি। বিচ্ছিন্নভাবে মন্তব্য ও চিত্রকল্পের, তত্ত্ব ও ইশারার একটা কোলাজ গড়ে উঠেছে।

(খ) শৈলেশ্বর ঘোষ ঃ

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের অন্যতম নেতা শৈলেশ্বর ঘোষ এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর জন্ম ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। বগুড়া জেলার সদর বিভাগের রাজাপুর গ্রামে তিনি জন্মেছিলেন। শহরের উত্তর উপকণ্ঠে, করতোয়া নদীর পারে নির্জন স্থানে তাঁর পিতৃগৃহ অবস্থিত ছিল। গ্রামটি হিন্দু অধ্যুষিত ছিল, কিন্তু অরণ্যপ্রধান ও ক্ষয়িষ্ণু। শৈলেশ্বরের পিতার নাম বিশ্বেশ্বর ঘোষ, মাতার নাম জগত্তারিণী দেবী। তাঁর এক দাদা ও তিন দিদি ছিল। পিতা ছিলেন কাছারিতে দলিল লেখক। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে তাঁদের বাড়িতে ডাকাত পড়ে। ফলে তিনদিনের মধ্যে বাড়ি বিক্রী করে দিয়ে তাঁরা কলকাতায় চলে আসেন। দাদা বদলি নেন ভাটপাড়ায় সিভিল

সাপ্লাই অফিসে। বাড়ির সবাই ভাটপাড়ায় থাকতে শুরু করেন। আবার ছ'মাস পরে সবাই রাজাপুরে ফিরে চলে যান। শৈলেশ্বর কলকাতাতেই বাবার ডাক্তার বন্ধুর বাড়িতে প্রায় ছ'মাসের মতো অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে দাদা সর্বেশ্বর ঘোষ বালুরঘাটে বদলি হলেন। ১৯৪৯ সালে শৈলেশ্বরও বালুরঘাটে এলেন। বালুরঘাট হাই স্কুলে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হলেন। ১৯৫৩ সালে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করলেন। বালুরঘাট কলেজ থেকেই আই. এস. সি পাশ করলেন। সেখানে অনার্স নিয়ে বি. এস্. সি পড়ারও ইচ্ছে হল। কিন্তু বাদ সাধল পিতার অসুস্থতা। তিনি পক্ষঘাতগ্রস্ত হয়েছিলেন। শৈলেশ্বর আর এস-পি পার্টির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়লেন। ফলে পড়াশুনোর কিছুটা ব্যাঘাত সৃষ্টি হল। চলে এলেন কলকতায়। বাগমারীতে রামেশ্বর ছাত্রবাসে রইলেন। ভর্তি হলেন সিটি কলেজে। ১৯৫৮ সালে বাংলা অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করলেন। পরে মানিকতলায় একজনের বাড়িতে পেয়িং গেষ্ট থাকতে শুরু করলেন। সেখানে আলাপ হল সুভাষ ঘোষের সঙ্গে। জুটল আরেক বন্ধু বিমল কুন্ডু। তিনি থাকতেন উল্টোডাঙ্গা বস্তিতে। এই দু'জনেই পরে হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সুভাষ ঘোষ কিছু উল্লেখযোগ্য গল্প রচনা করেছিলে। যাই হোক, ১৯৫৮ সালেই বালুরঘাট থেকে চল্লিশ মাইল দূরে একটি জুনিয়র হাই স্কুলে তিনি হেডমাষ্টার পদে যোগ দেন। ১৯৫৯ সালে বালুর ঘাট জেলা গ্রন্থাগারে সহ-গ্রন্থাগারিক পদে বৃত হন। ১৯৬২ সালে শৈলেশ্বর যোগ দেন হিন্দ মোটর স্কুলে। তখন সেখানে তার মাসিক বেতন ছিল ষাট টাকা। তিনি তখন থাকতেন শ্যামবাজারে টালার কাছে। ১৯৬৭ সালে সুনীতা কুন্ডুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৭১ সালে তাঁর কন্যার জন্ম হয়। ১৯৯৮ সলে শৈলেশ্বর ঘোষ হিন্দ মোটর স্কুল থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতা প্রথম বেরোয় সতীন্দ্র ভৌমিকের 'এষণা' পত্রিকায়। কবিতার নাম ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা'। ১৯৬৩ সালে এরই কিছু অংশ পরে 'হাংরি জেনারেশন লিফলেটে' ছাপানো হয়েছিল। ছাপানো হয়েছিল 'তিন বিধবা' কবিতাটিও। কিন্তু শৈলেশ্বরের কাব্যগ্রন্থ বেরোয় আরও পরে - ১৯৬৭ সালে। গ্রন্থের নাম 'জন্মনিয়ন্ত্রণ'। প্রকাশক, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, ৬ নং বংশীধর মল্লিক লেন, কলকাতা। দাম দুই টাকা। এখানে মোট ২৭টি কবিতা সংকলিত। 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা' সিরিজের কবিতাগুলি এখানে রয়েছে। অস্থির সময়ের প্রেক্ষায় চর্তুদিক সচেতন এক যুবকের আত্ম - অনুসন্ধান এক অননুকরণীয় ভঙ্গী ও ভাষায় এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম কবিতা 'টার্মিনাস পার হতে গিয়ে'। টার্মিনাস মানে জীবন। এই জীবনকে তিনি একেবারেই ভালেবাসতে পারেন নি। কবিতার শেষে আত্মহননের ইশারা। নিজের হাতের শিরা নিজেই কেটে নিয়েছেন। জানিয়েছেন, 'জীবনানন্দ দড়ি হাতে গিয়েছিল'। কিন্তু সেখানে ছিল

নিরর্থকতার বোধ, নিঃসঙ্গতারও। কিন্তু শৈলেশ্বর বলছেন, 'সমুদ্র উঠে আসে যুদ্ধভূমির দিকে, যুদ্ধভূমির মধ্যে ছিটকে পড়েছি আমি'। [১৯] ক্রোধ ও ঘৃণার প্রকাশে শৈলশ্বরের আত্মহনন প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। এই প্রতিবাদকে শৈলেশ্বর নিজেই গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা 'বৈদ্যুতিক ১৯৬৪'তে ব্যাখ্যা করেছেন — 'রক্ততন্ত্রীর ভিতর দিয়ে যাতায়াত করছে অসুস্থ বিদ্রোহ'। নিজেকে বলেছেন, 'সভ্যতাপ্রসূত গাধা।' বলেছেন, 'ইতিহাস সভ্যতার হাড় দিয়ে তৈরী হয়েছে দালান।'[২০] কিন্তু কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য নেই। এলোমেলো যৌনতা ও স্বাধীনতার রেফারেন্স কন্টকিত এই বিদ্রোহকে তারুণ্যের লক্ষ্যহীন আবেগময় উচ্চারণই বলা সংগত। এক স্থানে শৈলেশ্বর বলেছেন,

'প্রণতিকে এখন আমি চাই, নিজের মাকে যেমন আমি চাই প্রণতি, বিশ্বাস কর তোমাকে চাই — আমূল মাখনের মত ব্যবহার করতে চাই - এমনকি বেশ্যাদের কাছেও আমি ভালবাসা চাই'[২১]। অন্যত্র শৈলেশ্বরের বক্তব্য ঃ

'আমাদের রাজনীতি মানেই তো
মূল্যবৃদ্ধি যার ফলে বাজার থেকে দুধ উধাও হয়ে যায় আর
মূর্খদের সুখ বেড়ে যায়।' (১০ পয়সার ম্যাজিক)।

কিংবা '... একজনের মৃত্যু আর একজনের স্বাধীনতা বাড়িয়ে দেয়' (বৈদ্যুতিক ১৯৬৪)। এই কাব্যগ্রন্থে কবি সঙ্গম, সন্ত্রাস, জীবন, আত্মহত্যা, স্বপ্ন, মাতাল, সভ্যতা ইত্যাদি শব্দগুলোকে চিহ্নের মত ব্যবহার করেছেন। পুনঃ পুনঃ ছন্নছাড়া ভাবে ব্যবহারের ফলে সেগুলি অবশ্য তেমন তাৎপর্য দান করতে পারে নি। এই কাব্যেই শৈলেশ্বর নিজেকে প্রথম 'ক্ষুধার্ত' বলে ঘোষণা করেছেন। 'আমি ক্ষুধার্ত' নামক সেই কবিতায় দেখা যাচ্ছে, তার বাবা জুয়া খেলতে গিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে পাগল হয়ে ফিরে এসেছে, মা শুয়ে আছে এক দেবতার সঙ্গে। কবি নিজে সমকামী ও বিপরীতকামী, তাঁর বন্ধুরা কেউ জারজ, কেউ বিশ্বাসঘাতক, কেউ খুনী। মাদকাসক্ত কবিকে তাদের সঙ্গে মারামারি করতেও দেখা যায়। এসবের মধ্য দিয়ে শৈলেশ্বরের স্বেচ্ছাচারিতার ক্ষুধাটিই যেন প্রবল হয়ে ওঠে। অন্যভাবে বলা যায়, কবি এইসব চরিত্র, আচরণ ও বিকৃতির মধ্য দিয়ে নিজেকে চিনে নিতে চেষ্টা করছেন। নিজের মুখটিকে আঁকতে চাইছেন। 'আমার মুখ' নামক কবিতায় বলেছেন,

'তূলাতোষকে অনিচ্ছুক আমার মুখ দেখতে পাচ্ছি
মীরার দিকে অনিচ্ছুক - ঘুমের প্রতি - সর্বত্র অনিচ্ছুক
অমানুষিক স্বপ্নের মধ্যে আরও ঘোরতর অনিচ্ছুক আমার মুখ ছড়ানো
বিক্ষিপ্ত লাল কালো

বিক্ষিপ্ত হলুদ সবুজ টুকরোগুলি দেখতে পাচ্ছি -

কমলালেবুর বিক্ষিপ্ত কমলার মধ্যে আমার মুখ এ রকমই দেখতে পাচ্ছি।'[২২]

'জন্মনিয়ন্ত্রণ' কাব্যে বহু কবিতায় আত্মহত্যার প্রসঙ্গটি এসেছে। যেমন এসেছে মা'র কথা। জীবনের নিরর্থকতার জন্য অনীহা এখানে অস্তিত্ববাদী টানাপোড়েন বা দার্শনিকতার ঘোর সৃষ্টি করবার জন্য নয়। রাগী শৈলেশ্বরের ক্রোধেরই প্রকাশ। মা এখানে সৃষ্টিমূল হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ আমাদের সৃষ্টিরই যে কোনো সৌকর্য ও প্রয়োজন নেই তা-ই কবির মত। কারণ আমরা কোনো সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছি না। দ্বিতীয়ত 'মা' নামক যে একটি শ্রদ্ধেয় ভাবকল্প রয়েছে সেটিকে ধ্বংশ করাও শৈলেশ্বরের উদ্দেশ্য।

এই কাব্যে দূরান্বয়ী ভাবনা ও আপাত অসংলগ্ন বক্তব্যকাঠামোর উপস্থিতি সত্ত্বেও অদ্ভুত কিছু চিত্রকল্পের প্রয়োগ কবি করেছেন। যেমন ঃ (১) 'স্ত্রীলোক রয়েছে শুয়ে / তার জরায়ুর আঁশ এখনও রয়েছে গায়ে' (টার্মিনাস পার হতে গিয়ে)। (২) 'মায়ের গর্ভের মতো সমুদ্র' (বৈদ্যুতিক ১৯৬৪)। (৩) 'কমলালেবুর মতো বসন্তপল্লী নেমে আসে সাঁওতাল পল্লীতে' (শোকগাথা)। (৪) 'চারিদিকে দন্তোদ্গম উৎসবের আলো' (ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা)। (৫) 'হে ঘোড়া / তোমার নিশান আমার মুখের উপর চুম্বনতিথির / মত উড়ে আসে।' (ঐ)। (৬) 'কাগজের পাতায় জীবন বেঁচে টিকে আছে' (জন্ম নিয়ন্ত্রণ)।

শৈলেশ্বরের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অপরাধীদের প্রতি' প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। প্রকাশক ক্ষুধার্ত প্রকাশন। দাম ৩.৫০ টাকা। মোট ৬১টি কবিতা এখানে সংকলিত আত্মহননের ঘোর এখন কবি কাটিয়ে উঠেছেন। সংবেদনশীলতার প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে জীবনের অসঙ্গতিগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নেবার প্রয়াস পাচ্ছেন। পারিপার্শ্বিককে শুধু আঘাত নয়, জয় করবার অভীপসাও দেখা যাচ্ছে। কবির আমি বহু বচনাত্মক 'আমরা'র দিকে যাচ্ছে। তিনি মানুষকে আহ্বান করছেন, তাঁর সঙ্গী হবার জন্যে এবং তাদের সহযাত্রী হয়ে তিনিও নতুন কোন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে আগ্রহী। নাম কবিতার প্রথম পংক্তিটি এরূপ ঃ 'আসুন, আমরা আর একটি পৃথিবীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ি বাসোপযোগী মানুষ ...।' বলেছেন, 'এই বাড়ির বাসিন্দারা আজও ঐতিহ্যের হাতেই বন্দী হয়ে আছে ... অন্তর্দ্বন্দ্ব আমাদের জ্ঞানের ভিতর জ্ঞান হয়ে আছে।'[২৩] এই ঐতিহ্য থকে মুক্তি এবং জ্ঞানের অন্তর্দ্বন্দ্ব মোচন কবির লক্ষ। সে কারণে অপরাধ প্রবণ মানুষের অন্ধকার দিকগুলিকে কবি উপেক্ষা করতে চান না। জ্ঞানী ও অপরাধী একাকার হয়ে যায় কবিদৃষ্টিতে। কবির এই বিপ্রতীপতাকে উচ্চারণ করতে দেখা যায় 'নিরপরাধ মাংস' কবিতায়' - 'আমাদের ভালবাসা আছে এবং আছে ভালবাসা বহির্ভূত নিরপরাধ মাংস।' কিংবা 'হারার' কবিতায় ঃ 'গলিত হারারে

হৃদয়ের পর্ণকুটিরে ভীত সন্ন্যাসী শব্দে জয় করেছ অন্তর্বাহী অন্ধকার আর সেই অন্ধকারে আনন্দে হাঁটু ভেঙ্গে বসে আছ।' 'সন্ন্যাস' কবিতায় বলেছেন, 'খুন ও খুনীর মধ্যবর্তী ক্রিয়া বেছে নিতে হবে, এস সন্ন্যাসী, তোমার সাধনা, গোপন ভয়ের কথা চীৎকার করে জানিয়ে দাও, গৃহ অভিমুখে এই যাত্রী মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে বেঁচে থাকা কান্না শব্দ জীবরোল একবার মিথ্যা মনে কর, দেখবে শরীরের স্বভাব দরজা কি বিষন্নতা ঘিরে রাখে আমাদের?' অর্থাৎ সত্য শিব সুন্দরের আদর্শায়িত কাঠামো থেকে জীবনকে মুক্তি দেবার কথা বলেছেন কবি। জীবনের স্বাভাবিক বৃত্তি ও প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। জিঘাংসা ও রিরংসাকে প্রেম ও আনন্দের সঙ্গে পৃথক করে দেখার কথা ভাবেন নি। অনেক সময় তাদের সমন্বয়ের কথা বলেছেন। প্রচলিত ঐতিহ্য থেকে এখানেই এ ভাবেই শৈলেশ্বরের ভিন্নতা দেখানোর চেষ্টা। তাঁর ভাষায় ঃ

ফিরে এসো ত্যাগীজটা পিস্তলধারীর ভয়
ফিরে এসো সত্যরক্ষী ঘাতক তোমার জ্ঞান
ফিরে এসো মৃত্যু জামাকাপড় ছাড়া এই আমি ...
.... পৃথিবীর পাশে আকে পৃথিবী ফিরে এসো'
(নামহীন মন্ত্র পরম্পরা)।

প্রকৃতপক্ষে, দৃশ্যমান এই স্বাভাবকি পৃথিবীর পাশে অন্য এক পৃথিবীর ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন কবি। নিষিদ্ধ জগৎ নিষিদ্ধ চেতনার জয়গান করেছেন। তবে মধ্যবিত্তের যে স্বাভাবিক মূল্যবোধ তার থেকেও বেরোতে পারেন নি। শৈলেশ্বরের এই মধ্যবিত্ত দ্বিধা প্রতিটি কবিতার মধ্যে একধরনের টেনশান রচনা করেছে। 'বহুদৃষ্টি' কবিতায় বলেছেন,

এই তো উগ্র আবেগ আমার অপটু শরীরে জ্বলে উঠছ
তবু এই ইতিহাস গুপ্ত ভালবাসা জাগিয়ে দিয়ে বিপন্ন
হয়েছি আমি অনভিজ্ঞ বলে খুনীর কীর্ত্তিও বিস্মিত করে
জীবনে তাই প্রয়োজনহীন ভালবাসার সময়
এল না, দুঃখজনক মুখ নিয়ে যখন ঢুকে পড়ি বাজারে
ও শরীরে, মনে পড়ে সেই সমসাগরা রাত্রিভরা গান
আমাদের,জায়া ও জনকের মধ্যিখানে থমকে দাঁড়িয়ে থাকা পা দু'খানি,
হয়ত এই ভাবে প্রতিটি খুনী খুনের আগে শক্তি সঞ্চয় করে।'

বলেছেন 'খুনী আমি যাদের খুন করেছি ভালবেসে তাদের সঙ্গেই রয়ে গেলাম' (বাস্তবতার

পুনরারম্ভ)। আরেক জায়গায় বলেছেন,

> আমি যে গল্প শুরু করেছি আজ, তার কোনো শেষ হলো না, শেষ হবে না কোনোদিন, আসলে এটা একটা ছলনা, দুঃখজনক ও উত্তেজক নেশা, নেশা একটানা (নেশা)।

এগুলো তো অভিমানেরই কথা। এ কাব্যে কবির মূল বক্তব্য এ রকম ঃ

'এখন বলতে পারি, অপরাধী যা করে তাই তার অপরাধ নয়

পিতা সে অপরাধ করে বলেই তো তাকে 'অপরাধী বলার
সুখ ভোগ করতে পারছি আমিও - দুরারোগ্য এই ব্যাধি
বহন করে চলেছি আমরা, অপেক্ষা কেবলমাত্র জৈব রূপান্তরের
মগজ যখন সংস্কার বশেই অবৈধ প্রশ্নগুলি তুলে ধরে

অতিরঞ্জনই আমাদের ধর্ম, বিপজ্জনক চামড়ার মানুষ। জানি, আপৎকালে প্রথম শিথিলতা এসে যাবে আমাদেরই ক্রুর বেহালাবাজিয়ে নিগ্রোর অগ্নিপরীক্ষা হচ্ছে সাদা চামড়ার এজলাশ (আনন্দদিগন্ত)।

একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক, এত তত্ত্বকথা প্রকৃত কবিতার কতখানি উপকার করে? কিংবা কতখানি ক্ষতি করে? 'অপরাধীদের প্রতি' কাব্যপ্রসঙ্গে বলা যায় যে, একই তত্ত্বের পুনরুক্তি ও একই ধরণের বর্ণনা পাঠকের কাছে একঘেঁয়ে বোধ হয়। নিজের দুর্বলতা বরং কবি-ই যথার্থ স্পষ্ট করেছেন,

> 'মুখ ব্যবহার করে আমি গান নষ্ট করেছি
> শরীর ব্যবহার করে কবিতা ধ্বংশ করেছি' (যে কেউ নষ্ট করে)।

কবির দোলাচলতার ছবিটিও যথার্থ ঃ

> ' মৃত্যু আমাকে সুখী করে না
> জীবন আমাকে বেঁচে থাকতে বলে না' (ঐ)।

এই দ্বান্দ্বিক চেতনার অবিন্যস্ততার মাঝখানেই শৈলেশ্বরের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অপরাধীদের প্রতি'র অবস্থান ।

শৈলেশ্বর ঘোষের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'দরজা খোলা নদী' প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। প্রকাশক ক্ষুধার্ত প্রকাশনী। সংকলিত কবিতার সংখ্যা - ৬৫। এখানে কবির একক ব্যক্তি সত্তার প্রাধান্য। পূর্বের কাব্যগ্রন্থে যদি নিষিদ্ধের কল্পলোক কবিতার পটভূমি তো এখানে প্রকৃতির সান্নিধ্য ও

অনিবার্যতা। ডি. এইচ. লরেন্সের প্রকৃতির সঙ্গে এর খানিকটা মিল আছে। মিল আছে জীবনানন্দের সঙ্গেও। কবি বলেন,

'দরজাখোলা এক নদীর মধ্যে ঢুকে পড়েছি আমি এই আমার আকাশ পথ' (দরজা খোলা নদী)। কিংবা 'সৌর পৃথিবীর নাবিক আমি ছায়াপথে ঘুরে বেড়াই' (ছায়াপথ)। প্রকৃতির মধ্যে কবির এই ভ্রমণ, অন্তরঙ্গতা শুধু শূন্যতা, অপরাধ ও ধ্বংশের কথা বলেনি, ভালবাসার কথাও বলেছে। বলেছে সৌন্দর্যের কথা, তন্ময়তার কথা। হাংরি কাব্যসাহিত্যে সবচেয়ে নিবিড় প্রেমের কবিতা আছে এই কাব্যেই। শুধু তার ভাষাটাই যা আলাদা। লক্ষণীয় 'সরস্বতী' কবিতার এই পংক্তিমালা,

> দুঃখকে জয় করতে যাব আমি ও সরস্বতী - এলোচুল বেঁধে নাও
> গরম নিঃশ্বাস, প্রসারিত হাত, হাতের বেষ্টন মরা জ্যোৎস্নায় কাঁদে এক
> পাখি - এগোই আমি নির্জনতা ভালবেসে মরি তাকে অনুসরণ করে
> চলে আসি গুহায়, জঙ্গল ভূতগ্রস্ত আমি সরস্বতীকে এভাবেই ভালবাসি
> যদি জীবন ফিরে আসে,' কিংবা 'বিশ্বাসঘাতকের জুতা

কবিতার শেষ লাইনগুলি ঃ

'হলুদ পাতা ঝরে পড়ে, আকাশের জলে শুকনো মাটি হয় কাদা
তবে সব কিছু শেষ হয় নি পৃথিবীতে! নাও ঘ্রাণ ... ঐ উন্মোচিত স্তন...
শিকারীর গন্ধ দূর থেকে পায় পশুরা ... সহজাতদের প্রকৃতি
আকাশ তাই নীল ... ধরে থাকে ফুল ... সবুজ হয়ে আছে বন।'

এই কাব্যের কবিই বলতে পেরেছেন,

'আমার আকাশে যখন সূর্য থাকে না শরীরের
তটরেখা ভরে নক্ষত্রেরা ফুটে ওঠে
এক করুণ আলো সারারাত জাগিয়ে রাখে আমাকে
তখনই আমি তোমাদের সকলের সাহায্য চাই'

(লিপি প্রতিলিপি)।

'বিকেলের চা' কবিতায় শৈলেশ্বর বলেছেন, 'ভালবাসার হিংস্রতা আমাকে মুগ্ধ করে।' সত্যি তাই। 'দরজা খোলা নদী'-তে কবির মুগ্ধতার যে কত রূপ! এই মুগ্ধতা ও বিস্ময়বোধকেই পাচ্ছি রোম্যান্টিকতা সম্পর্কে থিওডোর ওয়াটস ডানটন ও ওয়াল্টার পেটারের বহুখ্যাত মন্তব্যে (ক) The renascence of wonder - Dunton (খ) Addition of strageness to

beauty - Walter Pater.। যদিও শৈলেশ্বরের রোম্যান্টিকতা তিক্ততা ও ঘৃণার সংমিশ্রণ, কালো ও শূণ্যতাময়, তবুতো তাকে বাস্তবতার বিবর্ণতার সঙ্গে মেলানো যাবে না। 'দরজা খেলা নদী' কাব্যে বিবর্ণতাকে স্থান দেননি কবি। বরং কালোর সঙ্গে লাল, সবুজ, নীল ইত্যাদি নানা রঙের ব্যবহার করেছেন। সমুদ্র ও অরণ্য, সমতল ও মরুভূমি, আলো ও অন্ধকার, নক্ষত্র লোক ও ধরিত্রীভূমির নক্শা তৈরী করেছেন। জোয়ারের শব্দ ও মধ্যরাতের গান, জাহাজের বাঁশী ও নোঙরের শব্দ এরূপ নানা ধ্বনি তরঙ্গকে কবি তাঁর কবিতায় খেলিয়ে দিয়েছেন। কবির চোখে পড়েছে —

"ভোরের পাখি একটি নক্ষত্র ঠোঁটে করে নিয়ে
এসে বসে গাছে
মনে পড়ে কেউ একদিন দয়াপরবশ হয়ে
এসেছিল খাবার দিতে
নদী নালাগুলো ঝলমল করে উঠছে' (নতুন ঠিকানা)।

কিংবা

'আমি অপেক্ষা করি এমন এক মুহূর্তের যখন মৃত্যু রূপান্তরিত হয়
জীবনে, জল শূন্যে গিয়ে হারিয়ে ফেলে রূপ, ফুল যখন সূর্যের
সাথে সম্পর্কিত হয় স্বেচ্ছায় অতিথি হয়ে চলে আসি তোমাদের
ঘরে, অপরিচিত এখ পুরুষের সাথে এখানেই আমার পরিচয়'
(প্রপাতের দেবতা ও কুকুরগুলি)।

এই কাব্যে যত কথাই থাক, মূল সুর এক প্রেমিকযুগলের সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বের উপরেই বেজে উঠেছে। মাঝে মাঝে যৌনতা ও যৌনবিকৃতি ও বহু যৌনতাও এসেছে ঠিকই কিন্তু আর্তি রয়েছে দ্বৈত নর-নারীর। যে প্রেম পৃথিবীতে নেই বলে কবির আতঙ্ক, তারই অন্বেষণ। তিনি বলেন —

' এক মানুষের জন্য যখন আমার চিন্তা ভাবনা সব এলোমেলো
হয়ে যায় সেই হয় আমার ভালবাসা
আমার ছোঁয়ায় যখন শরীরে হাজার সূর্য জ্বলে ওঠে
সেও হয় আমার ভালবাসা
ভালবাসাহীন সূর্য কি একদিন এই পৃথিবীকে ধরে রাখবে আর?' (লীন তাপ)।

অন্যত্র বলেছেন, 'সূর্যকে পেয়েছে বলে গাছ সবুজ, বহন করে নিজের ওজন আর শূন্যতার ভার' (মহাকাশ মহাশূন্য)।' অতএব প্রেমের মধ্যে একটা কামনা, তীব্রতা আছে যা প্রেমিককে

তরতাজা রাখে, তার ভার ও শূন্যতাকেও মানিয়ে নেবার শক্তি দেয়। সাধারণভাবে, নিশ্চয়ই এ কথাগুলি কিছুই নতুন নয়, কিন্তু একজন হাংরি কবি যখন তাঁর কাব্যে এই তত্ত্বটিকেই বার বার প্রতিষ্ঠা দেন, তখন তা আমাদের আশ্চর্য করে বৈকি। 'দরজা খোলা নদী'তে মূল বিষয়বস্তু ও উপকরণ কী এ প্রশ্নের একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর শৈলেশ্বর যেন তাঁর একটি কবিতাতেই ধরে রেখেছেন ঃ

আমাদের আকর্ষণ করে ফসল মাটি আর ঘাস
নিয়ম না মেনে ছিঁড়ি ফুল, পাপড়িগুলি, আমাদের বিশ্বাস
ধীরে ধীরে মরে যায়, শুকায় রং ... শুধু দুঃখের উপকথা
আমাদের ভালবাসতে বলে - এই তো মধ্যরাত্রির আকাশ
এরই তলে আমাদের মৃত্যুর সাধনা — স্বপ্নের প্রকাশ
কিশোরীর লুকানো বুকে মাতালের প্রশ্বাস ফিরে চাই
প্রকৃতির নদী ...' (অভিকর্ষ)।

লক্ষণীয়, এখানে কবির কোনো ক্ষোভ বা ক্রোধ নেই, আছে জীবনের প্রতি ভালবাসা। প্রকৃতি ও প্রেমলালিত সহজ জীবনের প্রতি আকূতি।

শৈলেশ্বরের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'পূর্ণগ্রাস' প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। প্রকাশক, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী। দাম সাত টাকা। সংকলিত কবিতার সংখ্যা - ৬৫। কবির ক্রোধ, প্রতিবাদ এবং আবেগ এখন স্তিমিত। বরং তত্ত্বপ্রাধান্য এবং উপলব্ধির প্রতিবেদন রচনার দিকে ঝোঁক। নিরর্থকতার বোধ, মৃত্যুর অনিবার্যতা, অচরিতার্থতার ঘোষণা বহুবার এই কাব্যে করা হয়েছে। 'জন্ম নিয়ন্ত্রণ' থেকে 'দরজা খোলা নদী' পর্যন্ত একজন তরুণ কবিকে পাওয়া গিয়েছিল; 'পূর্ণ গ্রাসে' এসে তিনি প্রৌঢ় হয়ে উঠেছেন। না, নতুন কোনো অভিযান নেই আর, চেতনার কোন আবিষ্কার নেই; পুরনো ভাবনা চিন্তার সঞ্চয়কেই একটু বিস্তৃত ও গম্ভীর সুরে কবি এখানে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। এ কাব্যের কবিতা ব্যাখ্যামূলক। সেই ব্যাখ্যার পরে একটি সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠাও করা হচ্ছে। ফলে সন্দেহ হয়, অনুভূতি নয়, জ্ঞানের প্রচার যেন 'পূর্ণগ্রাসের' উদ্দেশ্য। অথবা একটি চিত্রনির্মাণ কবির চোখে মানবজীবনের একটি চিত্রপট রচনা। কবি বলেছেন,

'পুনর্জন্মের পাখি হয়ে ফিরে এসেছি আমি
ঃ কোন পূর্বস্মৃতি নাই
মনে পড়ে না বেশ্যাদের মুখ, মনে পড়ে না খেলা আর ক্ষুধা ...
মেঘের বুকে সুপ্ত বজ্র, আকাশ যুদ্ধ পরবর্তী শান্তির মত থমথমে
(পুনর্জন্মের পাখি)।

এই কাব্যে কবির প্রেমিকা সরযূকে ঘুমের কথা আছে, এমনকি নিজের পচে যাওয়া শবের কথাও আছে। মৃত্যু ও ধ্বংসের শেষে সব কিছুই তো একদিকে নিরর্থক ও শূন্য, তবু তা যেন আধুনিক জীবনের বাস্তবতা। আর সেই বাস্তবতার রূপ ও স্বরূপ নির্ণয়ই শৈলেশ্বরের উপজীব্য। 'সামনে কী আছে' কবিতায় বলেছেন, 'কী আছে সামনে আমাদের ? পাকা শস্য কিছু পড়ে আছে মাঠে

আনন্দ দুঃখ ভয় আর ভালবাসা ঃ জ্ঞানীর গ্রন্থ আজ পোকায় কাটে
কী আছে সামনে আমাদের? জোয়ারের জল রাস্তায় এসেছে উঠে
সহবাস আর মৃত্যু?

আরেক স্থানে বলেছেন,

'আমাদের কান্না গলিতে স্বাধীনতার প্রশ্ন নেই
মৃত্যু ও মাটি পরস্পরকে গেলে
বহুহরণের সময় ধর্মও কত অসহায়
স্বেচ্ছাচার সমাপ্ত হলে পশু তার আত্মবলে ফিরে যায়
যে হৃদয় পোকায় কাটেনি তাকেই আজ সকলে খায়' (মৃত্যু ও মাটি)।

এই চূড়ান্ত নেতির প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের কথা আমাদের মনে পড়তে পারে। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের পরিশীলিত জ্ঞান, ইতিহাসচেতনা, দর্শনপ্রেক্ষা ও বৈদগ্ধ্যের একেবারে বিপরীত প্রাকৃতভূমিতে শৈলেশ্বরের অবস্থান। তবু একাধিক কবিতায় শূন্যতাবোধের পুনরুচ্চারণে এবং 'রক্ত গোধূলি'তে মরুসন্ধ্যার চিত্রায়ণে সুধীন্দ্রনাথ উঁকি দিয়ে যান। কখনও বা শৈলেশ্বর একজন শ্রমণের মতো জীবন থেকে দূরে সরে গিয়ে তাঁর অতীত জীবনের মায়াবদ্ধতাকে এক অদ্ভুত উদাসীনতার সঙ্গে লক্ষ করেন ঃ

আমাকে বলা হয়েছিল সমুদ্র অতিক্রম কর
আমি সমুদ্র অতিক্রম করলাম
বলা হয়েছে পর্বত লঙ্ঘন কর
আমি পর্বত লঙ্ঘন করলাম
বলা হয়েছে শ্বাপদসংকুল অরণ্য ভেদ কর
আমি ভয়ংকর অরণ্য পার হয়ে এলাম
সেখানেই দাঁড়িয়েছিল সে
দূর থেকে কামনা করেছিলাম যাকে

রোমাঞ্চিত হয়েছিল সব কটি জীবন বুকের কেন্দ্রে এসে
তারই শরীরে পেলাম আবার অরণ্যর স্মৃতি
সমুদ্রের ঢেউ, মেলে ধরা বর্তমান
প্রথম প্রবেশ
আমি তার ভিতর দিয়ে পাহাড়ের বরফ গলা
জল হয়ে নেমে এলাম
... আমাকে বলা হল অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে যাও
আমি ফিরতে লাগলাম
অরণ্যে স্মৃতি নাই, সমুদ্র সীমায় স্তব্ধ
পর্বত হারিয়ে ফেলেছে তার উচ্চতা
অস্পষ্ট কলঙ্করেখা শুধু দেখা যায় দূরে'

শৈলেশ্বর নিজেকে বলেছেন, ধর্মহীন। আমরা বলি, প্রাকৃত। কারণ একজন প্রাকৃত মানুষের মতই তাঁর আশা, আকাঙ্খা এবং জীবনবোধ। 'হেমন্তের ফুল' কবিতায় নিজেকে বলেছেন, 'দরিদ্র মানুষ, জীবন সন্ধানী'। 'ধর্মহীন' কবিতায় বলেছেন, 'হৃদয় এক উপত্যকা ছিল —

আশা ছিল - মৃত্যুর গাছ ছিল
মাথার উপরে কর্কটক্রান্তির সূর্য মৃত্যুর গুহা পর্যন্ত
চেটে নিয়েছিল সেই ক্ষুধা - দেহোপজীবী মানুষ আমরা
সমুদ্রের কিনারায় দাঁড়িয়ে কেবলই ভেবেছি মুক্তি আর
ভেসে যাবার কথা।'

অসীম সেই ক্ষুধায় শৈলেশ্বর তার প্রেমিকা সরস্বতীকে, নানা রূপোপজীবিনীকে গ্রহণ করেছেন। শেষে তছনছ করেছেন নিজেকে। সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অসীম ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে'? অবশ্য আত্মভুক শৈলেশ্বর শূন্যতাকে অতিক্রম করেন নি, প্রার্থিত করেছেন শূন্যতাকে। তাঁর 'ধর্মহীন' 'পুনর্জন্মের পাখি', 'রসদ' 'পূর্ণগ্রাস', অনিয়ন্ত্রিত 'বাস্তবতা', 'অন্তর্নিহিত জীবন', 'চৈত্র আততায়ী', 'সীতা' প্রভৃতি প্রত্যেকটি কবিতাতেই শূন্যতার পরাক্রম পতাকা উড্ডীন করেছেন তিনি। এই কাব্যে এসে শৈলেশ্বর অন্য প্রতীক গ্রহণ করেছেন। যেমন 'মোহানা' কবিতায় — 'আক্রমণের পর একা, তাই অশ্রুবর্ষণ'? ইতিহাস মিথ্যা ছিল মিথ্যা ছিল আমার সব যৌনআরাধনা।" এই কাব্যে শৈলেশ্বর 'বুদ্ধে'র প্রতীকটি বিশেষভাবে ব্যবহার করেছেন কারণ বুদ্ধদেব সুন্দরী স্ত্রী, পুত্র, সোনার রাজত্ব

ত্যাগ করে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। প্রচার করেছিলেন অহিংসার বাণী। রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দের কবিতায় বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ ও তত্ত্ব গভীর প্রভাব রেখে গেছে। শৈলেশ্বর ঐ বুদ্ধদেবকে ভিন্নভাবে তাঁর কবিতায় প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। 'বুদ্ধ উপত্যকা' (১) কবিতায় প্রথম পংক্তিতেই ঘোষণা করেছেন, ' উপত্যকায় এসে বুঝতে পারলাম রক্ত ছাড়া সন্তুষ্ট হবে না ভালবাসা আমার।' বুদ্ধ উপত্যকা(২) কবিতায় শেষ পংক্তিতে বলেছেন, 'এ উপত্যকায় আজ মুখোমুখি খুনী আর জ্ঞানী।' গ্রন্থের শেষ কবিতা 'কালো বুদ্ধ' কবিতায় লিখেছেন,

'নিজের গুহা থেকে বেরিয়ে এল বুদ্ধ
বাইরেই অন্ধকার এবং শান্তি
জ্ঞান পূর্ণ হয়েছে তার, ক্ষুধার্ত বোধ করছে তাই।'[২৫]

কবি দেখিয়েছেন, এই কালোবুদ্ধ একজন আধুনিক মানুষ। প্রবৃত্তির নির্বাপন নয়,প্রেম ও করুণার প্রকাশ নয়, হিংস্রতার উদ্ভাসন তার মধ্যে। তাই, —

'এক স্ত্রীলোক খাবার নিয়ে এসে রাখল সামনে তারপর নগ্ন হয়ে দাঁড়ালো,
ঠিক যেন তার নিজেরই গুহা
প্রথমে খাবার পরে ঐ স্ত্রীলোককে ব্যবহার করল সে
ক্ষুধার্ত সমুদ্র শান্তি হল না তবু, চেপে ধরল গলা
করুণাবশত তাকে হত্যা করতে হল - শূন্য থালা
কুড়িয়ে নিয়ে চলল, শরীরে শূন্যতার আলো
তোমাদের পূর্ণ করতে এসেছিলাম, ভালবাসা আর অর্থ দান করে গেলাম,
চিনে নাও অতিপ্রাকৃত সব গর্ত
দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে বুদ্ধ নিজেই আজ প্রাকৃতিক এবং কালো

এখানে ক্রমান্বয়ে ক্ষুধা, যৌনতা, হত্যা ইত্যাদির পরেও হৃদয়ের শূন্যতার কথা বলে শৈলেশ্বর সমকালীন জীবনের শুধু একটি রূপ নয় সমালেচনাও করেছেন। আধুনিক নিষ্ঠুরতাগুলিকে পরিস্ফুট করবার জন্য শৈলেশ্বর বিদ্রুপ ও ঠাট্টার আশ্রয়ও নিয়েছেন এই কাব্যে ঃ

'অপরাধগুলি শেষ করে তৃপ্ত বোধ করছ তুমি ?

শ্মশানে কীসের কান্নাকাটি — যত রক্ত পড়বে মাঠে তত ভাল ফসল হবে?' (অনিয়ন্ত্রিত বাস্তবতা)।

শৈলেশ্বরের 'পূর্নগ্রাস' আসলে এক বিপন্ন কালবেলার কাহিনী। জীবন ও মৃত্যু, প্রেম ও

ঘৃণা, আলো ও অন্ধকার, স্বপ্ন ও নৈরাশ্যের অপূর্ব যৌগপদ্য। কবির সামনে আর কোনো পৃথিবী নেই, —

পৃথিবীর পথ নাই - মৃত্যু আলোকিত
করে অন্দরমহল, সাপ আর ইঁদুর দুইই আলোকিত।[২৬]

কিংবা —

মাটি সন্দেহজনকভাবে ধরে রেখেছে আমাকে কোনো পরিণতি নাই —
বুক চাপড়ানোর শব্দে ধরা পড়ে প্রতি জন্মের নির্যাতন
সন্দেহজনক যাযাবর সঙ্গে রেখেছে ধুনি, ভিজে উঠেছে মরু ভূমির বালি -
দয়া দেখাও উপপ্লাবিত তুমি -
এখানে কি দরকার ছিল তোমার ? এর জবাব দাও
পাহাড় থেকে নামছে ঢল বুদ্ধ গেছেন কোথায়
ভিক্ষা নিতে গেছেন তিনি বেশ্যা, মাতাল আর খুনীদের কাছে
এখন তিনি আছেন কোথায় ?
শূন্য বলেন তিনি আছেন মাটিতে
পূর্ণ বলে তিনি আছেন সমুদ্রে

বাজারের অন্ধকারে তার অবস্থান
রূপান্তরিত ধানের উপর দিয়ে ভেসে যায় বিষাদসিন্ধুর গান '(ভিক্ষা)।'

বুদ্ধ থেকে বিষাদসিন্ধু, সন্ন্যাসী থেকে অপরাধী, কুশ্রী বাস্তবতায় সবাই আচ্ছন্ন এই ক্লিন্ন জগতের ভয়ংকর ও অসহনীয় রূপটিকে কবি এভাবেই নির্মাণ করেছেন। বুদ্ধ নেই এ ব্যাপারটি এখানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু তাই নয়, বাস্তবতার এই গলিত রূপ ও বিকৃতিকে অন্যভাবে বিশ্লেষণ করে নিজেকে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছেন এই ভাবে ঃ

অনুভূতিগুলি হরিয়ে আমি স্বাভাবিক এই শ্মশানে
খুঁজতে এসেছি, আমাদের কথাগুলির আর কি মানে
জীবন কল্পনামাত্র ? ...
কিছু শব্দ আমি শুনেছিলাম যা এই পৃথিবীর নয়
কিছু গান আমি শুনেছিলাম যা মানুষের নয়
কিছু মানুষ আমি দেখেছিলাম যারা এই সংসারের নয়
কিছু ভালবাসা আমি পেয়েছিলাম যা আলোকিত নয়

শব্দহীন এক ভূখন্ড আছে যা কখনই আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়' (শব্দ)।

বস্তু পৃথিবীর ক্লিন্নতার ভিতরে কবি, এখানে যেন এক অপার্থিব আলো খুঁজে পাচ্ছেন। বলা যায়, দৃশ্য ও অদৃশ্যের এই সেতু নির্মাণ; উভয়ের দ্বন্দ্ব জটিল বিমূর্ততাকে স্পর্শ করবার আকাঙ্খাই 'পূর্ণগ্রাসের' বৈশিষ্ট্য। এর সঙ্গে মেলে জাঁ আতুর র‍্যাবোর সেই হ্যালুসিনেশন বা ভিসনারী দৃষ্টিভঙ্গী ঃ "For he arrives at the unknown. Because he has cultivated his own soul ... He reaches the unknown; and even if, crazed, he ends up by losing the understanding of his visions, at least he has seen them. Let him die charging through those unutterable, unmeable things."[২৭]

শৈলেশ্বর ঘোষের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'উৎসব'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। প্রকাশক কবি নিজেই। কবিতা সংখ্যা ৩৩। কবিতাগুলো একটু দীর্ঘ আকারের। বক্তব্য বা ভাবনার দিক থেকে কোনো নতুন কথা নেই যা কবি আগে বলেননি। তবে মৃত্যু ও প্রকৃতিকে এখানে অনেক বেশী একাত্ম করা দেওয়া হয়েছে। সদর্থকতার ইশারা মিলেছে ক্বচিৎ কখনও। এমনকি সৌন্দর্যও পেয়েছে গুরুত্ব। লোকায়ত জীবনচেতনা, অবক্ষয়ী সামন্ততন্ত্র রচনা করেছে ভিন্নতর নকশা। কবি বলেছেন, —

'অচেনা দেবতার হৃদয় উপড়ে নিয়ে আনন্দে মেতেছি আমরা
মাটি খুঁড়ে বের করেছি দানাশস্য, মাটির বাসন, কঙ্কালের হাসি
ঝড়লণ্ঠন ঝুলছে মাথার উপর বিষাক্ত সাপের ডাক জীবনের প্রতি
সিঁদুর চিহ্ন শিলা, খেলার সাথী, জেগে থাকিস অন্দর মহলে

আমাদের পূজার মন্দির ভূষিত হয়ে আছে রক্ত আর ফুলে (পূজার মন্দির)। কিংবা 'আমাদের জীবন কাছিমের খেলা, সুস্বাদু মাংস ভরা আছে ভিতরে' (সুস্বাদু মাংস)। এখানে মৃত্যুর, ধ্বংসের ও রিরংসার যে উৎসবচিত্র শৈলেশ্বর রচনা করেছেন তাতে অনেক সময়েই আমরা এক অতিপ্রাকৃত এবং অ্যাবসার্ড জগতে চলে যাই। এই জগৎকে কবি কখনও বলছেন 'প্রেতপুরী', কখনও 'বিস্মৃতির দেশ', কখনও 'সমুদ্রহীন এক পৃথিবী', ইত্যাদি। কবি লক্ষ করেছেন,

'বন্ধ্যা চাঁদ মরা আলো সেও অস্তগামী
শিকারের রক্তে পিছল এই জীবনভূমি (চলো)।

অথবা 'খুন করে শব পুতে রেখেছি নিজেরই উঠানে, আমাদের মুখে তাই
কাঁশফুল হাসি
নিজেদের অপরাধ ভুল গিয়ে গন্ধ আর গানে আমরা মাতাল হয়ে আছি

ঋতুতে ঋতুতে চঞ্চল আমরা - অন্ধকার মাটি খুঁড়ে নিজেদের লুকানো শব খুঁজি
দড়ির টানে নৌকা নিজেকে চেনে, জলপথ তার কিন্তু ভ্রমণ তীরের কাছাকাছি
নিসর্গের সন্তান, নিজেকে বিচিত্র করব, তাই মুখে কিছু রঙ মেখে নিয়েছি
(রহস্য শব)।

মৃতদেহ , হাড় মাংস, ভিক্ষুক, মর্গ, উন্মাদ, গর্ভ, মাতাল, জন্মান্ধ, স্বপ্নদর্শন, মদ অপরাধী, খুন এই প্রকার যত শব্দের সমাহার এই কাব্যে রয়েছে তা সবই ফরাসী প্রতীকী কবিদের দান। তবে 'হিংসা সৌন্দর্যের' যে সন্ত্রাসকে যৌনতার আনন্দ উৎসবে কবি পরিণত করতে চেয়েছেন - সেটা তাঁর নিজের কল্পনা। জীবনানন্দের মত তিনি বলেননি, উৎসবের কথা আমি কহি না'ক / পড়ি না'ক গান।' কিন্তু শৈলেশ্বরের এই কাব্যে 'সূর্যের নীচে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় প্ররোচিত হয় — গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ডাকে মদিরার বান।' (উৎসব মদিরা)। আসলে, শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতায় হাংরিদের স্বাভাবিক গুণগুলি উপস্থিত থাকলেও কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাঁর। স্বাভাবিক গুণ বলতে প্রতিবাদ, যৌনতার প্রাচুর্য, অসমাজিকতা, অপ্রেম ও ঘৃণা, রুক্ষতা এসবই বোঝানো হচ্ছে। হাংরিদের নগর জীবন কেন্দ্রিকতাও তাঁর মধ্যে সুপ্রচুর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শৈলেশ্বর পাঠককে এই বস্তু পৃথিবীর ক্লেদ ও ক্লিন্নতার মধ্য দিয়ে যেন এক অপ্রাকৃত জগতের দিকে টেনে নিয়ে যান। শহর, গ্রাম, জনপদ পার হয়ে এক অপার্থিব জগতের মধ্যে ঠেলে দেন। তাঁর কবিতা তাতে আরও আকর্ষণীয় ও রহস্যময় হয়ে ওঠে কিন্তু এই প্রকাশ, এই পরিণতি গতানুগতিক উত্তরণ জাতীয় কিছু নয়। যদি তা হতো, তবে হাংরি কবি হিসেবে শৈলেশ্বর তাঁর গুরুত্ব হারিয়ে ফেলতেন। অন্য আধুনিকের বৈশিষ্ট্যই অর্জন করতেন তিনি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই শৈলেশ্বর এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন। 'জন্ম নিয়ন্ত্রণ' কাব্যের 'বাড়ী খুঁজতে গিয়ে' কবিতায় বলেছিলেন —

চলে গেলাম মায়ার দিকে মায়হীনতার দিকে
স্বপ্ন এবং স্বপ্নহীনতার প্রতিশব্দবিহীনতার দিকে।
এই কবিতাতেই বলেছিলেন, বাড়ি ঘর খুঁজতে গিয়ে
দক্ষিণ সমুদ্রের পরেই আমার মৃত্যু
দক্ষিণ সমুদ্রে পারে আমারই ময়ূরপঙ্খী
বাদাম ফুলে উঠছে।
'দরজা খোলা নদী' কাব্যে 'বিশ্বাসঘাতকের জুতো' কবিতায় শৈলেশ্বর
লিখেছেন, — হলুদ পাতা ঝরে পড়ে, আকাশের জলে শুকনো মাটি হল কাদা
তবে সব কিছু শেষ হয়নি পৃথিবীতে! নাও ঘ্রাণ ... ঐ উন্মোচিত স্তন

এমনকি প্রকৃতি থেকেও তিনি ইন্দ্রিয়ের তাপ গ্রহণ করেছেন। 'দরজা খেলা নদী' কাব্যে

'জীবনের খেলা' কবিতায় বলেছেন, —

সমুদ্রে গন্ধে আমার ইন্দ্রিয় চৈতন্য হয়
বরফের শৈত্যে আমার চেতনা ইন্দ্রিয় হয়।

'উৎসব' কাব্যে আমার আনন্দ কবিতায় বলেছেন, —

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় থমকে গেলাম, সৌন্দর্য এই রাত্রির বুকে
জাগিয়ে তুলেছে রক্তের পিপাসা —

এখানে প্রকৃতি যেন হিংস্র জন্তুর মতো হয়ে উঠেছে। সুতরাং প্রকৃতিকে নানা ভাবেই এ কবি ব্যাখ্যা করেছেন। শৈলেশ্বরই সেই হাংরি কবি যিনি প্রেমের আকাঙ্খাকে এভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন — 'উদ্দীপনা নক্ষত্র স্বাগত জানাই তোকে - হৃদয় ছিল এক অন্ধকার দেশ। সেখানেই ডেকে উঠেছিল পাখি, হৃদয়ে ছিল এক সুপ্তির সমুদ্র সেখান থেকে উঠে এল বন্য প্রজাতি' — (স্বপ্নদর্শন, উৎসব কাব্য)। এই ধরণের আধা রোম্যান্টিক, আধা প্রকৃতিবাদী - জৈবিকতার প্রকাশ শৈলেশ্বরের কবিতাকে ভিন্ন ধরণের স্বাতন্ত্র্য দান করে। শুধু ষাট দশকের উত্তাল সময় নয়, সমকালীনতাকে অতিক্রম করে মানবজীবনের অন্তর্লীন দ্বন্দ্বকে, রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের নানা গোপন বেদনাগুলোকেও তিনি রূপদান করেন। হাংরিদের হঠকারী চেতনার সঙ্গে বেদনার এই অনুরণন শৈলেশ্বরের কবিতাকে মায়াময় করে তোলে।

(গ) প্রদীপ চৌধুরী ঃ

হাংরি সাহিত্য আন্দোলনের প্রথম যুগের সংগঠকদের মধ্যে প্রদীপ চৌধুরী অন্যতম। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯৪৩ সালে। অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লায়। খুবই ছোটবেলায় এপার বাংলায় চলে এসেছিলেন। প্রথমে কলকাতায়, পরে ত্রিপুরায় চলে যান। ছাত্রাবস্থায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে হাংরি সহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সেখানে কবিতা রচনায় অশ্লীলতার দায়ে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে ভর্তি হন। সেখানে সুবো আচার্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। দু'জনেই হাংরি সাহিত্য আন্দোলনের অংশভাক হন। সেখান থেকেই ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে এম. এপাশ করেন। এদিকে হাংরি বুলেটিনে লেখার জন্য পুলিশ তাঁকে ত্রিপুরা থেকে ধরে নিয়ে আসে। তাঁর পিতা সেখানে থাকতেন। ভারতীয় কয়েকটি ভাষা ছাড়াও প্রদীপ চৌধুরীর গ্রন্থ ইংরেজী, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে প্রদীপ বিবাহিত। তাঁর স্ত্রী ও একটি পুত্র আছে। স্ত্রীর নাম গৌরী চৌধুরী। পেশায় প্রদীপ বিদ্যালয় শিক্ষক এবং বহু বছর ধরে কলকাতার কাছে যাদবপুরে বসবাস করছেন।

প্রদীপ চৌধুরীর প্রথম গ্রন্থ 'অন্যান্য তৎপরতা ও আমি' ১৯৬৪ সালে বেরোয় ত্রিপুরার আগরতলা থেকে। এটি গদ্য ও কবিতার মিশ্রণ। গদ্য অংশে আত্ম জৈবনিকতা ও কড়চার ধরণ। তাকে স্বগতোক্তিও বলা যায়। কবিতা অংশে আছে এগারোটি রচনা। সমাজ, সভ্যতা, ইতিহাস, নগর ও প্রকৃতির টানোপোড়েনের ভিতর দিয়ে এক তরুণ প্রেমিক কীভাবে নিজেকে অন্বেষণ করছেন তারই আর্তি এই এগারোটি কবিতার মধ্যে মেলে। প্রথম কবিতা 'শহর শহর'। এখানে প্রদীপ বলছেন, 'আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছ

আমার মা
ওঃ
অসহ্য
অসহা
ইতিহাসের পাতায় পাতায়
মানুষের
রক্ত
এবং
বুটের ঘা
ইতিহাস

আমাকে ফোঁপড়া করে দিয়েছে।'[২৮] 'নষ্ট গাড়িবারন্দা' কবিতায় বলছেন,

'১৯৫২ সালের খাদ্য আন্দোলন আমাকেও স্পর্শ করেছিল ...
বনের ভিতর অন্ধকার, বনের পেছনে নদী
আমার স্পষ্ট মনে পড়ে বেশ কিছুকাল সৎমার মাই চাটছিলাম।'

প্রদীপ চৌধুরী লীনা নামক তাঁর নারীকে বলছেন,

" এখন তোমার মুখে আদিম জ্যোৎস্না
ফোটে কাছাকাছি হ্রদতট ও খাদ
জ্যেৎস্নায় শুকিয়ে যাচ্ছে আমাদের বিরহ ও যৌন কোলাহল"
(বিধ্বস্ত উপজাতি)

আরেক জায়গায় বলেছেন, "নির্ভুল বিকেলে আমি উত্তরের মাঠে গিয়েছিলাম অথচ প্রতীক্ষার ত কাউকে দেখিনি পথের দুধারে আমি স্মিত কুসুমের নাম একে একে জানতে চেয়েছি - প্রত্যেকেই আশ্চর্যনীরব।' (সাময়িকতা)। 'একজন্মের পাপ' কবিতায় নারীর উদ্দেশ্যে বলছেন, 'একুশ ঋতু মাতাল ঋতু মাথা কোটে দুর্বিনীত, তোমার ভালবাসা মানেই বিপন্নতা।' এই গ্রন্থের শেষ

দুটি কবিতা প্রেমিক তোমার চাবুক', এবং 'সমুদ্র' রোম্যান্টিক প্রেমভাবনাতেই পরিসমাপ্তি পেয়েছে। বলা যায়, প্রদীপ চৌধুরী প্রেমহীনতা ও প্রেম বিপন্নতার ছাঁচটি বজায় রাখতে পারেন নি।

প্রদীপ চৌধুরীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ '৬৪ ভূতের খেয়া' ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশ পায়। যদিও মুদ্রিত হয় আগরতলায়। এই গ্রন্থে ত্রিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কলকাতা মহানগরী, তার যান্ত্রিকতা, মানবিক সম্পর্কের অন্তঃসারশূন্যতা, যৌনতার অস্থিরতা ও প্রলাপ এবং ব্যক্তি আমির হাহাকার এখানে প্রভূত ছড়িয়ে আছে। অনেক সময় সমর সেনের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, 'মহানগরীর বিবর্ণ দিন ও আলকাতারার মতো রাত্রি'র কথা। তফাৎ এইখানে যে, সমর সেন বলেছিলেন বন্ধ্যা শহরের কথা। আর প্রদীপ বলেছেন, জারজ শহরের কথা। সমর সেন চলে গিয়েছিলেন সাঁওতাল পরগণার শাল মহুয়ার রুক্ষ্ম প্রান্তরে, আর প্রদীপ শেষ পর্যন্ত এই শহরের মধ্যে এবং আত্মকৃত জটিলতার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছেন। প্রদীপ নেশাগ্রস্ত — প্রতিবাদ ও প্রতিযোগিতার গোলোকধাঁধায় অংশগ্রহণকারী একজন সংবেদনশীল মানুষ। তাই খুবই ব্যাঞ্জনাগর্ভ ভাষায় প্রদীপ বলেন —

এই শহরের শেষ মোমবাতিও আমার টেবিলে জ্বলে গেল
এই টেবিল থেকেই লাফিয়ে পড়েই আমার
বিড়াল খুঁজবে তার ক্ষুধার্ত আত্মা
তার লালসা পিঙ্গল চোখ, নরম থাবা
দিয়ে সে আমার আন্ডারওয়ার
ছিঁড়েছে মানুষের বিবেকের মতো
লীন হয়ে গেছে আমার সঙ্গে
মানুষের মতোই সে আমাকে ব্যবহার করে
পাণ্ডুলিপি ছিন্নভিন্ন করে' (বিড়াল)।

অথবা 'সব যানবাহন ছুটছে ছুটছে
কোলকাতায়
স্কোয়ার
এভেন্যু পার্ক গণিকাপল্লী গোলপার্কের ভেতর দিয়ে
সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে
যানবাহনে বদলে যাচ্ছি বধিরতায় রক্তে মেদে পরিপূর্ণ, (সময়-ধর্ষিত ভাঁড়)।

প্রদীপ বলেছেন, 'গ্রন্থিহীন এ শহর, শেকড়হীন সভ্যতা ও ঈশ্বর ভাইরাস
এক পবিত্র জীবনস্রোত সাঁতরে এসপ্লানেড

পেরোচ্ছি, আমরা, আমি ও সুভাষ' (মাথার ভেতরে বিস্ফোরণ)।

পবিত্র জীবন ? কী সেই পবিত্রতা? যেখানে ঘৃণা, ক্লান্তি, অপ্রাপ্তি ও শূন্যতা ছাড়া কিছুই নেই সেখানে 'পবিত্র' শব্দটি একধরণের তির্যক ঠাট্টা ছাড়া কিছুই নেই। পৃথিবীর যাবতীয় বিসংগতিকে যিনি আত্মপীড়নের শারীর ক্রিয়ায় মুক্তি দেন তাঁর কাছে 'পবিত্র' শব্দটি রসিকতা ছাড়া আর কী? 'কালো দিন কালো রাত্রি পৃথিবীর কালো খেলাধূলা'য় অংশগ্রহণকারী প্রদীপ শেষ পর্যন্ত নিজের শরীরের মধ্যেই গুটিয়ে যান ঃ

"নিশুতি শরীর কিংবা নশ্বর দেহের মতো রাত আমার শরীরে পথ, শরীরের মতো চোরা গলি' (এই নষ্ট দেহ আবার নিজের কাছে চলে আসে)।

জীবনানন্দ নিজেরই মুদ্রাদোষে একা হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রদীপের একাকীত্বের জট একটু অন্য রকম ঃ

আমার সারা শরীরে
অক্ষমতা বা প্রতিভা যাই বলুন
আমাকে নিয়ে আসে
রঙীন তটের কাছে একা, কবরের ভিতর একা
নগরের ভেতর একা, পার্কে ডায়েনিং টেবিলে একা,
যাদবপুর গড়িয়া বেতাইতলায় একা, প্রস্রাব করতে করতে
একা
অন্ধকারে একা, একা, একা
পুরুষনুক্রমিক রক্ত থেকে আমি বেরিয়ে এশ্চি
নয়া পয়সার হিসাব থেকে বেরোতে পারি না'

(সময় - ধর্ষিত ভাঁড়)।

তাই শহরের মধ্যে, নারী প্রেমিকার আবর্তে, জুয়ার টেবিলে, মাদকদ্রব্যে, খালাসী টোলায় একজন উদভ্রান্ত ভবঘুরে প্রদীপকে হতেই হয়। যদিও কোনও গন্তব্যে তিনি পৌছতে পারেন না। তাঁর নিজের ভাষায় ঃ

'খেয়া পারাপার হয় না
কেবল এ ফুল থেকে ঐ ফুলে চলে যায়
জীবনের বিষাক্ত পরাগ'

(মধ্যরাত, অক্টোবর ১৯৭০)

প্রদীপ চৌধুরীর তৃতীয় ও শ্রেষ্ঠ কবিতাগ্রন্থ 'কালো গর্ত'। ১৯৮৩ সালের মে মাসে কলকাতা থেকে এটি প্রকাশিত হয়। মোট সংকলিত কবিতা বাহান্নটি। এই কাব্যে অল্প হলেও স্বপ্নের এবং ভালোবাসার অস্তিত্ব জানান দিয়েছে। গ্রন্থের প্রথম কবিতাটিতেই কবি বলেছেন,

"কিছু অপরাধীকে বলি, তোমাদের সামনে রয়েছ ভালাবাসার বিশাল দিগন্ত

তোমরা সংঘবদ্ধ হও...

অন্ধকার গর্ত থেকে তোমরা তোমাদের শিকড়গুলিকে

মেলে দাও স্কাই স্ক্রেপারের নীচে আত্মগোপনকারী

ভালবাসার বিশাল ফসলগুলি এভিনিউয়ের চারদিকে ছড়িয়ে দাও"

- (গোলপার্ক)

শুধু এটুকু নয়, গ্রাম ও শহরের মধ্যেও মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন কবি। আর হারিয়ে যাওয়া ধর্ষিতা বালিকা, গ্রাম্যবালিকা যেন নাগরিক বাস্তবতা ও বিরংসাকে জয় করে ফিরে এসেছে ঃ

'পূর্ব গোলার্ধের সবাই-এর সঙ্গে আমরাও

দেখব একদিন অস্তগামী সূর্য

গলিত সোনার মতো শরীর বিছিয়ে দিয়েছে

শহরের আর গ্রামের

গ্রামের আর শহরে এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে

আর তক্ষুনি পিঠ ভর্তি চুল এলিয়ে

গম্বুজ থেকে রাস্তায় নেমে এসেছে

আমাদের বোন,

তার মুখে গর্বিত ও অর্থপূর্ণ হাসি' — (নাগরিক উপকথা)

পূর্ববর্তী কাব্যে নগরীর কাছে যে আত্মসমর্পন ছিল কবির - তাও এখানে কখনও সখনও অন্তর্হিত। তাঁর ব্যক্তিত্ব যেন এখানে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। আমি হয়ে গেছে বহুবচন 'আমরা'। প্রদীপ লিখেছেন, 'এই নগরীর প্রবেশ ও প্রস্থান পথগুলি

আমাদের ক্ষুব্ধ শরীরের আঘাতে

তছনছ হয়ে গেছে ...' এবং

'কিছু সময়ের মধ্যে আমরা ঐ স্তম্ভকেও টেনে নেবো

ঘূর্ণি জলের কেন্দ্রাভিগ টানে'

(টি. ভি. টাওয়ার)।

অভিজ্ঞতাকে এ কাব্যে কিছুটা গুরুত্ব কবি দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এখানে কিছুটা প্রসারিত - শুধু নগর কলকাতা নয়, সমস্ত পৃথিবী ও পরিব্যাপ্ত সময়কে তা আশ্রয় করেছ। কবির নিজের ভাষায় ঃ

'এই ধাতুসূর্যের নীচে সম্পূর্ণ পৃথিবী
আমি এর প্রতিটি গলি ও
অন্ধগ্রন্থিতে উন্মত্ত অপভ্রমণ করেছি'

(ব্যক্তিগত ৬)।

অভিজ্ঞতার এই সঞ্চয় কি কবিকে কিছুটা আস্থাশীল করেছে? কালো অন্ধকারের মধ্যেও আলোর অরুণিমা সঞ্চারিত করেছে? কেননা কবি বলেছেন,

'আমি খুব বড় নদী দেখেছি
ভারতবর্ষে, মানুষের চূর্ণ সভ্যতায় ...
আমি ভারতবর্ষের গোঁড়ালিতে
ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি
আমার চোখের সামনে মাথার খুলির সমুদ্র
এবং অর্থপূর্ণ হাই-ফাই সঙ্গীত
ভারসাম্য, ভালবাসা, সক্রিয় উত্থান
লোহিত সাগরের বুক চিরে সূর্য ওঠে
এবং কিছু দরকারী উত্তাপ রেখে ডুবে যায়' (দুই অধ্যায়)।

জীবনকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন একটি অলৌকিক ও মহার্ঘ অভিজ্ঞতা হিসেবে ঃ

' এই তো মানুষ জন্ম, শেষ সত্য আমাদের
পাহাড়ী ঝর্ণার পাশে বিস্মিত চোখের দেখা
ছাড়াছাড়িহীন' (দীর্ঘযাত্রা)।

তাহলে মিলনও সম্ভব? প্রকৃতির সঙ্গেও প্রদীপ একাত্মতা গড়ে তুলেছেন।

— " চৈত্রের বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে নিজের কথা
শোনো, শোনো আমি কি বলছি
আমি এক অতিকায় নিয়ম, উজ্জ্বল তারা
মেঘের গিঁট -" (গ্যাস স্টেশন - কাট্ আপ)। যদিও এ কবিতায়

শেষের দিকে তিনি বলেছেন, 'অসুস্থ দিগন্তরেখা কালো হয়ে যাচ্ছে
যথেচ্ছাচারী হাঁসের ঝাঁক।'

আবার যে ভবিষ্যৎ তাঁর সামনে তা ঘটনাহীন শূন্যতায় অর্থহীন। প্রদীপের প্রথম কাব্যগ্রন্থে তাঁর যে আত্ম-অন্বেষণ ছিল তা তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে এক দীর্ঘ যাত্রার মাত্রালাভ করেছে। এইখানে আপাতভাবে তাঁর সঙ্গে মলয় রায় চৌধুরীর মিল। কিন্তু দুই কবিরই প্রকৃত উৎস 'চসারের' কবিতা। কারণ 'ক্যান্টারবেরি টেলা' স-এ এমনই এক অভিযাত্রার ছবি ছিল। যাই হোক, প্রদীপ বলেছেন, 'মানুষের দীর্ঘযাত্রা সমুদ্রের দিকে / ব্যাঞ্জো ও বল্লম হাতে' (দীর্ঘযাত্রা)। তবে প্রদীপ যাত্রার ইতিহাস বা দ্বান্দ্বিকতা কোনোটিকেই শেষ পর্যন্ত পরিস্ফুটিত করতে পারেননি। যৌনবিকার ও অস্থিরতার বিশৃঙ্খলতায় হারিয়ে গেছেন। প্রদীপের নিজেরই ভাষায় বলা যায়,

"সমুদ্র প্রবল ক্রোধে পাথরের শক্রতা
ভোলে না,তার সাদা ফেনণা বিজ্ঞাপিত
মুখগুলিকে
একবার মাত্র ভিজিয়ে দিয়ে মরে যায়।'
(বিরোধী প্রতিষ্ঠান)।

সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে প্রদীপ চৌধুরীর কবিতা একধরনের বৈপরীত্যের গ্রন্থন। একদিকে ব্যক্তি আমি অন্যদিকে সময় সভ্যতার বিস্তৃতি, একদিকে কলাকাতা মহানগরীর পটভূমি ও অনুষঙ্গ, অন্যদিকে সমুদ্র, পর্বত তথা দূরাস্তীর্ণ প্রকৃতির সাহচর্য্য, একদিক তিক্ততা ও ঘৃণা, অন্যদিকে প্রেমের আততি। এ ভাবে বিপরীত ঊর্ণাজালে কবিকে দোদুল্যমান দেখা গেছে। তবে সেখানে দ্বন্দ্বের নকশা তৈরী হয়নি। কবি নিজেই বলেছেন, "এই সম্মোহন আক্ষরিকভাবে সত্য হতে পারত

এই বর্ণহীন মৃত্যু খুলে দিতেহ পারত
আকাশের চূড়ান্ত নীল রহস্য
এই মফঃস্বল প্রকৃতির মতো সত্য হতে পারত।"
(সম্মোহন)।

প্রদীপ চৌধুরী সম্পর্কে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। "প্রদীপের 'চর্মরোগ' গ্রন্থের মলাটে ওর দুই পা ফাঁক দাঁড়ানো ছবিটি যেন ওর স্বভাবের 'ইমেজ'।[২৯] যেন ও

সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ...ওর অজান্তে দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে কিছু পালিয়ে যাবে না?" তো ছবিটি স্পষ্টরেখ নয় বলে, সত্য সত্যই প্রদীপ অনেক সময় দিশাহীন হয়ে উঠেছেন। অমিতাভ দাশগুপ্ত ঠিকই বলেছেন, 'ওর লেখার মাঝেহ মাঝে প্রচন্ড ইল্যুমিনেশান আছে, সম্পর্ক আছে, মাঝে মাঝে অসম্ভব সত্যবাদী - কিন্তু প্রয়োজনীয় ঔদাসীন্য, নির্লিপ্তি বা যে জরুরী নিষ্ঠুরতা ছাড়া, মোহিতের ভাষায়, কোনো বৃক্ষ মাটির বুক ভেঙে ওঠে না - সেই আলটিমেট জিনিসেরই মর্মান্তিক অভাব।"[৩০] একথা আমাদেরও সত্য মনে হয়।

(ঘ) ফাল্গুনী রায় ঃ

ফাল্গুনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নষ্ট আত্মার টেলিভিসন' প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। বাসুদেব দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও রাজলক্ষ্মী প্রেস, হাবড়া, ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত। এখানে সংকলিত কবিতার সংখ্যা ১৪। ফাল্গুনীর কাব্যে একজন তরুণের প্রতিবাদ, জ্বালা যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। রাজনৈতিক প্রসঙ্গও চলে এসেছে সরাসরি। তবে কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ নির্ভরতা নেই। ধর্মের বিরোধিতা আছে, রাষ্ট্রের বিরোধিতা আছে, নন্দনতত্ত্বের বিরোধিতা আছে। সামাজিক সম্পর্কগুলির প্রতিও ঘৃণা আছে। অন্য হাংরি কবিদের মত তত্ত্ব বা বিমূর্ততার ধার তিনি ধারেননি। আবার তাঁর কবিতায় যে প্রবল চীৎকার লক্ষ করি তা মলয় রায়চৌধুরীর মত নিরাবেগ নয়। আবেগের উত্তাপই ফাল্গুনীর চীৎকারের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। তাঁর আবেদন মস্তিষ্কের প্রতি তত নয়, যতটা হৃদয়ের কাছে। তাই ফাল্গুনীর প্রকাশভঙ্গী অকপট, সরল। এতদ্ব্যতীত, তিনি যে মাদক সেবন করে কলকাতার পথে ঘাটে বা প্রকৃতির মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন তারও ছবি কবিতায় চলে এসে একটা আলাদা মাত্রা রচনা করেছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় যেমন একটা ঘোর লক্ষ করা যায়, তেমনই ফাল্গুনী রায়ের মধ্যেও। ফাল্গুনী 'নষ্ট আত্মার টেলিভিসন' কাব্যের প্রথম কবিতাটিতেই তাঁর বিষয় ও অভিপ্রায় জানিয়ে দিয়েছেন,

'এইখানে সমুদ্র ঢুকে যায় নদীতে নক্ষত্র মেশে রৌদ্রে
এইখানে ট্রামের ঘন্টিতে বাজে চলা ও থামার নির্দেশ
এইখানে দাঁড়িয়ে চার্মিনার ঠোঁটে আমি রক্তের হিম ও উষ্ণতা
ছুঁয়ে উঠে আসা কবিতার রহস্যময় পদধ্বনি শুনি - শুনি
কবিতার পাশে আত্মার খিস্তি ও চীৎকার এইখানে
অস্পষ্ট কুয়াশার চাঁদ এইখানে ঝরে পড়ে গণিকার রক্তস্রাবে' (এইখানে)।'

সমুদ্র ও নক্ষত্রের বিশালতার সঙ্গে কলকাতা মহানগরীর ধাতব যান্ত্রিকতাকে কবি যেমন এখানে মিশিয়েছেন, তেমনই, কুয়াশার চাঁদ, গণিকার রক্তস্রাব দুটি আপাতবিরোধী দৃশ্যময় বাস্তবতাকে

morbid metaphor হিসাবে প্রয়োগ করেছেন। এভাবে আধুনিকতা স্পষ্টতা পেয়েছে। এ কাব্যের দ্বিতীয় কবিতা 'আমার রাইফেল আমার বাইবেল।' কবিতাটির বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে উৎকট যৌনতা ও ধর্মবিরোধিতা থাকলেও তার উপসংহৃতি ঘটেছে রাজনৈতিক ইশারা দিয়ে। সমকালীন সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলনের ছায়াপাত ঘটেছে এখানে। সাধারণ কৃষকদের কথা আছে, দরিদ্র মানুষের মুক্তির প্রসঙ্গ আছে, ভারতের মেকি স্বাধীনতার কথাও আছে। ফলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক লেখা হিসেবেও একে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর ভাষায় -

'চে গুয়েভারাও মুক্তি চেয়েছেন এবং পরাধীন,
ভারতের কবি লিখেছিলেন, যেথায় মাটি ভেঙ্গে
করছে চাষী চাষ, কাটছে, পথ কাটছে
বারোমাস সেখানেই দেবতা আছেন দেবতা নাই ঘরে - এই
ধরনের মুক্তিপ্রসঙ্গ লেখা হয়েছিল স্বাধীনতার আগে আমি আজ
স্বাধীন ভারতের কবি - দরিদ্রতার হাতে বন্দী অগণন শিশুদের নির্ভেজাল

হাসি দেখে তাঁদের মুক্তির কথা ভাবি - পেটোর বদলে দুটো কবিতা পকেটে নিয়ে গল্প কবিতার দিকে হাঁটি, এই পথে একজন

অগ্নিযুগের বিপ্লবীর নামে রাস্তা ও বাজার আছে, সত্তর দশকের
একজন শহীদের জন্যে একটি শহীদবেদী এই পথে।'[৩১]

রাজনৈতিক নৈরাজ্যের সম্ভাবনা শেষ পর্যন্ত এ কবিতায় ভেঙ্গে গেছে। যাবেই কেননা ফাল্গুনীর মানস প্রকৃতিতে তারুণ্যের অস্থিরতা ও 'মেয়েছেলের' প্রতি আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। নাম কবিতায় বিপ্লব ও যৌনতার দ্বান্দ্বিকতাকে স্পষ্ট করেছেন ফাল্গুনী ঃ

'হিংসা ভালো লাগে না আমার বিপ্লব ভালো লাগে জোতদার ও কৃষকের
যুদ্ধময় ধানক্ষেতে আমিও খেয়েছি খুব ধানশীষের দুধ।'[৩২]

অতএব হিংসাশ্রিত বিপ্লবের চেয়েও প্রেমের দিকেই যে কবির টান তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই প্রেমও আবার রিরংসা ও ঘৃণার অর্থহীনতায় অলংকৃত।

অসামাজিকতার বিপথগামিতায় তিক্ত ঃ

'গণিকার বাথরুম থেকে প্রেমিকার বিছানার দিকে
আমার অনায়াস যাতায়াত শেষ হয় নাই - আকাশ গর্ভ
থেকে তাই আজো ঝরে পড়ে নক্ষত্রের ছাই পৃথিবীর বুকের উপরে

তবু মর্গের ড্রয়ারে শুয়ে আছি এক মৃতদেহ আমার আত্মশরীর নিয়ে
চলে গ্যাছে তার শাখাভাঙা বিধবার ঋতুরক্ত ন্যাকড়ার কাছে
প্রজাপতির চিত্রল ডানা দেখে বিরহ থেকে বিবাহের দিকে
চলে যায় মানুষেরা
আমি এক সৌন্দর্য রাক্ষস ভেঙে দিয়েছি প্রজাপতির গন্ধসন্ধানী শুঁড়'
(আমি এক সৌন্দর্যরাক্ষস)।

লক্ষণীয়, 'সৌন্দর্য রাক্ষস' শব্দটি এবং প্রজাপতির শুঁড় ভেঙে দেবার প্রয়াস। কিন্তু ফাল্গুনী যে বিপ্লবীর চেয়েও কবি, তার নৈরাজ্যের আড়ালেও যে রয়েছে সংবেদনশীলতা তার প্রমাণ রয়েছে অন্যত্র, —

'আমি এক উদোম ন্যাংটো ঘুরে বেড়াই বিশ্বাসবিহীন
খুব সহজ নিশ্বাসে
কিন্তু দীর্ঘ নিঃশ্বাস যখন লোকচক্ষুর আড়ালে ছাড়ি
তখন তুমি নারী
তুমি দেখো না সেই কামুক জন্তুটার চোখে কি রকম জল থাকে যার
অপর নাম অশ্রু।'
(আমি মানুষ একজন)।

এই ধরণের স্পর্শকাতরতা অন্যধরণের ভাষাতেও প্রকাশ পেয়েছে ঃ

'... আমি এক জরায়ু থেকে বেরিয়ে আরেক জঠরে
খুঁজে ছিলাম আমার সন্তানের মুখ
আমার মৃত পিতার শরীর দেখে আমি বুঝেছিলুম
বেঁচে থাকা জরুরী আমার মা'র হতাশা দেখে
বুঝেছিলুম মৃত্যুও দরকারী হতে পারে জীবনের' (ভ্রমরবিহীন কিছু ফুল)।

অর্থাৎ সামাজিকতার, গার্হস্থ্যের একটি চোরাটান যে ফাল্গুনীর মধ্যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আলবেয়ার কামুর 'আউটসাইডার উপন্যাসের মাতৃ অনুষঙ্গকে একটু উগ্রভাবে ব্যবহার করেছেন ফাল্গুনী ঃ 'মা, বিদেশভ্রমণের দিন তোমাদের অভিজাত সমাজের অনেকেই ভদকা, গিলেছেন, আমি নির্বিকার তোমার চিতা থেকে ধরাবো চার্মিনার যদিও শেষ রক্ষা হয় না। বলেন পরের লাইনেই - 'তোমার মৃত্যুর কথা ভাবলে আমার চোখে জল আসে' এবং '... মা, আমিও মরে যাবো একদিন।'[১৬] এই কবিতার অন্তিম পংক্তিগুলি বিষণ্ণতা ও নৈঃসঙ্গের মায়াবী আলোয় কোমল

ঃ 'আমার মুখের উপর এসে পড়ছে ডুবন্ত সূর্যের আঁচ আর সূর্যাস্তের রং পাখায় মেখে পরিবার পরিকল্পনাহীন পাখির দল ফিরে যাচ্ছে বনলতা সেনের চোখের শান্তিময় নীড়ের দিকে - ডিমে তা দেবার সময় এসেছে তাদের' (নির্বিকার চার্মিনার)। একদিক থেকে বলা যায়, বিপ্লব এবং প্রেমের এই দ্বন্দ্ব বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে নতুন কিছু নয়, বাঙালী মধ্যবিত্ত কবির মধ্যেও এর প্রতিফলন ঘটেছে। সমর সেনের কবিতাবলী তার সাক্ষ্য। মার্কসীয় চেতনা ও রবীন্দ্র ভাবকল্পনার মিশ্রণও করেছিলেন ঐ কবি। একই কাজ করেছেন ফাল্গুনী রায় ঃ

মাও সে তুঙের বই পড়ে আমরা যারা
এবার ফিরাও মোরে পড়ে
কম্যুনিষ্ট হয়ে যাই পরোপকার বৃত্তি থেকে স্বেচ্ছায় বিপ্লবী
সেই আমরাই হব কি রেজারেকশন
অথবা পাড়ার বাবলিদের টিটকিরি খেতে খেতে
গেঞ্জি লুংগী পরে রকে বসে বিড়ি খেতে খেতে আমরা শুনে যাবো নির্বিকার
রবীন ঠাকুরের গান (আমরাই রেনেশাঁ ও রেজারেকশন)।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসঙ্গতির দ্বন্দ্বকে ফাল্গুনী শেষ পর্যন্ত নিয়তিবাদের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছেন। জৈব প্রকৃতির আদিমতা, অন্ধতা তাঁকে গ্রাস করে নিয়েছে। তাকেই তিনি জীবন বলে জেনেছেন। মানুষের সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই, কবিতায় বলেছেন,

'আমি মরে গেলে দেখতে পাবো জন্মান্তরের করিডোর
আমি জন্মাবার আগের মুহূর্তে আমি জানতে পারিনি আমি জন্মাচ্ছি
আমি এক পরিত্রাণহীন নিয়তিলিপ্ত মানুষ
আমি এক নিয়তিহীন সন্ত্রাসলিপ্ত মানুষ
আমি দেখেছি আমার ভিতর এক কুকুর কেঁদে চলে অবিরাম
তার কুক্কুরীর জন্যে এক সন্ন্যাসী তার সন্ন্যাসিনীর স্বেচ্ছা কৌমার্য
নষ্ট করতে হয় উঠে তৎপর লম্পট, আর সে লম্পটের কাছে
গুঁড়ো হয়ে যায় এমনকি স্বর্গীয় প্রেম - শেষ পর্যন্ত আমি
কবিতার ভিতর ছন্দের বদলে জীবনের আনন্দ খোঁজার পক্ষপাতী
তাই জীবনের সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই মানুষের সংগে
আমার কোন বিরোধ নেই।'

ফাল্গুনী রায়ের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আমি অপদার্থ' প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর পনেরো বছর

পরে ১৯৯৬ সালে। প্রকাশক গ্রাফিত্তি। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত লিখিত কবিতাগুলোকে নানা পত্র পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে এখানে মুদ্রিত করা হয়েছে। যাই হোক, এ কাব্যে সংকলিত কবিতার সংখ্যা ২৬টি। গ্রন্থটির কবিতাগুলি পাঠ করলে কবির তীব্র উন্মার্গগামিতা অনুভব করা যায়। মাদকদ্রব্য সেবনজাত অস্থিরতা শুধু নয়, মৃত্যুর সম্ভাবনাও এখানে উঁকি দিয়েছে। নিজের জীবন যে শেষ হয়ে আসছে তা কবি বুঝতে পেরেছেন। তবে, জীবন বা মৃত্যু কোনোটির প্রতিই তাঁর বেদনা দেখা যায়নি। বরং প্রতিবাদের ধরণটি এখানে আরও প্রখর; ধর্ম এবং রাজনীতি উভয়কেই এখানে তিনি আক্রমণ করেছেন। কখনও কখনও সেই আক্রমণ অসহ্য। এখানে ফাল্গুনীকে একজন 'অ্যানার্কিষ্ট' বলা যায়। সম্ভবতঃ সমকালীন নকশালদের আন্দোলন তাঁকে প্রভাবিত করে থাকবে। কিন্তু ফাল্গুনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সংঘ শক্তির চেয়ে ব্যক্তির জীবন সংগ্রামকেই প্রতিপাদ্য করে তোলেন। এবং নিজেকে একজন অরাজনৈতিক মানুষ হিসেবে দেখাতে ভালবাসেন। 'আমি অপদার্থ' কাব্যে ব্যক্তি ফাল্গুনী রায়কে খুঁজে পাওয়া যায় যিনি কখনও প্রেম, সৌন্দর্য, কবিতা ও সংগীতের জন্য আর্ত, কখনও প্রতিবাদে স্পষ্টভাষী ও কর্কশ, কখনও সাহিত্য ও কবিতার একজন আত্মধরণের তাত্ত্বিক (self styled theorist)। এই গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চশমা' কবিতায় তিনি জানিয়েছেন

দলীয় পতাকা ছাড়াই আমি বেঁচে আছি মেয়ে মানুষের
ভালোবাসা ছাড়াই আমি বেঁচে আছি সাড়ে বারোটার
রোদ্দুরে রবীন্দ্রনাথের গান শোনার জন্য আমি বেঁচে আছি।

জানিয়েছেন,

শোকের ভেতর গরীব বড়লোক বা বুর্জোয়া কম্যুনিষ্টের কোনো পার্থক্য নেই
তবু কারো মৃত্যু পাখীর চেয়ে হাল্কা
তবু কারো মৃত্যু পাহাড়ের চেয়ে ভারী'[৩৪]
রাষ্ট্রের এমনকি সমাজতন্ত্রেরও সীমাবদ্ধতা নিয়ে কবি

বলেছেন,

'রাষ্ট্র কি সব কিছু দিতে পারে
লাষ্ট বয়কে ফার্ষ্ট বয় করে দিতে পারে সাম্যবাদ?
বাজে কবিকে ভালো কবি করে দিতে পারে সমাজতন্ত্র?'[৩৫]

বোঝাই যাচ্ছে, সব ধরণের system -এ যারা প্রান্তিক মানুষ তাদেরই কথা বলছেন কবি, নিজেকেও একাত্ম করেছেন তাদেরই সঙ্গে। সেই জন্যই বিপ্লবেও আস্থাহীন ফাল্গুনী 'বিপ্লবের গান' কবিতায় বলেছেন 'বিভিন্ন ময়দানে নেতাদের ভাষণ শুনে শুনে আমাদের অনেকের পচে গ্যাছে

কান।' আরেকজায়গায় বলেছেন, 'নৈশ ভোজসভায় সস্ত্রীক সিদ্ধার্থ জ্যোতি করে থাকেন পরস্পরের ভেতর হাসি ঠাট্টা আর হে কলকাতার মানুষ আমরা কেবলি কি খাবো ইন্টারপার্টি কলিশনের বুলেটের গাট্টা' (বিসর্জনের মুক্ত ধারায়)। রাজনৈতিক অন্তঃসারশূন্যতার পাশাপাশি সামাজিক কুসংস্কারেরও বিরোধিতা তিনি করেছেন। বৃষ্টি নামানোর জন্য সুদূর রাজস্থানে শিশুবলির ঘটনার উল্লেখও আছে এই কবিতাটিতে। এই হিংসা ও হননের পৃথিবী ফাল্গুনীর সহ্য হয় না। মানবসভ্যতার মুক্তিকামী আদর্শবাদীদেরও একই কারণে তিনি মেনে নিতে পারেন না। বলেন,

'আমি জানি না সার্ত্রে
বা মার্কস কেন
কেন শুধু ক্রোধ হিংসা ঈর্ষার অনুভব ছুঁয়ে বুঝি জীবনের স্রোতের
অন্তস্রোত এই সব অনুভূতি ঘৃণধরা জীবনের ভিতর নতুন জীবনের
বীজ বুনে দেয় কিন্তু সে সব জীবনের কথা লিখতে ইচ্ছে করে না
আসলে আমি ঠিক সেরকম বিশ্বাসী নই
আমি আমার মতন, বিশ্বাস করি' (আমি আমার মতন)।

বস্তুত সমগ্র 'আমি অপদার্থ' কাব্যটি ফাল্গুনীর 'আত্মনির্মাণ' ছাড়া কিছুই নয়। শুধু মানুষ নয়, একজন কবি মানুষের একখানি আত্মদর্পনও বটে। সেই মানুষটি কী রকম 'অনাবশ্যক কবিতা'য় নিজেই তা জানিয়ে দিয়েছেন,

'এখনো আমি মরতে ভয় পাই অর্থাৎ বাঁচতে ভালবাসি
তাই মেঘলা আকাশের তলায় এক হাতে রেড বুক
অন্য হাতে জীবনানন্দের কবিতা
নিয়ে আমি হেঁটে যাই।'
এবং 'তবু আমি ভালবাসি উলঙ্গ শিশুটির হাসি, পুরনো পৃথিবী
নতুন হয়ে ওঠা আমার ক্ষুধার্ত চোখের সামনে সুন্দরী রমণীর হাড়ের কাঠামো
সময়ের ভেতর দিয়ে চিতার দিকে চলে যায়, আমি দর্শনের মোটা
বই বিক্রী করে কিনি রুটি ও মদ শুধু বেঁচে থাকার, এমন কি কখনো
লিখে ফেলি, বিশ্বাস করুন অনাবশ্যক কবিতা।[৩৬]

এই কবিতার মধ্যেই কবি বেঁচে থাকতে চান। অদ্ভুত সেই বাসনা। কেননা তাঁর অন্য কোন বাসনা নেই আর। 'কবিতা বুলেট ঃ ১ - তে জানিয়েছেন, 'রক্তমাংসের শরীর আমার মরে

যাবে একদিন নিশ্চিত তবু শব্দের শরীরে থাকবে বেঁচে আমার চেতনা।' একই ধরণের কথা পাচ্ছি 'কবিতা হঠাও' — কবিতায়, 'আমি যেন আমার মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকি, নারীর যৌনতা থেকে উৎসারিত সন্তানের মধ্যে নয়, কিন্তু শব্দের শরীরে থাকুক বেঁচে আমার চেতনা।' রক্তমাংসের শরীরে মধ্যেই মুক্তি ও মৃত্যু চেয়েছিলেন যে হাংরিরা, তাঁদেরই অন্যতম প্রতিনিধি ফাল্গুনী কবিতার মধ্যে আপন চেতনার যে অমরত্ব দাবী করছেন তা তাঁর স্বধর্মচ্যুতি কিনা জানিনা, কিন্তু সংবেদশীল একটি কবি আত্মার যে জয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কবি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে গেছেন যে, প্রতিবাদ নয়, সামাজিক অসঙ্গতি নয়, কাব্যসাধনার তাড়নাই তাঁর জীবনের মূল শক্তি, নিয়ন্ত্রক। বলেছেন,

সকলের আনুগত্য অস্বীকার করেও আমি শেষ পর্যন্ত
নিজের আত্মার কাছে ক্রীতদাস থেকে যাচ্ছি
অথচ আমি মুক্তিপ্রার্থী মুক্তি উপায় বোধ হয়
কিছু লিখে যাওয়া, কিন্তু কিছুই লিখতে পারছি না
লিখতে পারছি না, লিখতে পারছি না আর
কুকুর ও বেশ্যার চীৎকার, হাসাহাসি হিজড়ের উপহাস
(কিছু লিখতে পারছি না)।

ফাল্গুনীর কবিতার উচ্ছৃঙ্খল দাপাদাপি, গালিগালাজ ও কটুতার পর এই স্বীকারোক্তি ও সহজ জীবনের কাছে আত্মসমর্পনে অন্য হাংরিদের থেকে আলাদা হয়ে উঠেছেন। তাই ফাল্গুনীর কাছেই আমরা পেতে পারি এরকম লাইন ঃ

হঠাৎ কান্না পায়
না ব্যর্থ প্রেম বা ক্ষুধার জন্য নয়
আমি মরে যাবো মরে যাবো এই চেতনায়
জীবনের গভীর থেকে উঠে আসে ক্রন্দনের স্বর
এতদিন বুঝিনি, আজ বুঝি বেশ ভাল ভাবে
জীবনকে বেসেছিলুম ভালো
দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যের ভেতর
অসফল যৌনতাড়নার তীরে
সেই আত্মপ্রেমী ভালোবাসা

ছিল শুধু আলো হয়ে

মৃত্যুর উপত্যকার তীরে' (তিনটি কবিতা)।

ভালোবাসার এই মায়াময় আলো হয়ত ফাল্গুনীর কবিতায় তেমন দেখা যায়নি, হাংরিদের জীবনানুভূতি এবং কবিতায় তার বিপরীতমুখী প্রকাশ দেখে মনে হয় সচেতন ভাবেই তাঁরা যেন হৃদয়ধর্মকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। এজন্যই তাদের লেখায় ছড়ানো নানা অশালীন শব্দ, চেষ্টাকৃত ভাবে মানসিক সৌজন্য ভেঙে ফেলার প্রয়াস। ভালোবাসাকে ধ্বংস করে আত্মঘাতী ঘৃণার তাপ ও জ্বালা এভাবেই ফাল্গুনীর কবিতায় তীব্রতা পেয়েছিল। তবু তো শুরু করেছিলেন এ ভাবে ঃ

'অজস্র জাম ও জারুলের বৃষ্টি ধোয়া পাতায় ঝলমলে রোদ্দুর

আমি বৃক্ষাকাশময় হাত রেখে বলি

মাটির সোঁদা গন্ধে নিঃশ্বাস নিয়ে বলি আমি

নারীর জন্য এখনো প্রকৃত পুরুষ হতে পারি' (আকাশ ধোয়া বৃষ্টির পর)।

ফাল্গুনীর কবিতা পড়তে পড়তে সেখানে কবির আসন্ন মৃত্যুর ছায়া দেখে বিষন্নতা জাগে। তিনি বলেছিলেন,

কালই বুঝি শেষ দিন

পৌঁছে যাবো শেষ জংশন শ্মশান চিতায়

অথচ অনেক কাজ বাকী

থিভ্‌স জর্নাল পড়া বাকী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চশমার কাঁচ দিয়ে পৃথিবী দেখা বাকী

জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুকারী রং পাল্টানো ট্রামে বসা বাকী' (শেষ বিবৃতি)।

তবে ফাল্গুনীর কবিতায় ব্যক্তিগত জীবনের ছাপ কোনো আবিলতা সৃষ্টি করেনি। তাঁর স্বীকারোক্তি বিবর্ণতা ও তাত্ত্বিকতাকে অতিক্রম করে কবিতা হয়ে উঠেছে।

(ঙ) সুবো আচার্য ঃ

সুবো আচার্য হাংরি আন্দোলনের প্রথম পর্বের একজন অন্যতম সংগঠক। এই ধারার কবিতায় তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। তাঁর জন্ম ১৯৩০ সালে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মহারাজপুর গ্রামে। খুবই শিশুকালে, ছ'বছর বয়সে তাঁকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। বাঁকুড়া ক্রীশ্চান কলেজ থেকে বি. এ পাশ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ পাশ করেন ১৯৬৫ সালে। ১৯৬৩ সালে হাংরি মামলা চলাকালীন ত্রিপুরায় গিয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা

করেন। পরে কলকাতায় হিন্দুস্তান কেবলসে কিছুকাল চাকুরি করেন। পরে ব্যাঙ্কের কর্মচারী। কবিতা রচনা পরিত্যাগ করে তিনি অনুকূল ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নেন। এখন 'সৎসঙ্গে'র ঋত্বিক, অন্যকে মন্ত্র দীক্ষিত করেন। তাঁর একমাত্র কবিতার বই 'সুবো আচার্যের কবিতা' এখন দুষ্প্রাপ্য। তাঁর কবিতাগুলি ষাটের দশক থেকে শুরু করে আশির দশক পর্যন্ত রচিত হয়েছিল।

সুবো আচার্যের বিখ্যাত কবিতা 'নিজস্ব বিস্ফোরণ' প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৬৭ সালে 'জেব্রা' পত্রিকায়। আত্ম-অস্থিরতার উচ্চাবচতায় এবং বিস্ফোরণের লাভা শক্তিতে অসতর্ক পাঠক কবিতাটির মধ্যে মলয় রায়চৌধুরী প্রভাব খুঁজে পেতে পারেন। কিন্তু তা যথার্থ নয়। সুবো আচার্যের অনুভূতিলোক ও বক্তব্য প্রতিপাদন প্রণালী স্পষ্টতই আলাদা। মলয়ের লক্ষ্য মস্তিষ্কের দিকে, সুবোর হৃদয়ের দিকে। মলয় যন্ত্রনির্ভর, সুবো নিসর্গনির্ভর। মলয় বস্তুর বিরুদ্ধে কথা বলেও বস্তুতেই ফিরে যান। সুবো বস্তুতন্ত্র থেকে আধিবিদ্যক জগতে। বিষন্নতা, কোমলতা, আলো আঁধারির রহস্য মলয়ের মতো সুবোর কবিতা থেকে চলে যায় নি। উপরন্তু সেগুলো তাঁর কবিতার অন্যতম আকর্ষণ। সুবোর সমস্ত কবিতা সম্পর্কেই এ কথা সত্য। 'নিজস্ব বিস্ফোরণ' কবিতায় সুবো বলেছেন,

আমি অস্তিত্বের ঝড় অন্যরকম পরাজয়ে রূপান্তরিত করে নিতে পারি কিনা
হোক না তা শিলীভূত, ঠান্ডা চুপ নিঃসঙ্গ, পাথর।'

বলেছেন,

প্রবল চেষ্টা করেছিলাম আমি শক্ত হয়ে, আমি শরীর কাঁপিয়ে
চীৎকার করেছিলাম, প্রতিবাদ, কিন্তু ভ্রষ্টতা
এমনই জিনিস, দারুণ শক্তিশালী বাতাসের ধার আমায়
এলোমেলো করে দিচ্ছে।[৩৬]

যে সুবো তীব্র স্বরে জানান, —

আমি সূর্যের আগুন খেয়ে ফেলেছি
আমি চাঁদের অন্ধকার খেয়ে ফেলেছি
আমি দুই বিশাল ব্যারেজ খেয়ে ফলেছি

তিনিই শেষে বলেছেন,

আয়না ভেঙে আগুন উড়ে আসছে আমার আত্মার দিকে আজ ভোরবেলায়
না আ আ আ আ আ আ আ আ আ

কিছুতেই আমার বেঁচে থাকা হল না পৃথিবীতে।[৩৭]

এই পরাজয় বরণ মলয়ের মধ্যে নেই। সুবোর মধ্যে আছে। আছে এই জন্যে যে, মলয়ের মতো তিনি শুধু বাইরের জগতের অসঙ্গতির মধ্যেই পরিভ্রমণ করেন নি। অন্তর্জগতের আলোড়নও ছিল তাঁর মধ্যে ঃ

'কলেজ ষ্ট্রীট দিয়ে বিষন্ন আমরা হেঁটেছিলাম একদিন, আমরা
গঙ্গার পাড়ে বসে আত্মার কথা বলেছিলাম, সত্য ঈশ্বরের
চেয়ে বড়ে অথবা সত্যই শেষ
ধূসর বিকেলে আমাদের মাথায় এই জ্ঞানের জন্ম হয় হৃদয়ে।'[৩৮]

'জেব্রা' ২য় সঙ্কলনে ১৯৬৭ সালে 'মড়ক' নামে গদ্যপ্রতিম কবিতাটি রচনা করেন সুবো আচার্য। এখানেও বাইশ বছর বয়সী আধুনিক এক যুবকের অস্তিত্বের বিপন্নতা পরিস্ফুট করা হয়েছে। সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক অসহায়তা, রাজনৈতিক বিতৃষ্ণা ও অন্তঃসারশূন্যতা, মানবিকতার বিলুপ্তি, বিজ্ঞান, প্রকৃতি, নারী সম্পর্কে অনীহা কবিকে নৈরাশ্যকাতর করে তুলেছে। তিনি বলেছেন, 'মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো পবিত্রতায় আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু এই অপবিত্র অস্তিত্বের ভার আমাকে বহন করতে হচ্ছে।'[৩৯] এই অস্তিত্বের স্বরূপ 'মড়ক' - এর শেষ লাইনটিতে এ রূপ ঃ 'বাবা মা আমি জন্ম চাইনি মৃত্যু চাইনি এসব কিছুই আমি চাইছি না, আমি জানি না জানি না জানি না জানি না আমি কিছু জানিনা।' পশ্চিমী অস্তিত্ববাদী দর্শনেরই যেন ভাষারূপ, হয়ে উঠেছে পংক্তিগুলি। ১৯৬৯ সালে 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় সুবো আচার্যের 'স্বাধীন ও যথেচ্ছ রচনাসমূহ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এখানে প্রতিবাদী সুবোর চেয়ে জীবনযন্ত্রণাকাতর সংবেদী এক কবিকেই বেশী পাওয়া যায়। জীবনের রহস্যবিধুরতা ও অনির্ণেয়তাকেই যেন দু'চোখ মেলে তিনি দেখছেন। তিনি বলেছেন,

কিম্ভূতকিমাকার জীবন নিরাকার রহস্যের মধ্যে
আমার নিঃসঙ্গ আত্মা বাঁধা পড়ে যায় আমার
ভালবাসা ও ঘৃণা ভেদ করে দৃষ্টি চলে যায়
আমি ক্রমশ শীতের মধ্যে খুব বেশী সিগ্রেট খাচ্ছি

আচমকা কখনও ' কি সুন্দর এই জীবন'
তৎক্ষণাৎ ঘোর অন্ধকার
মাথা কেঁপে উঠে নিচু হয়ে যায়।'
বলেছেন, 'চূড়ান্ত ঘৃণার পরেও

কিছু ভালবাসা অবশিষ্ট থেকে যায়' এবং 'ট্রেনের শব্দ দিগন্তের দিক ভেঙে দেয়
পৃথিবীতে কোনো শব্দ নেই আমার
হৃৎপিন্ডের শব্দ ছাড়া।'

সুবো এখানেও শেষ পর্যন্ত নিজের আত্মার কাছেই ফিরে এসেছেন। তাঁর 'হৃদয় অস্বাভাবিক অন্ধকারে ভরে গেছে।' অনেকটা জীবনান্দ দাশের 'বোধ' কবিতার মতো। ১৯৭২-৭৩ সালে প্রকাশিত 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত শীর্ষক লেখাটিতেও সুবোর একই চেতনা সম্প্রসারিত হয়েছে এই ভাবে

'স্বাভাবিক চেতনা বা জাগরণ মাঝে মাঝে ভেঙে যায়
অতি স্বাভাবিক নিশ্বাস ও রক্ত চলাচলের সময়েও
সহসা কি যেন এক বিস্ময় বুক থেক উঠে আসে
সেই বিস্ময় আমার জীবনের মধ্যে একাকী দাঁড় করিয়ে রাখে।'
এবং এ কোনো স্বপ্ন নয়, প্রেম নয়, দৈববাণী নয়
প্রেম ও স্বপ্নের চেয়ে অতীব অমোঘ
ঐশী থাপ্পড়ের মতো সহসা সমস্ত বাস্তব
গুমোট ভেদ করে ঝলসে ওঠে
আমার অস্তিত্ব হারিয়ে যায়
আমি খুবই অন্ধকার ভেদ করি।'

সুবো আচার্য তাঁর কবিতায় এক আশ্চর্য অন্ধকার পৃথিবীর ছবি আঁকেন। অ্যাবসার্ড চিত্রকল্প একাত্মতা পেয়ে যায় অ্যাবসার্ড কবি ব্যক্তিত্বটির সঙ্গে। শুধু মানুষ নয় প্রকৃতিও অ্যাবসার্ড হয়ে ওঠে। যেমন, —

নিরুপায়, ধুন্দুমার আবহওয়া
'চারিদিকে, চরাচর ভরে যায় পর রাত্রির নিঃশব্দ চীৎকারে
মনুষ্য শরীর রূপ পায় কবন্ধের, কথা বলে দীর্ণ ভাষায়
পিশাচেরা পরেছে পোষাক, জন্মান্ধের হাতে দায়িত্বভার
অর্থনীতির, উড়ে যায় অচেনা বাতাস
মনে পড়ে অজানা নদীর কথা, চতুর্দিকে মূর্তি নয় সেতু ভাঙে' (গ্লানি)।

প্রকৃতি ও জীবনের নৈরাশ্য, নিরর্থকতা ও ভয়াবহতাকে সুবো যে ভাষায় প্রকাশ করেছেন সেখানে জীবনানন্দের একটা বিশেষ পর্বের ছায়াপাত আছে। যেমন,

'রাতের সমুদ্র বড়ো স্তব্ধ শব্দে ভরে আছে
রাতের আকাশ ভরা কালো মেঘ জন্মমৃত্যুহীন
যে মানুষ জীবনের নেশা থেকে সরে এসে
এখানে দাঁড়ায় তার শরীর ভরে যায় রাতের সমুদ্রে' (রাতের সমুদ্রে)।

সুবোর কবিতায় যে চ্যালেঞ্জের ভাব তা মলয় বা ফাল্গুনীর মতো নয়। নানাবিধ বৈপরীত্যের সঙ্গে নিজেকে তিনি জড়াতে চান না। বরং কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে সেই বৈপরীত্যের রূপ ও তাৎপর্য অনুধাবণ করতে চান। বলেন,

'আমি নিজের বাইরে দাঁড়াতে চাই
দাঁড়িয়ে দেখতে চাই আগুন বাতাস জলের গূঢ় হাসাহাসি (শাতন)।

কিংবা

দেখি একাকীত্ব কতো মিঠে,কতোখানি তেতো আত্মগ্লানি
মধুময় পৃথিবীর মধুতে মিশেছে কোন বিষ
এসো, শুধু নরম বিছানায় শুয়ে জীবন কাটাবে
দেখবে না হাঙরের ঢেউয়ে লুটোপুটি খাওয়া' (এসো দেখি)।

আরও ক'বছর পর সুবো আচার্য যেন বাস্তবতার কার্কশ্যকেও মানিয়ে নিয়েছেন। অন্তর্দ্বন্দ্বগুলির রহস্য অনেকখানি যেন উন্মোচন করতে পেরেছেন। 'তাঁর 'ভূয়োদর্শন' কবিতায় তিনটি মানুষের কথা আছে। একজন বাস্তবতার ঘূর্ণিতে তলিয়ে যায়, দ্বিতীয় জন গড্ডালিকা প্রবাহকে মেনে নেয়, তৃতীয়জন ,স্থিতপ্রজ্ঞের মতো একটু হেসে জীবনের সমান্তরাল হয়ে ওঠে। এই তৃতীয় ব্যক্তিটিই তাঁর কবিতার শেষ পর্বের সুবো আচার্য। তাই তিনি যে সভ্যতার বিরুদ্ধে আত্মবিস্ফোরণে প্রতিবাদ করেছিলেন, তিনিই বলেন,

'সভ্যতাকে হাত নেড়ে চলে আসি
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ আত্মার কাছে সে যেন জলের অতল
নিম্নে আরও জল (আপাত স্তব্ধতায়)।[৪০]

ফলে অনেক নেই-এর পৃথিবী, প্রকৃতি, মানবসমাজের মাঝখানেও কবি সুস্থতার দিকে ফিরতে চান 'তবু সুবাতাসে ফিরে যেতে চাই, ফিরে যেতে চাই' (জীবন কাহিনী)। বলেন, —

আমি এই বহু বিস্তৃত সভ্যতা চিনি না
আমি এই ধুলোবালির উপর মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়া

মানুষকে দেখি আর তার কষের রক্ত দেখে আমার মনেহয়
আমি কবিতায় 'মানবতা' শব্দটি ব্যবহার করেছি (ছদ্মবেশী)।

আসলে, হাংরি কবিদের মধ্যে সুবো আচার্যকেই সবচেয়ে দ্রুত প্রচলিত মানবতাবাদের দিকে হেঁটে যেতে দেখি।

(চ) দেবী রায় ঃ

হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সংগঠনের প্রথম পর্বে দেবী রায় উল্লেখযোগ্য ভাবে যুক্ত ছিলেন। হাংরি বুলেটিনে দু' একটি কবিতা লিখলেও, হাংরিদের মুখপত্র 'জ্রেব্রা' ২য় সংকলন ছাড়া, 'জেব্রা' (১ম সংকলন), 'ক্ষুধার্ত', 'ফুঃ' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর কোনো লেখা বেরোয়নি। আবার হাংরি উত্তেজনা স্থিতু হয়ে এলে সব রকমের প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় তাঁকে লিখতে দেখা গেছে। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত দেবী রায়ের কবিতার বই এখন কোথাও পাওয়া যায় না। তবে তাঁর 'নির্বাচিত কবিতা' সংকলনে কালানুবিক্রমিক ভাবে নিজের নানা বয়সের কবিতার একটি সংগ্রহ আমরা পেয়ে যাই। বিশেষ করে দেবী রায়ের 'আমি ও কলকাতা', 'মানুষ-মানুষ', 'ভ্রুকুটির বিরুদ্ধে একা', 'উন্মাদ শহর' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতাগুলি এখানে রয়েছে। মলয় রায়চৌধুরী 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকায় এই কবিতাগুলিকে হাংরি অভিধা দিয়েছেন।[৪১] এই কবিতাগুলিতে নগরজীবনের বর্ণনা ও নগরের সঙ্গে কবির সম্পর্কের অনুভূতি রূপায়িত হয়েছে। খুবই ব্যক্তিগত স্তরের কবিতা। প্রেমের কবিতাও বটে। যেমন,

— ঘৃণার সাম্নে তোমার থুতু, তোমার থুতুর সাম্নে আমিই ঘৃণা
তোমার আমার দূরত্ব আজ মানা — হোক না অশ্রুজলে।[৪২]

কিংবা

স্কাইস্ক্র্যাপারের জানালা থেকে পথের দিকে চেয়ে আছে মানুষ
রাস্তায় দাঁড়িয়ে, রাস্তার খোঁজে এদিক সেদিক মানুষ।[৪৩]

দেবীর 'ভ্রুকুটির বিরুদ্ধে, একা' কবিতায় প্রথমে একটি ক্রেনের বর্ণনা, তারপর ভীড় বাসের, তারপর হাইওয়ের, এরপরে পথের উপর মানুষের ছবি, শেষে করাতের আওয়াজ। বোধ হয়, তিনি বলতে চান যে যন্ত্রসভ্যতার ভ্রুকুটির বিরুদ্ধে মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়। 'উন্মাদ শহর' কবিতায় কবির অবলোকন "উন্মাদ শহর, কারুর জন্য করুরই আর সময় নেই।" দেবী রায় কলকাতার নগরজীবনকে এভাবেই দেখেছেন। মেনেও নিয়েছেন নগরের যন্ত্রণাগুলো। প্রেম ও মানবতাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। স্বপ্ন দেখেছে ইতিবাচক পরিণতির

যেমন, — আমি অপমানের
গলা জড়ি যে
গেয়ে উঠি
বেঁচে ওঠার গান
অথবা
অন্তর বাহির সব বেবাক বন্ধ
নাকে এসে লাগে ভাতের গন্ধ ..... [৪৫]

দেবী রায়ের কবিতার মধ্যে কখনই কোনো তীব্র ক্ষোভ, অস্থিরতা, প্রতিবাদ দেখা যায় না। অত্যন্ত সংবেদনশীল নরম একজন মানুষকে পাওয়া যায়। কাজেই হাংরি আন্দোলনের সূচনাপর্বের একজন সদস্য হলেও প্রাণধর্মে দেবী রায় ও তাঁর কবিতাকে হাংরি জেনারেশন কাব্যধারায় যাচাই করা যাবে না।

(ছ) সমীর রায় চৌধুরী ঃ

দেবী রায়ের মতই সমীর রায় চৌধুরীও হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের শুধু কিছুটা জড়িয়ে ছিলেন। সম্ভবতঃ ছোট ভাই মলয় রায়চৌধুরী এবং বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি প্রীতিবশতঃ। নিষিদ্ধ হাংরি জেনারেশন, পত্রিকাটি ছাড়াও, দু' একটি বুলেটিনে তাঁর কিছু লেখা বেরায়। কিন্তু 'জেব্রা', ক্ষুর্ধাত', 'ফুঃ' 'এসব কোনো পত্রিকাতেই তিনি লেখেন নি। নিজেকে হাংরিও তিনি মনে করেন নি। 'হাংরি কিংবদন্তী' গ্রন্থের 'বয়ান' অংশটিতে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনায় এটা স্পষ্ট। আসলে, সমীর পঞ্চাশ দশকের কবি। মূলতঃ 'কৃত্তিবাসে'ই সে সময় তাঁর সাহিত্য চর্চা হয়েছে। তাঁকে 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীরই বলা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে সমীর অত্যন্ত চমৎকার কথা বলেছেন — "কৃত্তিবাস হাংরি পোষ্ট মডার্ণ .... এগুলোকে জেনেছি একই উৎস থেকে রওনা দিয়ে অবলোকন ভঙ্গীর প্রসারণে। নিজস্ব বুঝের বিস্তারে। নিজস্ব দ্বন্দ্বের সমাধায়। .... যুক্ত থেকেছি বা প্ররোচকের ভূমিকায় থেকেছি এই ত্রিমাত্রিকে।"[৪৬] হাংরি জেনারেশন আন্দোলনে সমীরকে একজন প্ররোচক বলা অসংগত নয়।

(জ) উৎপল কুমার বসু ঃ

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনে উৎপল কুমার বসুরও কিছু অবদান আছে। কারণ, দু একটি বুলেটিনে তিনি লিখেছিলেন। তাছাড়া, 'জেব্রা' - ২য় সংকলনেও তিনি লিখেছেন। ঐ লেখাটি চিঠি হলেও শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পর্কে মূল্যায়ন আছে, হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে আস্থা প্রকাশ পেয়েছে। বলা দরকার, হাংরি জেনারেশন মকদ্দমায় জড়িয়ে যাওয়ায় তাঁর গার্লস কলেজের

অধ্যাপনার চাকরিটি চলে যায়। জীবিকার জন্য তিনি লণ্ডন চলে যান। চিঠিটি লণ্ডন থেকে ১০ই এপ্রিল ১৯৬৭ তে লিখিত হয়েছিল। তবে উৎপলের কবিতায় আঙ্গিক প্রধান। তাঁর কবিতায় আধুনিক জীবনের অসুখ, নাস্তিকতা, অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় প্রকাশিত। সেখানে কোনো অস্থিরতাও নেই। অশ্লীলতা থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

(ঝ) সুবিমল বসাক ঃ

সুবিমল বসাক ষাটএর দশকে গল্প রচনা করেই হাংরি আন্দোলনে যোগ দেন। সত্তরের দশকে 'হাবিজাবি' নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ বার হয়। সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ঢাকার উপভাষায় মোট ৩০টি কবিতা। প্রত্যেকটি কবিতাই 'হাবি জাবি' শীর্ষনাম সংযুক্ত। রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিতে ব্যক্তির অস্থিরতার ছবিটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। খুবই বিবরণধর্মী কথাবার্তা রয়েছে, কোনও কাব্যময়তা নেই। তবে ক্রোধ আছে যা লক্ষণীয় ঃ

স্বাধীনতার কথা কইতে গিয়া, এক সভায়, হাতাহাতি
থিক্যা, মারপিঠ, মুখ কালাকালি হইয়া গেল কতজনের।[৪৭]

(ঞ) ত্রিদিব মিত্র ঃ

ত্রিদিব মিত্র 'জেব্রা' পত্রিকায় লিখতেন। দেবী রায় বা সুবিমল বসাকের চেয়ে তাঁর কবিতার উৎকর্ষ সহজেই চিনে নেওয়া যায়। 'গয়ের' কবিতায় তিনি লিখেছেন, —

তোমাদের ধূ ধূ সার্থকতার সামঞ্জস্য জানতে
অম্লান ছুটে গেছি শরীর নিয়ে শরীরের ভিতর
হাততালি দিয়ে বন্ধ করেছি রোমকূপের কর্ণবিদারী জলপ্রপাত
প্লুত রৌদ্রে বারবার চোখ মেলে দিয় ...
ওৎ-পাতা ধোঁয়া ও আবছা বিকেলের সূর্যোদয় রমণীর শরীরে
ঢুকে গেছি অনায়াসে ... [৪৮]

এখানে ব্যক্তির অপারশূন্যতা থেকে মুক্তি পেতে নারী শরীরে কবির আশ্রয় নেওয়া, নগর প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এবং অনুভূতির নানা ইঙ্গিত অত্যন্ত কাব্যিকতা লাভ করেছে। আধুনিক সমাজ, জীবন এবং যান্ত্রিকতার সঙ্গে আধুনিক মানুষের টানাপোড়নটিও চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন ত্রিদিব, —

সমাজের ভুল চেতনা থেকে নিজেকে ঝুলিয়ে দিলাম শূন্যের বেতারে
টেলিফোনের মধ্য দিয়ে রোজ ৩ কোটি চুমু

এপার ওপার করছে পৃথিবীময়
রেলের মোটা তার বেয়ে উড়ে যাচ্ছে ৭ কোটি মাছি
আমার শরীরের চারদিকে অসংখ্য টোপ।[৪৯]

দুঃখের বিষয় ত্রিদিব পরবর্তীকালে আর বিশেষ কবিতা লেখেনি।

(ট) রবিউল হুসাইন ঃ

রবিউল হুসাইন 'ক্ষুধার্ত', 'স্বকাল', 'ফু' ইত্যাদি পত্রিকায় কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁকে একজন পরাবাস্তবাদী কবি বলা যায়। তবে শব্দ ব্যবহার ও কথন ভঙ্গীতে হাংরি বৈশিষ্ট্য দুর্লক্ষ্য নয়। রবিউলকে একজন স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত শক্তিশালী কবি বলা যায়। তাঁর খুবই স্বল্প সংখ্যক কবিতা পাওয়া যায়। তাঁর কবিতার দুটি উদাহরণ কণা —

(ক) এই যে নিঃশ্বাস ফেলা এবং নেয়ার গাঢ় প্রচেষ্টা
ঘুমের ভিতর আর্তি

(খ) যেন কোন গ্রামের কোন মানুষের মুঠো ধরা ধানের বীজ
ছড়িয়ে আদিগন্ত শস্য ভূমি ঢেউয়ে দোলানো ধানের মাঠ
কিষান - বউয়ের ঢেঁকির পাড় থেকে গঞ্জের বস্তাবন্দী চালের
বাজার থেকে আবার বাড়ির রান্নাঘরে অগিন্নাত হয়ে
খাবার ঘরে এসে ধোঁয়ার পতাকা উড়িয়ে সেই সব চেনাজানা
পথ পেরিয়ে ..... লোহার পাইপ বরাবর নিরুদ্দেশ যাত্রা
অতঃপর।[৫১]

যতিচিহ্নহীন, আপাতঅন্বয়হীন শব্দ পরম্পরায় এভাবে রবিউলের বক্তব্যস্রোত পংক্তি থেকে পংক্তিতে বয়ে চলে।

সুতরাং একথা বলা যায় যে, হাংরি কবিতার ধারাটি পর্যাপ্ত ফলবান ও বৈচিত্র্য পূর্ণ।

তথ্য সূত্র ঃ

১. মলয় রায় চৌধুরী, অসীমাংসিত আবাস, শয়তানের মুখ / প্রকাশক - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৭১, পৃ ঃ ৯।

২. তদেব, (আমি), পৃঃ ১১।

৩. তদেব, (অধঃপতন), পৃ ঃ ১৫।

৪. তদেব, একিলিসের গোড়ালিতে নিক্ষিপ্ত তীরের প্রতি) পৗঃ ১২।

৫ তদেব, পৃ১ ১৩।

৬. তদেব, পৃঃ ১৪।

৭. মলয় রায় চৌধূরী, জখম (দ্বিতীয় প্রকাশ), কবিতীর্থ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ১১।

৮. তদেব, পৃ ঃ ১২।

৯. তদেব, পৃ ঃ ২৫।

১০. তদেব, পৃ ঃ ১৩।

১১. তদেব, পৃ ঃ ১৬

১২. তদেব, পৃ ঃ ৩০।

১৩. মলয় রায়চৌধুরী, আমার অমীমাংসিত শুভা, প্রকাশক, কবি স্বয়ং, পাটনা, ১৩৭১, পৃঃ ৬।

১৪. মলয় রায়চৌধুরী, জখম, কবিতীর্থ, কলকাতা, ১৯৯৮ (২য় প্রকাশ), পৃঃ ১৬।

১৫. মলয় রায়চৌধুরী, আমার অমীমাংসিত শুভা, প্রকাশক, কবি স্বয়ং, পাটনা, ১৩৭১, পৃঃ ১১।

১৬. মলয় রায়চৌধুরী, আমার অমীমাংসিত শুভা, প্রকাশক, কবি স্বয়ং, পাটনা, ১৩৭১, পৃ ১০।

১৭. তদেব, পৃ ঃ ১৯।

১৮. তদেব, পৃ ঃ ১২।

১৯. শৈলেশ্বর ঘোষ, জন্মনিয়ন্ত্রণ, (টার্মিনাস পার হতে গিয়ে), ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা পৃঃ ১।

২০. তদেব, (বৈদ্যুতিক ১৯৬৪), পৃঃ ৬।

২১. তদেব (প্রণতির জন্য রাস্তায়) পৃঃ ২৬।

২২. তদেব (আমার মুখ) পৃঃ ৪২।

২৩. তদেব, অপরাধীদের প্রতি, (অপরাধীদের প্রতি), ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ ১।

২৪. শৈলেশ্বর ঘোষ, পূর্ণবাস, (অভিজ্ঞতা) ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৪, কলকাতা, পৃঃ ৫২।

২৫. তদেব, (কালো বুদ্ধ), পৃঃ ৭৮।

২৬. তদেব (পথ) পৃঃ ৫২।

২৭. Arthur Rinband, Collected Poems, Penguin Books, Britain 1997, Page - 11.

২৮. প্রদীপ চৌধুরী, অন্যান্য তৎপরতা ও আমি। বিকল্প সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ৩৪।

২৯. মোহিত চট্টোপাধ্যায়, হাংরি লেখকদের কাছে প্রশ্ন ক্ষুধার্ত পত্রিকা, ১৩৭৬, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই।

৩০. অমিতাভ দাশগুপ্ত, ক্ষুধার্ত ১ম সংকলন, ১৩৭৬ (ক্ষুধার্ত তরুণদে গদ্য বা তজ্জাতীয় কিছু) কলকাতা, পৃঃ চিহ্নিত নেই।

৩১. ফাল্গুনী রায়, আমার রাইফেল আমার বাইবেল / মনচাষা, আলিপুরদুয়ার, ২০০২, পৃঃ ৩১।

৩২. ফাল্গুনী রায়, (নষ্ট আত্মার টেলিভিশন আমার রাইফেল আমর বাইবেল, মনচাষা, আলিপুর দুয়ার, ২০০২, পৃঃ ১৮।

৩৩. ফাল্গুনী রায়, নির্বিকার চার্মিনার, আমার রাইফেল, আমার বাইবেল, আলিপুর দুয়ারে, ২০০২, পৃঃ ১২।

৩৪. ফাল্গুনী রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চশমা, আমি অপদার্থ, গ্রাফিত্তি, কলকাতা, ১৯৯৬ পৃঃ ১,৮।

৩৫. তদেব, পৃঃ ৮।

৩৬. ফাল্গুনী রায়, অনাবশ্যক কবিতা, আমি অপদার্থ, গ্রাফিত্তি, কলকাতা, ১৯৯৬ পৃঃ ১৭।

৩৭. সুবো আচার্য, নিজস্ব বিস্ফোরণ, হাংরি জেনারশেন রচনা সংকলন, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ১০৬।

৩৮. তদেব পৃঃ ১০৭।

৩৯. সুবো আচার্য, মড়ক, জেব্রা পত্রিকা (২য় সংকলন), ১৩৭৪ পৃঃ ২৭।

৪০. সুবো আচার্য, আপাতস্তব্ধতায়, ক্ষুধার্ত পত্রিকা, ৪র্থ সংকলন, কলকাতা ১৯৭৭ পৃঃ ২৬।

৪১. মলয় রায়চৌধুরী, জিজ্ঞাসা সংকলন, প্যাপিরাস, কলবকাতা, ১৯৯২ পৃঃ ৬৭।

৪২. দেবী রায়, আমি ও কলকাতা, নির্বাচিত কবিতা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ ঃ ৩।

৪৩. তদেব, (মানুষ, মানুষ) পৃঃ ৬।

৪৪. তদেব (অপমান) পৃ ৩৭।

৪৫. তদেব (ভাতের গন্ধ) পৃঃ ৩০।

৪৬. সমীর রায়চৌধুরী, কৃত্তিবাস পঞ্চাশ, কৃত্তিবাস, কলকাতা, ২০০৩, পৃঃ ৩১।

৪৭. সুবিমল বসাক, হাবিজাবি, জেব্রা বকুস, ১৯৭০, পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া নেই, তবে অংশটি বইয়ের শেষ পাতায় রয়েছে।

৪৮. ত্রিদিব মিত্র, গয়ের, জেব্রা পত্রিকা (১ম সংকলন) কলকাতা ১৩৭২, পৃঃ ৩৭।

৪৯. ত্রিদিব মিত্র, হত্যাকাণ্ড, জেব্রা পত্রিকা (২য় সংকলন), কলকাতা, ১৩৭৪, পৃঃ ৯৬।

৫০. রবিউল হুসাইন, (ঘুমের ভিতর স্বপ্নের জুটমিল এবং তদীয় শ্রমিক সকল), হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ৩৯৮।

৫১. তদেব (উষসীর প্রতিবেশে এক উর্বর সসেমিরা), পৃঃ ৪০৪।

বন্ধনী চিহ্নিত অংশে কবিতার নাম দেওয়া হল। কিছু কিছু বানানের ব্যাপারে কবিদের নিজস্বতা বজায় রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কথাসাহিত্য

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের কথা সাহিত্যের অংশটিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । হাংরি কথা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক তিনজন । এঁরা হলেন বাসুদেব দাশগুপ্ত , সুভাষ ঘোষ ও সুবিমল বসাক । তিন জনের লেখার বিষয় প্রকাশভঙ্গী ও ভাষা ব্যবহার তিনরকম । কিন্তু হাংরি প্রজন্মের কিছু সাধারন বৈশিষ্ট্য তিন জনের লেখাতেই উপস্থিত । এঁদের মধ্যে বাসুদেব দাশগুপ্ত প্রবীন ও অপেক্ষাকৃত অধিক পরিচিত । প্রথমে তাঁকে নিয়েই আলোচনা করা হল ।

ক. বাসুদেব দাশগুপ্ত

বাসুদেব দাশগুপ্ত ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ সে ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম ধীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত , মাতার নাম সুরোবালা দাশগুপ্ত । বাবা প্রথম জীবনে জরিপ বিভাগের কানুনগো ছিলেন । পরে ব্যবসায় নামলেও ব্যাঙ্ক ফেল হবার জন্যে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন । ফলে , তৎকালীন ওরিয়েন্টাল জীবন বীমার এজেন্ট হয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন । ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ হলে কলকাতায় চলে আসেন তিনি । ১৯৪৮ সালে তিনি পরলোকগত হন । বাসুদেব ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর হাইস্কুলে সরাসরি চতুর্থ শ্রেনীতে ভর্তি হয়েছিলেন । কলকাতায় এসে পার্কসার্কাসের লিংটন ষ্ট্রীটের 'এন্টালি একাডেমি'তে ভর্তি হন পঞ্চম শ্রেণীতে । সেখানে থেকে পরের বছর বেনেপুকুর বিদ্যাপীঠে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তখন ছিলেন মনীন্দ্র কুমার ঘোষ । ঐ সময় বাসুদেব রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আধুনিক গান গাইতেন । গান গেয়ে পুরস্কারও জুটেছে । ১৯৫৪ সালে বাসুদেব স্কুল ফাইনাল পাস করেন । ১৯৫৭ সালে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে আই - এস - সি পাশকরেন । রসায়নশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি .এস .সিতে ভর্তি হয়েও শেষে ড্রপ দেন । ১৯৬১ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে পরে তিনি বাংলা অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েট হন । কলেজে পড়ার সময় বাসুদেব district water company তে চাকুরি কড়তেন। ওদিকে যখন তিনি কলেজের ছাএ , সেই সময় পৃথবীশ শিকদারের সঙ্গে আলাপ ও বন্ধুত্ব ঘটে । কারণ তখন দুজনেই ছাএ ফেডারেশনের কর্মী ।

ঐ সময়ই পোস্টার 'একজিবিশান' করবার সময় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। বাসুদেব সে সময় কিছু ছবিও এঁকেছিলেন 'মৌচাক' পত্রিকায়। তাঁর ছবি ছাপানো হয়েছিল। কলেজে পড়বার সময়ই ১৯৫৯ সালে রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে বাসুদেবের একটি গল্পটির প্রকাশিত হয়েছিল। বাসুদেবের সেই প্রথম গল্পটইর নাম ছিল 'চোরাবালি'। ১৯৬২ সালে তিনি একটি জুনিয়ার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। তখন মাসে বেতন পেতেন একশত টাকা। ১৯৬৪ সালে পানিত্রাস হাইস্কুলে ২১০ টাকার সহকারি শিক্ষকতার কাজ পান। ১৯৬৫ সালে হাবড়ার কল্যানগড় বিদ্যামন্দিরে স্থায়ী ভাবে শিক্ষকতার চাকুরি লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে সেখান থেকেই অবসর গ্রহণ করে।

বাসুদেবেরা পাঁচ ভাই, এক বোন। বড় দাদার নাম নির্মল দাশগুপ্ত, দিদির নাম - অনিমা দাশগুপ্ত (পরে সেনগুপ্ত)। তাঁর পরবর্তী দাদারা হলেন যথাক্রমে পরিমল দাশগুপ্ত, কমলেশ দাশগুপ্ত, চরন দাশগুপ্ত। বাসুদেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৯৭০ সালে ইন্দিরা কুন্ডুর সঙ্গে বাসুদেব পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বাসুদেব ও ইন্দিরার দুটি সন্তান, ছেলে - আনন্দ দাশগুপ্ত, মেয়ে - অমৃতকণা দাশগুপ্ত। ১৯৬২ সালে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের যোগসূত্রে বাসুদেব হাংরি জেনারেশন আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬২ সালেই 'উপদ্রুত' পত্রিকায় 'উৎপাত' নামে একটি নভেলেটের দুটি কিস্তি প্রকাশ করেন বাসুদেব। ১৯৬৩ সালে তাঁর বিখ্যাত 'রন্ধনশালা' গল্পটি বার হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে 'দেশ' পত্রিকায় 'রতনপুর' গল্পটি প্রকাশ লাভ করে। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে বিতর্কিত হাংরি জেনারেশন সংখ্যাটির উপর মামলা শুরু হয়। ১৯৬৫ সালে বাসুদেবের 'রন্ধনশালা' শীর্ষক গল্পগ্রন্থটি উৎপল কুমার বসু প্রকাশ করেন। ১৯৬৫ সালে 'জেব্রা' পত্রিকায় 'রিপুতাড়িত' নামে একটি গল্প রচনা করেছিলন বাসুদেব। ১৯৬৭ সালের 'জেব্রা' পত্রিকায় 'অভিরামের চলাফেরা' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৭ সালেই ক্ষুর্ধাত 'প্রতিরোধ' পত্রিকাতেই অভিরামের চলাফেরা' নামে আরেকটি গল্প তিনি লিখেছিলেন। ১৯৬৮ সালে কৃষ্ণগোপাল মল্লিকের গল্প 'কবিতা' পত্রিকায় তিনি 'লেনি ব্রুস ও গোপাল ভাঁড়কে' নামে গল্পটি রচনা করেন। ১৯৭১ সালে 'ক্ষুর্ধার্ত' পত্রিকায় 'দেবতাদের কয়েক মিনিট' গল্পটি প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালেই 'নিষাদ' পত্রিকায় 'আনন্দবাজার গোয়েন্দা আর্তনাদ রিপ রিপ' নামে আরও একটি গল্প বেরোয়।

১৯৭২ সালে 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় 'ডং ওয়াং এর গোপন সংকেত' গল্পটি মুদ্রিত হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় বাসুদেব দাশগুপ্ত লেখেন 'বাবা' নামে একটি গল্প। ১৯৮৬ সালে 'মৃত্যু গুহা থেকে প্রথম কিস্তি' ১৯৬৭ সালে 'মৃত্যুগুহা থেকে দ্বিতীয় কিস্তি' ও 'মৃত্যুগুহা থেকে 'তৃতীয় কিস্তি' গল্প তিনটি 'বিজ্ঞাপন পর্ব' পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে 'বর্ণপরিচয়' পত্রিকায় 'বন্দী বাস্তবতা - আমার অলিখিত গদ্যের ছিন্নরূপ' নামে একটি অন্য ধরনের গল্পও বাসুদেব লিখেছিলেন। ১৯৮৭ সালে 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় শেষ প্রহরের অভিযান গল্পটি প্রকাশ পায়। ১৯৯০ সালে 'এখন এই সময়' পত্রিকায় 'এসো' গল্পটি রচিত হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে 'এই সহস্রধারা' পত্রিকায় 'মৌন নগরীর ইতিকথা' এবং ১৯৯৬ সালে 'মৌননগরীর ইতিকথা' (২) গল্পটির রচনার মধ্যে দিয়ে বাসুদেব দাশগুপ্ত তাঁর লেখক জীবনের ইতি ঘটিয়ে দেন। তবে মাঝখানে ১৯৮৩ সালে বাসুদেবের 'রন্ধনশালা' গল্পগ্রন্থটির একটি সংকলন বরে হয়। এতে প্রথম সংস্করনের চারটি গল্প ব্যতীত নতুন একটি গল্প সংযুক্ত করা হয়। পুরোনো চারটি গল্প হল - 'রন্ধনশালা', 'রতনপুর', 'বমনরহস্য', 'বসন্ত উৎসব'। নতুন গল্পটি হল - 'দূরবীন'। এগুলির মধ্যে 'বমন রহস্য', 'বসন্ত উৎসব' এবং 'দূরবীন' কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। সরাসরি গল্প গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাসুদেবের অন্যান্য গল্পগুলো এখনও সংকলিত হয় নি। নানা পত্র পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই এখনও সেগুলি ছড়িয়ে রয়েছে।

সাধারণভাবে বাসুদেব দাশগুপ্তের গল্পগুলিতে দুটি স্তর লক্ষ করা যায়। ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত একটি স্তর এবং ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত অন্য একটি স্তর। প্রথম স্তরের গল্পে বাসুদেব মানুষের ব্যক্তি সাল পর্যন্ত অন্য একটি স্তর। প্রথম স্তরের গল্পের বাসুদেব মানুষের ব্যক্তি সত্তাকে প্রাধান্য দেয়েছেন। ঐ ব্যক্তিটি আবার এক নির্বিশেষ ব্যক্তি। দ্বিতীয় স্তরে সমাজ ও রাজনীতির প্রাধান্য দেখা গেছে। সেখানে একটি বিশেষ যুগ ও দেশ কালের পটভূমি প্রাধান্য লাভ করেছে। লেখকের একটি রাজনৈতিক দর্শনও স্পষ্টতা পেয়েছে।

বাসুদেবের প্রথম গল্প 'রন্ধনশালায়' হাংরি জেনারেশনের অনেকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। গল্পটির শুরু একটা ভেড়ার বাচ্চাকে খপ করে ধরে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করার বৃত্তান্ত দিয়ে। দুই ক্ষুধার্ত বন্ধু তাকে রান্নাও করে ফেলেন।

তবে শেষ পর্যন্ত সেই মাংস না খেয়ে তারা ভেড়ার বাতিল নাড়িভুঁড়ি, শিং, চামড়া ইত্যাদি খেতে শুরু করেন। লেখক বলেন,

> কত দিনের যেন কত রাতের যেন কত বছরের বুঝি হাজার বছরের ক্ষিধেয় শ্লন দিতে থাকি।১

শৈলেশ্বর ঘোষ গল্পটির সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,-

> ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের ক্ষুধা এই ভাবে তৃপ্তি খুঁজছে। সর্বগ্রাসী এই ক্ষুধা ভারতবর্ষের আত্মার প্রতিটি কোষে আজ বিরাজ করছে। 'বাসুদেবের রন্ধনশালা' গল্পে সেই সর্ব অস্তিত্বগ্রাসী ক্ষুধা এই ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এ লেখা এক কথায় আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছিল। শক্তির সেই হাংরি জেনারেশন বিষয়ক প্রস্তাবে ক্ষুধা সম্পর্কে অতি সীমিত যে ধারণা দেওয়া হয়েছিল বাসুদেব এই লেখায় তাকে সুদূরপ্রসারী করেন দেন।২

লক্ষণীয়, 'রন্ধনশালা' গল্পে সর্ব অস্তিত্বগ্রাসী ক্ষুধা ব্যাপারটি কী? অস্তিত্ব বলতেই বা এখানে কী বোঝানো হয়েছে ? এখানে ছোট গল্প সম্পর্কে মলয় রায়চৌধুরীর একটি ধারণাও প্রাসঙ্গিক -

> আজকের ঠুনকো জীবনের আচ্ছন্ন সক্রিয় অরাজকতার স্ফটিক হয়ে উঠবে ছোটগল্প; দৃষ্টির অতীত যে বিশাল বিস্তৃত বিশ্বাসঘাতী অথচ সম্ভাবনা পূর্ন উদ্ভাস তার এলোমেলো খাবল; এটা তাদের পক্ষেই সম্ভব যাঁরা অস্তিত্বের আঘাত নেবার জন্যে নিজেদের ক্ষত তুলে ধরেছেন।৩

গল্পটিতে দুটি চরিত্র -কথক এবং রবীন। সম্পর্কে তারা পরস্পরের বন্ধু। তাদের দুজনের মধ্যেই একধরনের উৎকেন্দ্রিকতা আছে। কঠোরতা আছে। তারা দুভাবেই অনিকেত। মানব সমাজের থেকে বহুদূরে এক শীতল, ভয়ংকর আরণ্যক পরিবেশে এসে পড়েছেন তারা।

এ ছাড়া এ গল্পে একটা আতঙ্কের পরিবেশও আছে। বিকট চেহারাওয়ালা পাখির কান্নার প্রক্ষেপনে। সমবেত অচেনা মানুষের আক্রমণে, উত্তরসূরীদের নিরন্নতার সম্ভাবনায় তা প্রকট। এর যেমন একটা আর্থ সামাজিক দিক আছে, তেমনই ব্যক্তির নিরাশ্রয়তার দিকও। তাই এ গল্পকে যেমন জীবনানন্দ দাশের ১৯৪৬-৪৭ সাল কবিতার কিয়দংশের সঙ্গে মেলানো যায়, তেমনি মিলিয়ে নেওয়া যায় অস্তিত্ববাদের সঙ্গেও।

১৯৬৩ সালে বাসুদেবের 'বমনরহস্য' গল্পটি রচিত হয়। বন্ধু সুকুমারের বিবাহ-উৎসব গল্পের পটভূমি। বিয়েবাড়ির সামাজিকতা লৌকিকতা ও সৌন্দর্যকে প্রথম থেকেই লেখক আঘাত করে চলেছেন। লক্ষ্য করার যে সুকুমারের বাড়ির লোকেরা, সুকুমারের শ্বশুর বাড়ির লোকেরা এবং সুকুমারের বন্ধুরা - সবাই অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল। বিয়ে, সামাজিকতা - এগুলিকে লেখক ভড়ং হিসাবে দেখিয়েছেন। বিয়ে বাড়িতে যখন বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত অবস্থা সেই মুহূর্তে একটি উদ্ভট ঘটনার অবতারনা করেন গল্পকার। পাড়ার ময়রার দোকানে সুকুমারের শ্বশুর মশাই রাজীববাবু ও বাবা মাতাল হয়ে ঢুকে পড়েন। তেল ভর্ত্তি লোহার কড়াইয়ে সুকুমারের বাবা মনোদুঃখে লাফ দেন। আনমনা কারিগর তাকে হাতা দিয়ে উল্টোপাল্টা ভাজতে থাকে। ফলে তার দেহ ফেটে গিয়ে কড়াই উপচে জলস্রোত হয়ে নীচে পড়তে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই চলে আসে পুলিশ। সুকুমারের বন্ধু (কথক নিজে) ভয়ে ছুটতে থাকেন। ছুটতে ছুটতে তিনি পৌঁছে যান একটি চারতলা বাড়িতে। সেখানে গানের আসর বসেছে - যেন বাইজি বাড়ি। পরমুহূর্তেই তাঁর মনে হয় তিনি একটি মাংসের বাজারে দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে খাসি, পাঁঠা, গরু, মোষ, শুয়োর, হরিণ, হাতি প্রভৃতি জন্তুর ছাল ছড়ানো বীভৎস দেহ গুলো ঝুলছে। শুধু তাই নয় মানুষের মাংসও পাওয়া যাচ্ছে। সাইনবোর্ডে লেখা আছে - এই খানে হৈমন্তীর মাংস পাওয়া যায়, এই খানে সুকুমারের মাংস পাওয়া যায়। এই খানে চম্পার মাংস পাওয়া যায়। হৈমন্তী হচ্ছেন সুকুমারের বৈমাত্রেয় বোন, আর চম্পা হচ্ছেন তার শ্যালিকা। লেখক জানান,

> দড়িতে ঝুলতে থাকা ছাল ছড়ানো মানুষ গুলো এই বার আঙ্গুল দিয়ে চোখের উপর দিয়ে জমাট বাঁধা রক্ত মুছে নেয়। জিভ বার করে নিজেদের শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত চেটে খায়। তারপর সকলে এক যোগে আমার দিকে তাকিয়ে খলখল হেসে ওঠে।৫

কথক আর সইতে পারেন না। তাঁর শরীরের সব নালী প্রনালী পাক দিয়ে ওঠে। সব আলো পর্যবসিত হয় অন্ধকারে। শেষে মাংসহাটার রক্তাক্ত পথকর্দমে তিনি বমি করতে থাকেন। সমস্ত চর্বিত মাংসের টুকরো, সমস্ত জীবনভর ধরে খেয়ে যাওয়া যাবতীয় মাংসের টুকরো আমি বমি করে উগড়ে বার করতে থাকি।

'রন্ধনশালা' গল্পে যেন কিছুটা বিষন্নতারও পরিবেশ ছিল। কিন্তু 'বমনরহস্য' গল্পে বিদ্রূপে ও ঘৃণার প্রকাশ তীব্র হয়ে উঠেছে। জীবনভর খেয়ে যাওয়া মাংস মানে এতদিনকার অর্জিত সংস্কার ও শিক্ষাদীক্ষার কথাই যেন লেখক বলতে চেয়েছেন। বলতে চেয়েছেন সামাজিক ঐতিহ্য গুলির অন্তঃসারশূন্যতার কথা।প্রেম তো বটেই যৌনতাকেও বাসুদেব কটাক্ষ করেছেন এখানে। গল্পটি প্রসঙ্গে অমিতাভ দাশগুপ্ত লিখেছেন,-

> বড় দীর্ঘকালে বাঁচার সঙ্গে সঙ্গে পাথুরে যুগ থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু ইনুনি বিনুনি ধ্যাষ্টামো বানানো উপর চালাকি ভ্যাজ ভ্যাজ সুখ, ধাপ্পাবাজ গৃহী মানুষের আচরণবাদে থিক থিক করছে তার দুর্গন্ধে টিকতে না পেরে বাসুদেব পয়লা চোট বমনরহস্য"গল্পে বমি করে যাই রক্তাক্ত পথের উপর.....।"৬

বাসুদেবের 'রতনপুর' গল্পটিকে তাঁর গল্পধারায় আলাদা রূপে চিহ্নিত করা যায়। কারণ বাল্য প্রেমিকের জন্যে হাহাকার ও রোমান্টিক আত্ম-অবলুপ্তি বাসুদেবকে একটি ফ্যানটাসী রচনায় এখানে উৎসাহিত করেছে। মহানগরীর কফি হাউসে রতনপুর গ্রাম, নায়কের প্রেমিকা চুমকি, রুমকি ইত্যাদি সব কিছু সহ উঠে এসে এখানে একটি অ্যাবসার্ড জগৎ রচনা করেছে। রতনপুরের অপরিচিত তরুণদের হাতে নায়কের প্রহত হবার ঘটনাটিকে এখানে অবশ্যই স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু চুমকি তাঁকে বাঁচানোর জন্য জল ছিটিয়ে ছোট করে চুলের মধ্যে গুঁজে রাখে। তখন নায়ক অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ। আমাদের উপনিষদে অঙ্গুষ্ঠ প্রমান আত্মার কথা আছে। তবে নায়ক নায়িকার আত্মা নয়। বরং নায়িকাই নায়কের আত্মা স্বরূপে। আবার অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলাও' আছে। কফি হাউস থেকে বেরুনোর সময় হুড়োহুড়িতে চুমকির চুল থেকে ক্ষুদ্রাকার নায়ক গড়িয়ে পড়েন। চুমকিরা বুঝতে পারেন না। গাড়ি করে চলে যান। ফলে, পরিত্যক্ত হতে হয় নায়ককে। রতনপুর চুমকি সবই অধরা থেকে যায় তাঁর কাছে। প্রেম - সৌন্দর্য স্মৃতি একটি বিলুপ্ত দ্বীপের মত পড়ে থাকে।

'বসন্ত উৎসব' বাসুদেব দাশগুপ্তের চতুর্থ গল্প। এ কালের যুগ মনের বিকার ও অসুস্থতার একটি ভয়াবহ চিত্র এখানে আঁকা হয়েছে। আবার সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ রোম্যান্টিকতার দিকে অভিযাত্রাও রয়েছে। মণিকার প্রেমিকা দুই-জন, কথক ও তাঁর বন্ধু শঙ্কর। মনিকাকে নিয়ে একটি দুঃস্বপ্ন দেখার পর কথক তাঁকে খুন করেন। কথক অসুস্থ ও শারীরক ভাবে অক্ষম হলেও আসঙ্গলিপ্সু। তাই মণিকা গায়ে হতে বুলিয়ে তাকে সান্তনা দেন। এতে লেখক গলে যেতে শুরু করলে মণিকা তাঁকে গামলায় বসিয়ে দেন। তিনি সম্পূর্ণ গলে গেলে মণিকা তাকে হাঁ করে রাক্ষসীর মতো চুমুক দিয়ে খেতে আসেন। আতঙ্কিত লেখক চেঁচিয়ে ওঠেন ভয়ে। ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম ভাঙার পর ঐ সাত সকালেই মণিকার বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়েন। সেখানে মণিকাকে গলা টিপে হত্যা করেন। হত্যার আগে তাদের মিলনও ঘটে। লেখক মণিকার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে মণিকাকে লেখা তার বন্ধু শঙ্করের প্রেমপত্র আবিষ্কার করেন। মণিকার বাড়ি থেকে লেখক শঙ্করের বাড়িতে চলে যান। লোহার রড দিয়ে সুযোগমতো শঙ্করকেও হত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু হত্যা করতে পারেন না শঙ্করের কুকুর টমের জন্যে। তার ঘেউ ঘেউ চীৎকারের জন্য। শঙ্কর তখন দাড়ি কামানোয় ব্যস্ত। শঙ্করের বাড়ি থেকে লেখক যখন বেরোন তখন কিছুটা বেলা হয়েছে। কমলালেবুর মতো রোদ ছাড়িয়ে পড়েছে। একদল যুবক, একদল শিশুর সাথে দেখা হয়। ওদের সাথেই এগোতে এগোতে লেখক পৌছে যায় একটি মেলায়। বাচ্চাদের সঙ্গে লেখকের নাগরদোলা ঘুরতে ঘুরতে অনেক উঁচুতে উঠে যায়। সেখান থেকে দূরে দেখা যায় একটি হ্রদ। হ্রদের ভিতর সাদা পাল তোলা নৌকা ভেসে বেড়ায়। নৌকা গুলিতে ফুলের গয়না পরা অসংখ্য তরুনী। হ্রদের চারপাশে বড় বড় গাছ - তারই একটির নীচে ঘাসের উপর রুমাল পেতে বসে পড়েন লেখক। রুমালে রক্তের শুকনো কালো দাগ। তার দিকে নৌকা গুলো এগিয়ে আসে - যাদের একটি থেকে এক তরুনী - নীলুদা বলে ডাকে তাকে। সে হচ্ছে অমলের বোন আরতি। অন্য নৌকাগুলো থেকেও তরুণী, ফুল কুমারীরা যেন তাকে ডাকতে থাকে এসো, তুমি আমাদের নৌকায় এসো, আরতির নৌকা ক্রমশ ঃএগিয়ে আসে।৭

এই গল্পে, সৌন্দর্যের প্রতি গল্পকারের আর্কষণ প্রাধান্য পেয়েছে। সুস্থ রোম্যান্টিক আদর্শের প্রতি স্পষ্ট হয়েছে পক্ষপাত। তাই মণিকার ক্ষুধার্ত ব্যাদান ও ব্যাভিচারকে সহ্য করা হয় নি। অসুন্দরকে হত্যা করা হয়েছে তাই। ফুলকুমারীর, আরতি যেন বাসুদেবের ক্রিষ্টাবেলা বা রবীন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশ যাত্রার সেই চালিকা। রোম্যান্টিকতার অনির্দেশ্য সৌন্দর্যাভিসারে গল্পের পরিণতি। বাসুদেব দাশগুপ্তের পঞ্চম গল্প 'দূরবীন'।

জীবন ও জগতের মানুষের আসল রূপটি ? যা প্রতীয়মান তাই না কি, আপাত প্রতীয়মানতার আড়ালে তার অন্য কোনো মূর্তি ? এই প্রশ্নই এ গল্পে তোলা হয়েছে। শৈলেশ্বর ঘোষ তাঁর ইস্তাহারে জানিয়ে ছিলেন যে, তাঁদের লক্ষ হল ৭(খ) অস্তিত্বের গোপনতম প্রদেশে লুকানো যা কিছু - যা ক্রমাগত মানুষকে মিথ্যার দিকে নিয়ে যায়। মুখোশের দিকে নিয়ে যায় তাকে প্রকাশ করা।

'দূরবীন' গল্পটিই যেন হাংরিদের এই তত্ত্বেরই রূপায়ন। এ গল্পের অমল এক আশ্চর্য স্বভাবের মানুষ। বাস্তবতা নয়। কল্পনার জগতে তিনি বাস করেন। কল্পনাকেই তিনি সত্য মনে করেন, বাস্তবতাকে মায়া। মাসতুতো বোন তপতীর প্রতি তার নিষিদ্ধ প্রেম। এদিকে বন্ধু শোভনের বাড়ির প্রাচীন সিন্দুক থেকে একটা অদ্ভুত দূরবীন মেলে। সেটা চোখে লাগালে অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হয়। সামনের বস্তুজগৎ পাল্টে অন্য জগতে রূপান্তিরত হয়। বন্ধুর কাছ থেকে সেটা অমল নিজের বাড়িতে এক সপ্তাহের জন্যে নিয়ে এসে চারপাশের অদ্ভুত কীর্তিকলাপ দেখতে থাকেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। দূরবীন তাকে যা দেখায় তা তিনি মেনে নিতে পারেন না। চারপাশের মানুষজন সম্পর্কে তার কৌতূহল কিন্তু বেড়েই চলে। ক্রমে দূরবীন ছাড়াই তিনি মানুষকে নজর করতে থাকেন। তার এই উঁকিঝুঁকি মারা সাধারণ প্রতিবেশীরা মেনে নিতে পারেন না। একদিন দেখা যায় ঐ সব লোকজন সবাই মিলে তার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছেন। এবার তপতী দূরবীনটা দিয়ে জ্বলন্ত অমলকে লক্ষ্য করেন। অমল যেন একটা বিকটাকার দৈত্য, মাথায় দুটো শিং, ঠোঁটে গজদন্ত, শরীর ধূসর লোমে আবৃত। এরপর তপতী দূরবীনটা নামিয়ে রেখে ঐ আগুনের মধ্যে অমলকে জড়িয়ে ধরেন। দুজনে পুড়ে যেতে থাকেন। 'দূরবীন' আসলে দেখবার ভঙ্গী-দূর থেকে, কাছ থেকে, সোজা করে, উল্টো করে। দূরবীনই এখানে বোঝায় যে, মানুষকে যে রকম দেখায়, প্রকৃতই সে রকম নয়। আবার এ গল্পে অবসেসনের মুক্তির ব্যাপারটিও আছে যা - থেকে হাংরি কবি লেখকরা মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। মাসতুতো বোনের সঙ্গে প্রেমের জ্বলন্ত আগুনে অমলের পুড়ে যাওয়া তাই এখানে স্বাভাবিক। দূরবীন যন্ত্রটিও যেন অমল, বা তপতীকে অবসেসন থেকে মুক্তিই দিতে চায়।

লেখকের ষষ্ঠগল্প 'রিপুতাড়িত'। যৌনতার তীব্র আর্তি দিয়ে গল্পের শুরু হয়েছে। সুন্দরী সুগায়িকা তরলাকে লেখকের প্রয়োজন তা যে ভাবেই হোক। অবশেষে বেলার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তিনি পান রেঁস্তোরা, সিনেমা হল প্রভৃতি জায়গায়। তাকে নিজের ঘরেও যেতে রাজী করেন।

এমনি সময়ে তীব্র প্রস্রাবের বেগ আসে। তরলাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে নগরীর গলি পথে তিনি ছুটতে থাকেন। কোথাও প্রস্রাব করার জায়গা পান না। অনেক ক্ষণ বাদে একটা পার্কে পৌঁছে যান - সেখানে ঝোপের পাশে এক যুবক ও যুবতী প্রেমলীলায় মত্ত। ঐ ঝোপেরই এক পাশে দাঁড়িয়ে লেখক প্রস্রাব সেড়ে নেন। প্রেমিকটি নিশ্চিন্ত এই ভেবে যে, লোকটা পেচ্ছাব করছে বলবে না কিছু। লেখক নিশ্চিন্ত - ওরা প্রেম করছে। বলবে না কিছু। প্রেম ও প্রস্রাবের এ এক আশ্চর্য সমাপতন। দেবেশ রায় লিখেছিলেন,-

> গল্পটা নিহিত আছে কেমন করে একটি প্রেমের গল্প পেচ্ছাবের গল্প হয়ে ওঠে - এই স্তর পরম্পরায় যেটা বাসুদেব লাফিয়ে পার হন। ৮

লক্ষণীয় যে, যৌনতাকে প্রস্রাবের পাশে রেখে তাকে একটি তুচ্ছ প্রাকৃতিক কর্ম হিসাবেই লেখক বর্ণনা করেন। এমনকি প্রস্রাবের চেয়েও গৌনতা দেন তাকে। এতদিন ধরে বাংলা গল্পে প্রেমের যে শোভনরূপটি ছিল তাকে এখানে সচেতন ভাবে ধ্বংশ করা হয়েছে। সে দিক থেকে প্রেম, সৌন্দর্য, আবেগ এগুলির আর কোনো গুরুত্ব রইল না। দেবেশ রায় স্তরপরম্পরা বলতে ঐ ব্যাপারগুলিকেই হয়তো ইঙ্গিত করেছেন। হাংরিদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনন্দনে এই গল্পটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

বাসুদেবের 'অভিরামের চলাফেরা' গল্পটি এক আধুনিক তরুণের মানসিক বিচ্ছিন্নতার কাহিনী। তবে সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে তার মানসিক আদান প্রদান আছে। বিষাদ বিরাগ, ঘৃণা নয়। ভয়-ই অভিরামকে তাড়া করেছে। তবে মফঃস্বলের প্রকৃত চরিত্রটিকে স্পর্শ করে। তবু চরিত্রটি কেন বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতার শিকার তা এখানে স্পষ্ট করা হয় নি। একই নামে বা এই গল্পটির একটি দ্বিতীয় পর্বও আছে। একটি চরিত্র ও থিম সেখানে পুনারাবৃত্ত। আলাদা করে কোনো বিশিষ্টতা এই গল্প দুটিতে পাওয়া যায় না।

'লেনিব্রুস ও গোপাল ভাঁড়'কে গল্পে বস্তিজীবনের কদর্যতাকে প্রতিফলিত করা হয়েছে। বিহারী দেহাতী জীবনের নিচু তলার ছবি পাঠকের কাছে অসহনীয় ঠেকে।

ঘাটাল, গোবরের দলা, লক্ষ মাছির ভনভনানির মধ্যে কালো মোটা বউয়ের সঙ্গে হরকিষানের উন্মুক্ত কুৎসিত রতিক্রীড়াটির ছবিটি মধ্যবিত্ত ভদ্রবাবু রুচি বোধকে আঘাত করবার জন্যেই। কয়েকটি মধ্যবিত্ত চরিত্রও আছে এখানে। আছে ১৩নং রামলাল আগরওয়াল লেনের নিষিদ্ধ পল্লী। গল্পটি প্রসঙ্গে দেবেশ রায় বলেছেন,-

> প্রথম অধ্যায়টি শেষ হয়েছে হরকিষান আর তার ধুমসী বৌয়ের রতিক্রিয়ায়, দ্বিতীয়টি পায়খানায়, তৃতীয়টি বাত কর্মে ..... শেষ অংশ গুলিতে এসে আমরা চমকে চমকে উঠে আবিষ্কার করি আসলে রতিক্রিয়া, মলত্যাগ, বাতকর্ম ইত্যাদি শারীরিক ঘটনাই যেন আমাদের মানবিক মানসিক সম্পর্কগুলির নিয়ন্তা। মন নিয়ে ছিচকাঁদুনির বিরুদ্ধে এটাই বাসুদেবের অস্ত্র। ৯

হাংরিরা মধ্যবিত্তের সীমানা যে অন্ত্যজ জীবনের অন্ধকারে দিকে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, সমস্ত মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে ভেঙ্গে ফেলার কথা বলেছিলেন, এই গল্পে তারই যেন কিছুটা প্রয়াস। মলয় রায় চৌধুরী লিখেছিলেন: —

> আমি চাই আমার লেখাকে রুক্ষ, কাঁচা খসখসে, অকাব্যিক, কুৎসিত, অশোভন, অভদ্র আর নিদানিক করে তুলতে। ১০

এই সংকল্প যেন বাসুদেবের গল্পে অনেকখানি প্রতিপাদন করা হল।

হাংরি জেনারেশন প্রজন্মের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হিসাবে বাসুদেবের 'দেবতাদের কয়েকমিনিট'কে চিহ্নিত করা যায়। 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকার প্রথম সংকলনের এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ১,২,৩ এভাবে ক্রমান্বয়ে ২৫টি মিনিটে গল্পটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। গল্পটির উপস্থাপনা, বর্ননা, চরিত্রচিত্রণ, বক্তব্য প্রক্ষেপণ - সবই খুব এলোমেলো। এই অবিন্যস্ততার মধ্যে দিয়ে এবং চরিত্র গুলির আচরণের মধ্য দিয়ে জীবনের শৃঙ্খলাহীনতার ইঙ্গিত দিয়েছেন গল্পকার। ছয় বন্ধু মিলে বেশ্যাদের কোঠাবাড়িতে উপনীত। ছজনেই নিম্নবিত্ত শ্রেণীর, চালচুলোহীন যৌন বুভুক্ষু তরুণ। সব কিছুতেই তাদের ঘৃণা। লাম্পট্য নয় - যৌন কদর্যতা এখানে প্রধান। লেখক যৌনতাকে আক্রমণ করেছেন এখানে। গনিকাদের নাম এখানে ছবি নীলা, বাণী। আবার একই নারীর নাম এখানে পাল্টে যায় অন্যের নামে। যেমন ছবি হয়ে যায় নীলা, নীলা হয়ে যায় বাণী, বাণী হয়ে যায় ছবি-এ রকম।

লেখকের মতে, একই নারীর নানা নাম, নানা রূপ। যৌনতাকে একটি উপকরণ ও পন্য হিসাবেই যেন গণ্য করতে চান লেখক। আবার উন্মার্গগামী যুবকদের দেবতা নামে অভিহিত করে দেবতাদের হীন করা বা ব্যঙ্গ করাও লেখকের উদ্দেশ্য।

বাসুদেবের'আনন্দবাজার, গোয়েন্দা আর্তনাদ - রিপ - রিপ' একটি রাজনৈতিক গল্প। টুকরো টুকরো বক্তব্য, বর্ণনা, শ্লোগান, ছড়া, কবিতা, গান, রিপোর্টিং জবানবন্দী, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি জুড়ে কোলাজের ভঙ্গীতে গল্পটি রচিত। কেউ কেউ বলেছেন যে মৃনাল সেনের কলকাতা ৭১ সিনেমার সঙ্গে গল্পটির সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের আলোচ্য গল্পগুলির সঙ্গে এটির সুর ও স্বর এক নয়।

এক বছর পরে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত'ডং ওয়াং এর গোপন 'সংকেত' গল্পে ও রাজনীতির কথা আছে। সত্তর দশকের পশ্চিমবঙ্গের অতি-বাম রাজনীতির প্রতিফলন ঘটেছে এখানে। 'দেবতাদের কয়েক মিনিট 'গল্পে কতিপয় যুবকের যৌন বিক্ষোভ বিবৃত হয়েছিল; এ গল্পে রাষ্ট্র ও সমাজের সার্বিক নৈরাজ্যকে বাসুদেব চিহ্নিত করেছেন। ডং ওয়াং একজন ডিক্টেটর যার হাত থেকে কারুরই নিস্তার নেই। সৌন্দর্য, ঐতিহ্য, প্রেম, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনায়ক রাজনীতি সব কিছুই যেন সন্ত্রাসবাদী। যারা গল্পে সন্ত্রাসের আবহাওয়া সর্বাঙ্গীন এক নায়কতান্ত্রিকতার কবল থেকে মানব সমাজের বার হয়ে আসবার যে আর কোনো পথ নেই - লেখক সে কথাই এখানে বলেছেন। মানব সমাজের ধ্বংশাত্বক পরিণামগামিতাও এখানে সাংকেতিত । বাসুদেবের বাবা গল্পটি একদিক থেকে 'রিপুতাড়িত' গল্পের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। যেহেতু বাবা চরিত্রটিও 'রিপুতাড়িত' গল্পের নায়কে মতই যৌনতা অর্জন করতে প্রতিবন্ধকতা পাচ্ছেন। কারণ এ গল্পের নায়ক পরিতোষ ও তার স্ত্রীর মাঝখানে আড়াই বছরের ছেলে পাবলোর উপস্থিতি রয়েছে। স্ত্রী সহবাসের অভাবে পরিতোষের দুর্দশা নিয়ে যেমন ঠাট্টা রয়েছে, তেমনই দুর্ঘটনার পড়েও পাবলোর পুরুষাঙ্গ চোট না পাওয়ার তির্যকতায় গল্পকারের উদ্দ্যেশতমূলকতা স্পষ্ট হয়েছে । যে যৌনতাকে নিয়ে হাংরিরা তাঁদের ইস্তাহার কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ - সর্বত্র উচ্চকিত। তাকে এ গল্পের ফোকাস পয়েন্ট করা হয়েছে। তাছাড়া মা - মাসিমাদের দৈনন্দিন সাংসারিক আক্ষেপ শুনে পরিতোষের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য,-

> এই সব ভদ্রলোকের ভাষা, কাঁচা খিস্তি নয় - যা কিনা আসলে এক ভন্ডামীর ভাষা। শুনতে শুনতে পরিতোষের আবার বেশ্যাদের কথা মনে পড়ে যায়।

যৌন আকর্ষণ ছাড়াও আর কি যেন তাদের - কি যেন ? হ্যাঁ, ভালো সাজার কোনো চেষ্টা বেশ্যাদের নেই। ১১

ভাষা সম্পর্কে পরিতোষের এই ধারণা মলয় ও শৈলেশ্বরের মতাদর্শেরই সমার্থক ।

এরপর দশ বছর বাসুদেব কোনো গল্প রচনা করেন নি। ১৯৮৬ সালে 'বিজ্ঞাপন পর্ব' পত্রিকায় 'মৃত্যুগুহা থেকে প্রথম কিস্তি'গল্প দিয়ে নতুন করে,নতুন ভাবনায় গল্প লেখার জগতে ফিরে এসেছেন। রাজনৈতিক চেতনাকে অর্থাৎ বামপন্থী রাজনৈতিক দর্শনের আলোয় জগৎ ও জীবনকে পর্যালোচনা করেছেন বাসুদেব। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার,অবক্ষয় ও বিপদ সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করেছেন। এই গল্পগুলির নাম ও প্রকাশ কাল আমরা এ আলোচনার শুরুতেই করেছি। কিন্তু গল্পগুলির আলোচনা জরুরী মনে করিনা এই জন্য যে, হাংরি আন্দোলন ও ভাবনার সঙ্গে এদের তেমন কোনো সংযোগ নেই।

বাসুদেব দাশগুপ্তের উপন্যাস 'খেলাধুলা' সর্ম্পকেও একই কথা বলতে হয়। তবু লেখাটি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। কারণ হাংরি লেখকদের আর কোনো উপন্যাস নেই। আসলে - হাংরি লেখকদের বিজ্ঞাপিত উপন্যাস বলতে বাসুদেব দাশগুপ্তের 'খেলাধুলা'-কেই বোঝায়। বিজ্ঞাপিত বলছি এ কারণে যে, উপন্যাস নামে ছাপানো হলেও এটির মধ্যে উপন্যাসের গুণ কম। অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দন্দশূক' পত্রিকায় ১০২ পৃষ্ঠার এই লেখাটি বেরোয় সেপ্টেমবর ১৯৮৯ সালে। এখানে মূল চরিত্র পরিতোষ। তাকে বাসুদেবের গল্পে আমরা আগেই দেখেছি। তার স্ত্রী পদ্ম, পুত্র পাবলো। একটি কন্যাও আছে। এছাড়াও পার্শ্বচরিত্র আছে অনেক। যথা বিমল, নিবারনবাবু, কমল, বিপুল, প্রিয়ব্রত, শরদিন্দুবাবু, বাদল, প্রকাশ, লালমোহন বাবু ইত্যাদি। এরা সবাই টাইপ চরিত্র। এমনকি পরিতোষও। বিভিন্ন মত, গোষ্ঠীর এরা বাহক। অধিকাংশই ইস্কুল শিক্ষক। চরিত্রগুলির মধ্যে সম্পর্কের গ্রন্থিবন্ধন নেই। চরিত্রগুলির কারুর মধ্যেই কোনো সজীবতা চোখে পড়েনা। এখানে কোনো কাহিনীও নেই। কারুর জীবনেই এমন কোনো ঘটেনা যা নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ দিতে পারে। আসলে চরিত্রগুলো গৌন। তাদের কোনো জীবন গৌরব নেই। পরিতোষ এই লেখায় সূত্রধারের ভূমিকায়। সময়ের সুত্রধার বা সময়ের একজন কথক। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে পশ্চিমবঙ্গের আর্থ সামাজিক জীবনে যে একটা গড্ডল-প্রবাহ, ধান্দাবাজী ও তত্ত্বের মোড়কে কায়েমী স্বার্থের খেলা চলছে .

তারই একটি স্পষ্ট ছবি আঁকা হয়েছে। সময়ই এ উপন্যাসের চরিত্র। সময়ের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা এই লেখাটির উপজীব্য। মধ্যবিত্ত পরিতোষ কিছুটা সামাজিক দায় থেকে বামপন্থী হবার চেষ্টা করেছিলেন। তার গনসঙ্গীতের দল গড়া রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ, রাজনৈতিক কলাম লেখা, শ্রমিক ও নিঃস্ব মজুর ও বস্তিবাসীদের নিয়ে গবেষণা ও তাদের সঙ্গে একজন হওয়ার চেষ্টা কোনোটাই সার্থকতা পায় নি। কারন ক্ষমতাসীন কম্যুনিষ্ট পার্টি দুটি তাকে সহযোগিতা করেনি। তাকে প্রতিবিপ্লবী ও অতিবিপ্লবী ভেবেছে। কঠোর ও শীতল আচরণ দিয়ে সর্তক করে দিয়েছ তাকে। পরিতোষ নিজেও কোনো তাত্ত্বিক সমাধান দিতে পারেননি। সমাজতন্ত্রের ও গণতন্ত্রের যে সমন্বয় অবৈজ্ঞানিক, শুধু আমেরিকা নয়, রাশিয়াও যে আমাদের দেশের প্রগতির জন্য অর্থহীন এটা পরিতোষ বুঝেছেন। কংগ্রেস ও সি পি এম যে একই পয়সার দুই পিঠ, বামফ্রন্ট যে মার্কসবাদের মুখোশ রিলিফ দেবার পার্টি এ সব বিতর্ক এখানে প্রবল ভাবেই আছে। আমলাতন্ত্র, পাতিবুর্জোয়া মধ্যবিত্তের কর্মবিমুখতা ও সুবিধাবাদ খেলাধূলার অন্যতম বিষয়। মধ্যবিত্ত পরিতোষও পশ্চিমবঙ্গের এই সামাজিক বাস্তবতায় শুধু পথ পায়নি বললে কম বলা হয়। হাল ছেড়ে দিয়েছেন। সেজন্যই হয়তো বা রচনাটি শেষ হয়েছে ফেলিনির লা স্ত্রাদা 'সিনেমার একটি দৃশ্যানুষঙ্গ দিয়ে। সেখানে সঙ্গী মেয়েটি বলে: We need more woods, the fire is dying. সেখানে নায়ক এ্যান্থনি কুইন মেয়েটিকে ফেলে পালিয়ে যায়। কারণ তার সম্বল কতটুকু ? রচনাটি শুরু করার আগে লেখক বলেছিলেন চিরন্তন গতিধর্ম সম্পন্ন বস্তুই যে সৃষ্টির প্রকৃত উৎস এটা বুদ্ধদেব বুঝেছিলেন। কিন্তু বস্তুর আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব থেকেই যে গতি ও পরিবর্তন আসে এ তত্ত্ব তিনি আজও উপলব্ধি করতে পারেননি। লেখকও এই আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব থেকে পরিণতির সেই কাঙ্খিত ইশারা দেননি। বলেছেন, সেই স্তরে আমরা এখনও পৌছতে পারিনি। এবং না পারার সেই ট্রাপিজিই খেলাধূলার তত্ত্ব-বিশ্ব। বাসুদেবের নিজের ভাষায়,-

> কিন্তু বিরোধ ও সংঘাতের প্রতিটি স্তরকে বুঝে, তার সমাধান করে করে, ঐক্য ও সমন্বয়ের পথে এগোতে না পারা পর্যন্ত মূলপ্রবাহের সঙ্গে নিজকে যুক্ত করা সম্ভব নয়। ততদিন আমাদের কেবলই মান-অভিমান, হাসিখেলা আর... । অর্থাৎ খেলাধুলা ১২

বস্তুত বাসুদেবের 'খেলাধুলা' নামক রচনাটিতে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন নয়, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বিভ্রান্তির একটি রেখাঙ্কণ মাত্র। লক্ষণীয় যে, সি.পি.এম., সি. পি. আই নকশাল সমস্ত মার্কসবাদী দলগুলির অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ, দুরাচার ও ব্যর্থতাকে খুব সংক্ষেপে লেখক এখানে বিশ্লেষণ করেছেন। তবে লেখকের পক্ষপাত যে শ্রেণী সংগ্রামের দিকেই তা স্পষ্ট। উপস্থাপনার দিক থেকে খেলাধূলা ব্যক্তিগত দিন লিপির মতো। আত্মজীবনীর মতো। কাহিনী নেই - পরিতোষের সঙ্গে তার পরিবার ও পরিপার্শ্বের মানুষজনের সম্পর্কের ছবি আছে কিছু। এই সম্পর্কগুলো খুবই সমতল স্বভাবের। কোনো দ্বন্দ বা সংঘাত নেই। প্রটাগনিষ্ট পরিতোষের মধ্যে যে প্রতিবাদী কণ্ঠ, কখনও বা মেনে নেওয়া, কিংবা ছেড়ে দেওয়া - সব কিছুর মধ্যে একটা অসম্পৃক্তি, উদাসীনতাও আছে । তবু যে পরিতোষ সব কিছু তে জড়িয়ে পড়েন তার কারণ জীবন সম্পর্কে তাঁর মায়া, আগ্রহ, কৌতূহল । জীবনটা যেন পরিতোষের কাছে একটা খেলাধূলা।

এই রচনাটির একটি অন্য গুরুত্ব আছে। বাসুদেব দাশগুপ্তের প্রৌঢ় জীবনের সঙ্গে পরিতোষের জীবনচর্যার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এখানে যে মফঃস্বল অঞ্চলটির প্রকৃতি ও মানুষজন-তার সঙ্গে বাসুদেবের বাসস্থান অশোকনগরের কোনো পার্থক্য নেই । পরিতোষের পেশা, চলাফেরা, কথাবার্তা সবই যেন ব্যক্তি বাসুদেবের জীবন থেকেই তুলে নেওয়া । বাসুদেব দাশগুপ্তের জীবনের একটি বিশেষ পর্বের ইতিহাস ও মানসিকতা জানতে 'খেলাধূলা' অপরিহার্য । হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সঙ্গে এইখানে 'খেলাধূলা'র পরোক্ষ সম্পর্ক ।

খ . সুভাষ ঘোষ

হাংরি গদ্যকারদের মধ্যে সুভাষ ঘোষ অন্যতম। তাঁর জন্ম বাংলাদের বগুড়া জেলায়। পঞ্চাশের দশকে তিনি এদেশে চলে আসেন। ষাটের দশকে শৈলেশ্বর ঘোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। টালা ট্যাঙ্ক এলাকায় ১৬বি শ্যামচরন মুখার্জী স্ট্রীটে একই ঘরে শৈলেশ্বরের সঙ্গে তিনি ভাড়া থাকতেন। সেখানে থেকেই তাঁর লেখালেখির শুরু। গ্রেপ্তার হন সেখানে থেকেই পরবর্তী কালে সুভাষের উদ্বাস্তু জীবনের অবসান ঘটে। কলেজ অব সেরামিক টেকনোলজিতে লাইব্রেরিয়ান হিসাবে কাজ পান।

সেখানে কেমিষ্ট এর চাকুরি করেন। তাঁর স্ত্রী কনক ঘোষও সাহিত্যচর্চা করেছেন। নব্বই-এর দশকে সুভাষ ঘোষের মৃত্যু হয়। সুভাষ আমার তৃতীয় ফ্রন্ট (১৯৬৭), অ্যামবুশ (১৯৮৩) নেশাকলোনী (১৯৮৭), গোপলের নয়নতারা (১৯৯৩), শীর্ষ অভিযান (১৯৯৭) প্রভৃতি।

সুভাষ ঘোষের প্রথম গল্প গ্রন্থ 'আমার চাবি' ১৯৬৫ সালে ক্ষুধার্ত প্রকাশনী থেকে বার হয়। এর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৩তে প্রকাশ করেন দন্দশূক প্রকাশনী। এই গ্রন্থে মোট ছটি গল্প অন্তর্ভুক্ত। যথা, হাঁসেদের প্রতি, খালাসী টোলার ৩ নম্বর, নৈশ টেলিগ্রাম, ব্যান্ড ডায়েরির পাতা, রেড রোড এবং ২৯ ধারা ও আমার রক্তের পরিণতি। সুভাষ ঘোষের নিঃসঙ্গতা এই প্রথম গ্রন্থেই ধরা পড়ে। তাঁর গল্পের মধ্যে কোনো কাহিনী থাকে না। অনেক সময় থাকে না চরিত্র। তিনি শুধুই বক্তব্য প্রধান। এ বক্তব্যও আবার বিবরণধর্মী নয়। ইঙ্গিত প্রধান। সমগ্র গল্পটিজুড়ে একটি ইঙ্গিতকেই বিস্তৃত করেন সুভাষ তাঁর ছন্নছাড়া বাক্যে। কিন্তু বাক্যগুলি দিয়ে চিত্রের একটি পরম্পরা তিনি তুলে ধরেন বলে লেখকের জীবন সম্পর্কে একটা ধারণার প্রতিভাস পাঠক চিত্তে আদল পায়। ছোটগল্প তো জীবনের কিংবা আরও নির্দিষ্ট করে বললে একটি প্রতীতির প্রতিচ্ছবি ছাড়া কিছু নয়। এভাবে ভাবলেই সুভাষের লেখাগুলো গল্প। কাহিনী বা ঘটনারসের দিক থেকে নয়। না হলে এগুলিকে কবিতা ও ইস্তাহারের মিশ্রণই বলতে হতো। যাই হোক, তাঁর প্রথম গল্প 'হাঁসেদের প্রতি'তে একটিই চিত্রপট লক্ষণীয়। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে লেখক কলকাতার রাস্তার বার হয়েছেন। কী দেখেন ? -না, চারিদিকে থৈ থৈ করা হাঁস। হাঁসেদের পাখা, পালক, পালকের সাদা বিস্তারে রাস্তাঘাট, ফুটপাত, গাড়ি বা রান্দা, ট্রামলাইন ছেয়ে যায়। ঠাসাঠাসি ও গাদাগাদি হয়ে হাঁস গুলি পদ্ম খায়, ছেঁড়ে; ছেঁড়ে ও খায় তারা পরস্পরের গায়েও ছুঁড়ে মারে সেই সব ফুল। এর পরে লেখক নীল শিশি বার করে প্রতিটি হাঁসের গায়ে ফ্লুইড ছিটিয়ে দেন। হাঁসগুলি শুধু বশ নয়, সম্মোহিত হয়। তাদের পুরো নিয়ন্ত্রণ এসে যায় লেখকের হাতে। তাদের যথেচ্ছ মাতাল করার পরে লেখকের কেবলই মনে হতে থাকে কত উপায়ে কত বেশি সংখ্যক উপায়ে তাদের থেকে কত ডিম, কত বেশি সংখ্যক ডিম পদ্মদীঘি থেকে টেনে বার করে দেবেন। সমগ্র গল্পে এই যে উদ্ভট একটি ছবি লেখক এঁকেছেন তার মধ্যে অনেক বিমূর্ততা সত্ত্বেও বলা যায় যে, এখানে সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ নয়, উপযোগিতার বাস্তবতাই গ্রাহ্য হয়েছে। সৌন্দর্যের প্রতি নিস্পৃহতা এমক কি কঠোরতা প্রদর্শিত হয়েছে। প্রতীকার্থে ঐ হাঁসগুলিকে সুন্দরী নারীরূপেও ভাবা যেতে পারে। তাদের জলকেলি নাগরিক যৌনতার নির্বিকার উদ্দামতার অর্থবোধক। সুভাষের দৃষ্টিভঙ্গী এখানে সিনিক।

দ্বিতীয় গল্প 'খালাসী টোলার ৩ নম্বর'-এ এক অসুস্থ ও অস্থির যুবকের মনোলোক প্রতিবিম্বিত হয়েছে। খালাসী টোলার ৩ নম্বর হচ্ছে একটা বিশেষ বাংলা মদের বোতল। সেটি যুবকটি বাড়িতে এনে রেখেছে। বাড়িতে সে একা। কোনও ব্যাপারে মন বসাতে পারছে না। প্রথমে সে 'নাইট মেয়ার' নামে তাসের একটি বিশেষ খেলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে চেষ্টা করে খবরের কাগজ পড়তে পারে না। এর পরে সেই ৩ নম্বর বোতল নিট পান করে। তারপরে উন্মত্ত হয়ে ওঠে সে চেহারায় এবং চেতনায়। সেই মাতাল উন্মত্ত তরুণেরই চেতনার বিস্তার এই গল্পে। এই চেতনা আসলে ভয়ের চেতনা। ঐতিহ্যের প্রতি ভয়। ইতিহাসের প্রতি ভয়, রাষ্ট্রকে ভয়, আইনকে ভয়। নিরাপত্তাহীনতাবোধের আতঙ্ক এবং ভয় মৃত্যুর। গল্পের শেষে যুবকটি বহু সংখ্যক দলবদ্ধ শকুনকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখেছে। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। শকুনের অবাধ দৈর্ঘ্য গলা বিস্তার করে তার মাথা মুখ হাত পা গলা পাকড়ে ধরে। সে সাদা পিরিচ থেকে খসে পড়ে।

তৃতীয় গল্প 'নৈশটেলিগ্রাম '- এ নিজেই যেন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া। সব অপারগতার শেষে মৃত্যু একমাত্র পরিণতি। গল্পের প্রথম অংশে দেখি এক যুবক কোথাও যেতে পারছে না। ট্রেন, ট্রাম, বাস কিছুই তাকে গন্তব্যে পৌছাতে সাহায্য করে না। অথচ তাকে নীরার কাছে পৌছাতে হবে। কিন্তু এত দেরী হয়ে যায় হয়তো নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করে নীরা চলেই যাবে। নির্দিষ্ট স্থান হল মনুমেন্টের পাদদেশ। সেখানে পৌছে যুবকটি নীরাকে খুঁজে পায় না। উপরন্তু সেখানে ব্যাজ পরা স্বেচ্ছাসেবকদের ভীড়। নীরাকে পাওয়া যায় না। গল্পের দ্বিতীয় অংশে ভীড়ের মাথায় একটি নীল রুমাল উড়তে দেখা যায়। তখন সেটিকেই ধরতে চায় যুবক। এতে এক সময় ভীড়ের চাপে সে পদদলিতও হয়। নীরাকে সে পায় নি। কিছু একটা পেতেই হবে; অন্তত একটা নীল রুমাল। কিন্তু হঠাৎ বিস্ফোরণ। জনতার হৈ হৈ , কলরোল মহিলা সমাবেশ হারিয়ে যায়। মাউন্ট পুলিশেরা চাবুক হতে ছুটে আসে। নীরা এই ডাক পিছনে রেখে সে ছুটতে থাকে। রাত বাড়ে, উপরে নীল তরল আকাশ। হঠাৎ যেন চাঁদ ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যায়। তার একটি অংশ নীচে নেমে আসতে থাকে। সে ধরতে যায়, পারে না। হাত বাড়ালেই উঠে যায় থালার মত চন্দ্রাংশ। সে লাফায়। চাঁদও লাফায়। হাত নামালে চাঁদও নেমে আসে। কখনওবা হাত পিছলে যায়। তার সঙ্গে দ্বৈরথ চলে। তারপর ইঁদারার গভীর কলো গর্ভে চাঁদ নেমে যায়। যুবকটিও হাত ইঁদারার দিকে বাড়িয়ে লাফিয়ে পড়ে। 'ব্যান্ড ডায়েরির পাতা' গল্পে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের জটিলতায় এক ব্যক্তি মানুষের নিপীড়নের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

রেশন কার্ডের জন্য ফুড ও সাপ্লাই অফিসে গল্পের মূল চরিত্রটি ঘুরে মরছে। নির্ধারিত সার্টিফিকেট ও কাগজ পত্র কিছুতেই সে যোগাড় করতে পারছে না। তার কৈফিয়ৎ ও যুক্তি কেউই শুনছে না। আবার দালালকেও সে টাকা দিয়েছে - যে তাকে নানা সার্টিফিকেট করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কিন্তু ঐ দালালের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে রাত বাড়ে। সেখানে দমকলের গাড়িও ঘুরে যায়। যদিও কোথাও আগুন লাগে নি। সম্ভবত কেউ মিথ্যে ফোন করেছিল। ঐ দালালটি অবশ্য আসে না আর। বরং একসময় Protected প্লেসে থাকার জন্যে যুবকটিকে হাতকড়া পরানো হয়। এই গল্পে রাষ্ট্রযন্ত্রের যান্ত্রিকতা, প্রশাসনিক অন্ধতার প্রতি বিদ্রূপ যেমন আছে, তেমনই ব্যক্তিসত্তার অসহায়তা ও আতঙ্কের ছবিও প্রস্ফুটিত। কাফকার গল্পের অনুষঙ্গ এখানে মনে এসে যায়।

'২৯ ধারা ও আমার রক্তের পরিণতি' গল্পটিও আধুনিক নগর সভ্যতায় একজন সামাজিক মানুষের কোণঠাসা হবার বৃত্তান্ত। গল্পের একমাত্র চরিত্রটি দক্ষিণ কলকাতার রাস্তাগুলোকে চিনতে চেষ্টা করেছে, বাস ট্রাম জানতে চেষ্টা করেছে। দক্ষিণের অঞ্চল, গ্রন্থাগার, মেরিন হাউস এমনকি আলোর রহস্য জানতে চেষ্টা করেছে যুবকটি। জানতে অবশ্য সে পারে না, বরং একদিন তার সম্পর্কেই নানান জ্ঞাতব্য জানতে চাওয়া হয়। এভাবেই নগর জড়িয়ে ফেলে তাকে। লেখকের প্রতীকী ভাষায় বলা যায়'চারপাশে ধক ধক করে তীক্ষ্ম লাল হানাদার আলো।' ১৩

'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট 'সুভাষের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'জেব্রা' পত্রিকার ২য় সংকলনে ১৩৭৮ সালে গল্পটি প্রথম প্রকাশ পায়। লেখক এটিকে ডায়েরি বলেছেন। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৬'র জানুয়ারী পর্যন্ত এটির সময়সীমা বিধৃত। গল্পটির আকারও বেশ বড়। একটিই চরিত্রই কথা বলেছে ১৬টি পরিচ্ছেদে। আত্মকথক পরিকল্পিতভাবেই একা। কোনো সংঘের অন্তর্ভুক্ত হতে নারাজ সে। নারী শরীরের প্রতি লোলুপতা, মাদকাসক্তি, লাম্পট্য সবই চরিত্রটির স্বাভাবিক বৃত্তি। তথাপি নানা ধরনের জিজ্ঞাসা তার মগজকে কুরে কুরে খায়। রাষ্ট্রে, সমাজে, সংসারে তার স্থান কোথায় তা সে খুঁজে পায় না। তাই শুধু ঘুরে বেড়ায় আর আতঙ্কে ভোগে, আতঙ্ক থেকে আক্রমণ করে। নতুবা যুবকটির এত আক্রমণাত্মক হবার কারণ নেই কোনো। কী যে সে চায় তা একেবারেই স্পষ্ট সে করতে পারে নি এত দীর্ঘ একটি ডায়েরিতে। সহজ ভাবে বলা যায়, একধরনের হীনম্মন্যতাবোধ থেকে চরিত্রটি সৃষ্ট।

এ ধরনের উদ্বাস্তু দারিদ্র্য থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজের চাকচিক্যকে না পাবার ঈর্ষায় তার এই অস্থিরতা। লেখকের ভাষায়,-

> কৃতকার্যতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজও ঠিক কালের মতই - ভয় ও বিঘ্ন, যারা মণ মণ ওজনের শেকল দিয়ে আমার পা কালও বেঁধেছিল আজও তারা একই রকম কাজে, কেন আমি ভালোবাসার দিকে গোঁ গোঁ করে এগিয়ে যেতে পারি না - কি সেই মধ্যবিত্ত থামপোষ্টগুলি করুণা, ইরা, অরুণা বা নীলার সঙ্গে - তাবৎ মানুষের সঙ্গে যখন নিজেকে জড়াতে যাই মৃত্যু হঠাৎ-ই ঝণাৎ বেজে ওঠে ঠিক মাঝখানে ... আজ একবার কখন যেন সেই পুরনো ভয় - যৌনরোগ, ক্যানসার - সিরোসিস ইত্যাদির ঘূর্ণির ভিতরে আমি। ১৪

আক্রমণাত্মক যুবকের যখন মৃত্যুভীতি জেগে ওঠে আক্রমণাত্মক তীব্রতা নষ্ট হয়ে যায়। আবার যখন যুবকটি বলে,-

> এখন যুদ্ধ, এখন জরুরী শুধুই জনগণমন ...। এখন কিছুদিন অষ্টারিটি পালন করুন, ব্যবহার সংযত করুন কিছুদিন আপনারা ১৫

তখন তাকে খুবই রাষ্ট্রসচেতন বলে ভ্রম হয়। প্রকৃতপক্ষে 'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট' গল্পে উদ্দেশ্যহীন এক যুবকের অস্থিরতা, অস্থিরতার বেদনা ও বিদ্রোহ নৈরাজ্যের আকারে প্রকাশ পেয়েছে। একারণে দীর্ঘ দিনাতিপাতের মত গদ্য ভাষাও এখানে দীর্ঘায়িত, পূর্ণ যতি চিহ্নহীন - শুধু কথার তোড় - যে তোড়ে শুধু বক্তব্যের ঘূর্ণি। উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপনের মতই কেবল উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা।

সুভাষ ঘোষের তৃতীয় গ্রন্থ 'অ্যামবুশ' গল্পের বই নয়। আক্রমণের একটি ইস্তাহার সংকলন। ৯টি ইস্তাহার আছে এখানে। প্রথম ইস্তাহারের নাম অভিযান।

যুদ্ধের জন্যে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। শ্রেণীমুক্ত সমাজের ডাক দেওয়া হয়েছে। বুর্জোয়াদের আক্রমণের জন্য আহ্বান করা হয়েছে। তালি লাগাও, ঈশ্বর পাটনী, ১ কোটি, ১০ কোটি টিবি ভিডি, বাবা নাম কেবলম, টেলিলিংক হারপুন, দ্য এ্যামবুশ ও লিফট এই আটটি ক্ষুদ্রাকার ইস্তাহারে ছন্নছাড়া লেখকের হালটি ফুটে উঠেছে। 'দ্য এ্যামবুশ' বাদে বাকি প্রত্যেকটি রচনায় এই বুর্জোয়া সভ্যতার নিন্দা করা হলেও, যৌনতার প্রতি লেখকের সঘৃণ টান লক্ষ করা যায়। 'দ্য এ্যামবুশ' গদ্যটিতে ভারতের চীনযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আমাদের দেশ প্রেম ইত্যাদির বিরোধিতা করা হয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শাস্ত্রবিরোধী গল্প আন্দোলন, মতি নন্দী প্রভৃতি ব্যক্তি ও বিষয়কে আক্রমণ করা হয়েছে। লেখক ঘোষণা করেছেন যে, বৈঠকী গল্পের দিন শেষ। এই গ্রন্থের গদ্যগুলি ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৮৩ সালের নানা সময়ে লেখা। লেখকের অস্থির মনের কিছু মুহূর্ত ও দৃষ্টিভঙ্গীর অব্যবস্থিত দৃশ্যায়ন ছাড়া অন্য গুরুত্ব নেই এগুলির। সুভাষের পরবর্তী বই 'নেশা কলোনী' ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। মোট তিনটি গদ্য এর অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটির নাম 'নেশা কলোনী'-১৯ পৃষ্ঠা জুড়ে বিস্তৃত। নেশা কলোনী একটি প্রতীক। যেখানে পৌঁছে গল্পের তরুণটি স্বাধীনতার স্বাদ পাবেন। এখন পর্যন্ত তরুণটি এক সম্পূর্ণ অধিকৃত মানুষ।১৬ক. সভ্যতার মলিক্যুলর সিস্টেমস ১৬খ. আখ্যানটির সূচনাংশে এই রকম একটি গঠনই চোখে পড়ে। কিন্তু আখ্যানের শেষে পৌঁছে দেখি তরুণটি কোথাও পৌঁছায় নি। কারন, মাতাল, পাগল, বা উদ্বাস্তুর প্রস্থান বা মহাপ্রস্থান নাই।১৬গ.

শুধু আছে নেশা ঘোরের পরিবর্তন :

> আসলে, এক মাতাল কখনই একই ছবি ও কথামালার কাছে কখনই ফিরে যায় না। এক পাগল একই ছবি ও কথামালার কাছে কখনই ফিরে যায় না। এক উদ্বাস্তু একই ছবি ও কথামালার কাছে কখনই ফিরে যায় না।১৭

সুতরাং শেষ পর্যন্ত কয়েকজন পাগল, মাতাল ও উদ্বাস্তুর নেশার ডেরা ছাড়া কিছু আর পাইনা আমরা। গল্পটি নেশাগ্রস্ততার একটি আখ্যান হয়ে ওঠে মাত্র। এই বইয়ের দ্বিতীয় রচনাটির নাম ব্যক্তিগত 'ম্যানিফেস্টো'।এখানে মধ্যবিত্ত মানুষকে সমালোচনা করা হয়েছে। এখানে মধ্যবিত্তকে লেখক বলেছেন ইতিহাসের প্রবাদপুরুষ।

সচ্ছল জীবনের প্রাচুর্য ও আয়েশে সুবিধাবাদী জীবন কাটাবার পরও মধ্যবিত্তের তৃষ্ণা কখনই মেটে না। একটার পর একটা অনিশ্চয়তাও তাকে তাড়া করে। তখন সে কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে। লেখকের কাছে মধ্যবিত্তটি যখন আশ্রয় চেয়েছে তখন তিনি হাত ছাড়িয়ে নিয়েছেন। চলে গেছেন নেশার খোঁজে। পরবর্তী দুটি অনু গদ্যে লেখক কোনো স্পষ্ট বক্তব্য রাখতে পারেন নি।

'গোপালের নয়নতারা'সুভাষ ঘোষের সবচেয়ে সুবোধ্য গ্রন্থ। ১৯৯৩ সালে এটি প্রকাশ পায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় এর গোপালকে একটি প্রতীক চরিত্র রূপে গ্রহন করে তাকে নবরূপে নির্মাণ করেছেন লেখক। গোপাল সুবোধ বালক। কম বয়সে যখন সে পরীক্ষার পড়া পড়ছে তখনই মায়ের মৃত্যু ঘটে। তারা অত্যন্ত দরিদ্র, আত্মীয় পরিজনহীন। পাড়ার ছেলেরাই চাঁদা তুলে তার মার শ্মশানক্রিয়া সম্পাদন করে, মদ্য পানও করে, গোপালের মুখেও ঢেলে দেয়। এরপর শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেলে গোপালের জীবনযুদ্ধ, বড় হওয়া শুরু হয়। কলকাতার ফুটপাত, ডক অঞ্চল, পুলিশ সবকিছুর সঙ্গেই সে পরিচিত হয়। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া নেই। সে কিছু বলে না। সে কিছু ভাবে না। সে কিছু বোঝে না। সে সুবোধ বালক, ভালো মানুষ। তাকে কিছু বলতে, করতে নেই, ভাবতে নেই। অবশ্য একদিন পুলিশ সন্দেহবশে তাকে হাতকড়া পড়ায় কয়েদী করে। গোপাল নির্বিবাদে তাও মেনে নেয়। একদিক থেকে গোপালের মধ্যে নির্বিরোধ সাধারণ মানুষের প্রতিচ্ছবি। তাদের অসহায়তার প্রতিচ্ছবি। পরিস্থিতিকে সাধারণ মানুষ কতটুকুই বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। গোপালও পারে নি। শুধু মেনে নিতে হয়। অথচ মানবিক অনুভুতিগুলি আর্ত হয়ে ওঠে। মাথা কুটে মরে। এই অনুভূতিরাজীর চিত্রমালা গ্রন্থটিতে আদ্যোপান্ত বিরাজিত। সুভাষের গল্পে যেমন আক্রমণের তীরগুলি থাকে এ গ্রন্থে তা নেই। প্রতিবাদের যে উচ্চকিত প্রবলতা থাকে, তা নেই। এখানে আছে অনুভূতি, বেদনা, মায়াচ্ছন্নতা। অথচ প্রতিবাদ তো আছে। এই আমাদের সমাজ, এই আমাদের সামাজিক বিধি ও আইনগুলির বিপরীতে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে আমাদের দৃষ্টি কাড়ে গোপাল, গোপালের অনুভূতি আর গোপালকে কেন্দ্র করে লেখকের বক্তব্য ব্যঞ্জনা।

> গোপাল হাঁটে - তার মাথার উপর সাদা মেঘ - কালো মেঘ ছায়া ফেলে, গোপাল হাঁটে তাহার মাথার উপর ফৌজ, ফৌজী বন্দুক ছায়া ফেলে, গোপাল হাঁটে তার মাথার উপর

নির্ভার অচিন পাখি ওড়াওড়ি করে - গোপালের ভেতর
আসে যায় - যায় আসে - এই কথা - কথা এই - পাখি
তুই অচিন পাখি - পাখি তুই বন্দী করিলি। ১৮

এই রচনায় সাধু ও চলিত ভাষার সমান্তরাল ব্যবহার লক্ষণীয়। বাস্তবতা ও কাব্যময়তার সহাবস্থান লক্ষণীয়। যাদব, ভুবন, মাধবের পাশাপাশি নাদু, পানু, গদাই, ভাঙ্গামূর্ত্তি, বিয়ের পদ্য চাদের (শ্রাদ্ধের) চিঠির পাশাপাশি,আকাশ প্রদীপ,প্রেতযোনি, ছায়াযোনি ইত্যাদি অনুষঙ্গগুলিকে চমৎকার ব্যবহার করতে পেরেছেন লেখক। 'গোপালের নয়নতারা,' সুভাষ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গদ্য গ্রন্থ। এটিকে নভেলেট বলা যায়।

সুভাষ ঘোষের সবচেয়ে দীর্ঘগদ্য 'শীর্ষ অভিযান।' এটিকে লেখক উপন্যাস বলেছেন। এর প্রথম অংশ ক্ষুধার্ত পত্রিকার দ্বিতীয় সংকলনে ১৯৭২-৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় অংশটি প্রকাশিত হয় 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকার তৃতীয় সংকলনে। সাধারণত উপন্যাস যেমন বিবৃতিধর্মিতায় (Narrative) বেড়ে ওঠে এ ক্ষেত্রে তা নেই। ১৯৯৭ সালে দুটি অংশ মিলিয়ে তিন ফর্মার এই উপন্যাসটি বই আকারে যখন বার হয় তখন লেখক এর একটি ভূমিকাও লেখেন। তাতে সুভাষ জানান, এখানে কাট আপ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে। কাট আপ পদ্ধতিটি সিনেমায় প্রযুক্ত হয়। দৃশ্য, অভিনয়, সংলাপ ও সংগীত দিয়ে সেখানে কাট আপের ফাঁকগুলো ভরে ওঠে। অর্থাৎ একাধিক শিল্প মাধ্যমের সমবায় হেতু দর্শক সেখানে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেন না। এমনকি নিউ ওয়েভ চলচ্চিত্র সম্পর্কেও একথা বলা যায়। কিন্তু উপন্যাসে তা ঘটে না বলে এবং এ উপন্যাসেও ঘটেনি বলে পাঠকের কাছে ক্লান্তিকর ঠেকে। সুভাষ কখনও দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। কখনও সংলাপ, কখনও সওয়াল - জবাব, কখনও বা তত্ত্বের কচ কচি পাচ্ছি। ফলে 'শীর্ষে অভিযান' কোনোভাবেই দানা বাঁধে নি। ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। এক একটি অধ্যায়ের লেখক শীর্ষনাম দিয়েছেন।বেশিরভাগ নামই খুব চটকদার। যথা, রেডিও কার্টুন, মহাভারত, স্বপ্নে টিভি চিত্র, মণিমেলা, লেটারবাক্স স্বীকারোক্তি জলহাওয়ার দুঃখ, নির্বাসিতের শোক, বেগম বাহার লেন, কুকুরের জন্য ইজের, অভিযান ইত্যাদি। উপন্যাসের শুরুতেই রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ এসেছে,জনতাকে নির্বীর্য ও নিরস্ত্র করতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে সরকারী অস্ত্রের।

নইলে দমন, পীড়ণ চলবে। মহাভারতের অনুষঙ্গ এনে ইন্দ্রের মুখ দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে আমানবিক হবার প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে, মানবিকতার নানান দিকগুলো উপন্যাসে বাড়ি, সংসার, অর্থ, ভোগ্যপণ্য, যৌনতা, প্রতিবাদ, রিরংসা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রধান করে তুলে ধরা হয়েছে। প্রটাগনিষ্ট জানিয়েছে,-

"ক্ষমতায় আমার লোভ ছিল -
বহু আত্মা ক্রয় বিলাস ছিল
ওজনে আকাঙ্ক্ষা ছিল
সিংহাসন উপাস্য ছিল
আ মেন্ ! ..... ইনশাল্লা ! .....
হাঁটি, হেঁটে যাই" - ।[১৯] এই অগ্রগমণ দিনযাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানি নয়, একটি বিপ্লবী প্রক্রিয়া। "আমি'র বিস্ফোরণ আমি, আমিই সেই কারণ, আমারই চাপে প্রেসারে বেরিকেড, বেরিয়ার ছিঁড়ে গেল, স্বাগতম; স্বাগতম হু হু ছুটে আসছে হাত পতাকা নেড়ে অঙ্গাত বাসের বন্ধুরা।"[২০]

অর্থাৎ অভিযান একক নয়, সম্মিলিত। আবার অভিযান শুধু বাইরের নয়, ভিতরেরও। ভিতরের সংস্কার ও অভ্যাস, বিশ্বাস, প্রথাগত ধ্যাণ ধারণাগুলিকে নষ্ট করে জেগে ওঠার ব্যাপারও আছে। লেখক এখানে আবার বঙ্গদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়কদেরও প্রয়োগ করেছেন। ইতিহাস ও বিষয়ের সম্পর্ক বা তারতম্য মানেন নি। তাই বিনয় - বাদল - দীনেশও এখানে এষ্ঠ পড়েছেন। তাঁদের, বীর শহীদের ঐতিহাসিক ইমেজকে সুভাষ এখানে ধ্বংশ করেছেন :-

> কেন্দ্রীয় তাঁবুর কাছাকাছি ফ্লাডেট লাইটের ভেতর আবিষ্কার করি নিজেকে, কখনও- দেখি বিনয় সেখানে অলরেডি এসে পড়েছে। সে দীঘির পাড়ে শাল মহুয়ার ভিতর চাঁদের মুখে ইপসিত মধু খুঁজে পায়নি - ওইখানে বাদল ক্রমাগত বোঝাচ্ছে কাউকে, টাওয়ারের মাথা কোনো নিরাপদ জায়গা নয়, দীনেশ তাঁবুর সামনে অনবরত বকে যাচ্ছে - আসলে নেশার দ্বারাই আত্মা চালিত হয় শেষ পর্যন্ত ... ২১ ইত্যাদি।

এ উপন্যাসে সাধারণ মানুষের নিপীড়নের ছবি আছে। এই নিপীড়ন সামাজিকতার, নৈতিকতার, অর্থনীতির, শাসনব্যবস্থার, বিচার ব্যবস্থার অবদমনের এমনকি প্রবৃত্তিরও। লেখক নিপীরনকে ঠাট্টা করেছেন, আঘাত করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন। সবরকমের শ্রেনীচেতনা, ও নীতিচেতনা কে ধ্বংস করে মুক্তির কথা বলেছেন। যে মুক্তি হবে মনের, শরীরের, সংস্কারের - সব কিছুর। কিন্তু কিভাবে এই মুক্তি ঘটবে তার কোন দার্শনিক ভীত্তিভুমি নেই। উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠায় রাজার নির্দেশ ছিল - জনতার বীর্য ও অস্ত্র কেড়ে নাও - নিবীজ ও নিরস্ত্রীকরণের পর সরকারী অস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করো। কিন্তু উপন্যাসের শেষে পৌঁছেও দেখি বিনয়- দিনেশ, অনুপমদের অভিযান অব্যাহত। শতরকমের নিপীড়নের চললেও জীবনের গতিকে এখানে রুদ্ধ করা যায় নি। আবার যে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদী তার মধ্যেও মাঝে মাঝে ভর করে অত্যাচারী। তাই উপনাসের প্রধান কথক বলেন, -

> আমারই অমোঘ টোকায় সন্তান পিতার জন্য খিল খুলে বেরিয়ে আসতো, কিন্তু সন্তানকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। বাবা ছেলের ডাকে বেরিয়ে নিজে কোথায় নিখোঁজ হত - মেয়ে মায়ের ডাকে বেরিয়ে কোথায় লোপাট হয়ে যেত - আমারই ভোজবাজিতে ভাই ভাইয়ের জন্য হাত বাড়িয়েও ভাইয়ের সহিত মিলিত হতে পারত না, বন্ধু বন্ধুর সহিত।২২

কিংবা

> এক ধাক্কায় ফেলে দেয় মাথা থেকে স্বস্তিকা ক্যাপ - ঝটিতে মস্তিষ্কের তার সংযোগ ছিন্ন করে খুলে নেয় নখ, আঙুল থেকে - কোটর থেকে আমার দুই চোখে উপড়ে নেয়।২৩ ইত্যাদি।

এসবের কারণ যে পরিপার্শ্বের চাপ, প্রচলিত সিষ্টেম, সিষ্টেমের নানা লোভ ও দুর্নীতি তা বহু ভাবে লেখক এখানে বলেছেন,-

> সব কিছু সহজভাবে নিন।তাইতো চেষ্টা করি, কিন্তু ফাঁসির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ঝুলন্ত ফাঁসটির দিকে তাকিয়ে জগৎ সংসারকে খুবই সহজভাবে নেয়ার কথা চিন্তা করা যায় ?২৪

অথবা

> 'অত্যাচারী শ্বেতকায়, অশ্বেতকায়। ঠোঁট ফাঁক করলেই অত্যাচার। আমাদের মধ্যে অনেকেই আত্মহত্যা করেছে। প্রায় প্রত্যেকই অন্তঃসত্ত্বা। সন্তান জন্মাবার আগেই মারা গিয়েছে কয়েকজন। জন্ম দিয়েই কেউ কেউ। আমিও অন্তঃসত্ত্বা, কিন্তু কী প্রসব করব আমি ?২৫

গ . সুবিমল বসাক

সুবিমল বসাকের প্রথম গল্পের বই 'অযথা খিটক্যাল' ।'এবং' পত্রিকা থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। যদিও অধিকাংশ গল্প ১৯৬৪ - ৬৫ সালে প্রকাশ পেয়েছিল হাংরি জেনারেশন, জেব্রা, প্রতিদ্বন্দ্বী, উন্মার্গ, গল্প কবিতা প্রভৃতি পত্র পত্রিকায়। এখানে মোট ১০টি গল্প সন্নিবেশিত। যথা, পরস্তাব, গিদরামি, জাবড়া, আপটামি, খতিয়ান, আপিলা চাপিলা, অযথা খিটক্যাল, ছুঁচুমুচু ইচার অঙ্গুটে, ভোগলামি। নামেই ১০টি গল্প। কিন্তু মূলত একটি চরিত্রের প্রেমকাতর মানসিক অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তের বর্ণনা। যৌবনের কামনায় যে অস্থিরতা ও নারীসঙ্গলিপ্সা তা গল্পের নায়ক চারুময় সহ্য করতে পারছেনা। অস্থির হয়ে উঠছে। তার প্রেমিকার নাম কৃষ্ণা। দু-জনেই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ। এটা ছাড়া তাদের আর বিশেষ কোনো পরিচয় জানা যায় না। প্রেম ছাড়া, স্পষ্ট করে বললে কামনা ছাড়া চারুময়ের দিবারাত্র আর কোনো ভাবনা নেই। সে দিক থেকে তাকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত চলা যায়। সুবিমল চরিত্র চিত্রনের কোনো ধার ধারেন নি। শুধু মানসিক বাসনাকাতরতার বর্ণনায় কোনো চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা যায় না। অন্যভাবে বলা যায়, শুধু প্রেমের ধারণায় যদি চরিত্র দুটিকে দেখি তাহলেও এই গল্পগুলিতে কোনো অভিনবত্ব নেই। এরই মধ্যে নাম গল্প 'অযথা খিটক্যাল' কিছুটা উত্তীর্ন হয়েছে। পরিস্থিতি রচনার মধ্যে কিছুটা কৌতুক সঞ্চারিত হয়েছে। ফলে কৃষ্ণাকে নিয়ে চারুময় কিছুক্ষণের জন্যে নিভৃতি খুঁজছে। নিজের মেসে, বন্ধুর বাড়িতে, হোটেলে, রিকসাওয়ালার বস্তিতে, প্রতিটি স্থানেই সেই নিভৃতি পেতে গিয়ে নানা উটকো ঝামেলায় তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়। শেষে দুজনে চলে যায় ময়দানের ফাঁকা জায়গায়। ঘাসের উপর শুয়ে পড়ে দুজনে। সেখানেও অন্য আগন্তুক- হতে পারে ছিনতাইবাজ বা পুলিশ। সুতরাং দুজনে দৌড় লাগায়। স্টেশনে এসে পৌছায়।

কৃষ্ণার মুখ থমথমে। ষ্টেশনে পিল পিল করছে লোক। ট্রেনে চড়ে ফিরে আসে দুজনে। কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাড়ি তাদের। দুজনে ভিন্ন পথে বাড়ি ফিরে যায়। চারুময় জানে না কত রাতে তাকে একা একা বাড়ি ফিরতে হবে। এই গল্পে নায়ক নায়িকার কামনার অচরিতার্থতার জন্য সম্পূর্ন মেহনতকেই মনে হয়েছে অযথা খিটক্যাল বা অনর্থক জটিলতা। আধুনিক নগর জীবনে মানুষের এমনিতেই প্রাইভেসি নেই, তাই প্রেমিক প্রেমিকাদের আরও অসুবিধা। কিন্তু বাস্তবতার জন্যেই গল্পটির সমস্যা বা কৌতুক যথেষ্ট আকর্ষণীয়। এই গ্রন্থের'ভোগলামি'গল্পে অবৈধ প্রেমের কাহিনী পাই। পুরনো বান্ধবী রাণীর বিবাহ হয়ে গেছে। রাণী চারুময়কে প্রলুব্ধ করে। চারু বোঝে রাণী তাকে মুছে দিল, এবার সে স্বামী নরেনের সঙ্গে একাত্মা হয়ে থাকবে। চারুও নিজেকে অনুতপ্ত মনে করে না। তবু এ গল্পে মধ্যবিত্ত নীতি বোধের কাঁটা যেন কোথাও খচ খচ করে।

'গেরিলা আক্রোশ' সুবিমল বসাকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রকাশ কাল দেওয়া নেই। তবে গল্পগুলির প্রকাশ কাল দেওয়া আছে। প্রথম গল্প 'গেরিলা আক্রোশ' 'জেব্রা' ১ সংকলনে ১৯৬৫ সালে প্রকাশ পায়। এ গল্পে সুভাষ ঘোষের প্রভাব খুব স্পষ্ট। তবে একজন আধুনিক তরুণের সত্তার অস্থির যন্ত্রণা কে নিপাট তুলে ধরা হয়েছে। তরুণটি ডায়েরি পঠন শেষ করতে পারছে না। নিজের ডায়েরি মানে তো সে নিজেই অনেকটা। নিজেকে কী করেই বা ঐ টুকু যৌবনে সে বুঝতে পারবে ? তরুণটি বলে,-

> আমার মাথার চুল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। অথবা চুল ভর্ত্তি মাথার খুলি থেকে কপাল থেকে হাড়ের পাত বেরিয়ে পড়তে চায়। শরীর থেকে হাত পা কান মুন্ডু চোখ চিঠি জঙ্ঘাস্থি পেলভিস আলাদা আলাদা ভাবে বেরিয়ে বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো হয়ে সরে পড়তে চায়।২৬

সুতরাং ডায়েরি আর পড়া হয় না। এবার সে বেতার যন্ত্রের দিকে যায়। বেতার যন্ত্রটিও ডায়েরির মতো। বেতার যন্ত্রও অস্থির। সেখান থেকেও হাজার তথ্য ও শব্দ সংকেত আসতে থাকে। পরম্পরা হীন সেই বাক্যরাজীর মধ্যে দেখি হাংরি কবি লেখকদের বক্তব্যই গল গল করে বেরুতে থাকে। তরুণটিও বেতার যন্ত্রের কাঁটা নিজের ইচ্ছেমতো নানা দিকে ঘোরাতে শুরু করে।

একসময় বেতারযন্ত্র থেমে পড়ে। বাতি নিভে যায়। বহু চেষ্টা করেও তরুণটি তাকে আর সচল করতে পারে না। তখন সে আবার চলে যায় ডায়েরির দিকে। আলমারির ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে ডায়েরি তুলে ধরলে তার রেক্সিনের লাল মলাট জ্বলতে থাকে। তবু ডায়েরি পড়ার আগ্রহ জন্মায় না। সে বেতার যন্ত্রের কাছে যায়। প্লেটের উপর চোখ পড়তেই মনে পড়ে আরো একটি বৎসরান্ত বৃদ্ধি পাবে। সে এবার ডায়েরির লাল মলাটের উপর মাথা রেখে ঘুমোতে চেষ্টা করে যতক্ষন না ঘুম আসে। এই গল্পে যে গেরিলাটির কথা বলা হয়েছে তা তরুণটির মধ্যে আছে, আছে বেতার যন্ত্রের মধ্যেও। আধুনিক মানুষ আর যান্ত্রিক জীবন গেরিলার বন্যতাকেই মান্যতা দেয়। সেখানে যন্ত্রেই একমাত্র নিঃস্তব্ধতার আশ্রয়।লক্ষ করার যে , সুবিমল গেরিলা আর গোরিলাকে এক করে ফেলেছেন ।

গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'আগ্রাসী অপকর্ম' 'প্রতিদ্বন্দ্বী' পত্রিকায় ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটির নাম আগ্রাসী অপকর্ম হলেও আগ্রাসী শব্দদূষণের অত্যাচারই এর বিষয় বলা যায়। লেখক অতিরিক্ত শব্দদূষণের শিকার। আসলে, শব্দের বাহুল্য, অংযম এবং যথাযথ শব্দের অপ্রতুলতাই লেখককে এখানে বিপন্ন করে তুলেছে। শব্দের রহস্যময়তাকে লেখক খুঁজে বেড়াচ্ছেন,পাচ্ছেন না। জীবনের রহস্যময়তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন লেখক, পাচ্ছেন না। একঘেঁয়ে বিবর্ণ জীবনকে তাঁর ভয়, আতঙ্কের থম থমে পরিবেশ সারা গল্প জুড়ে বিস্তৃত। একমাত্র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই জীবনের অসারতা ও ভীতিকে জয় করা সম্ভব। কেননা মৃত্যুই শব্দহীনতা।২৭

গ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'হাঁশাহুঁশহীন ছোবল'। ১৯৭০ সালে আবহ পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। এই গল্পের তরুণটি একটি বেডরুমে শুয়ে আছে। সে নিঃসঙ্গ, একের পর এক সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। তার চোখের সামনে কড়িকাঠ, সিলিং, কালো ছায়া, বালব, চুনের কালি, সিগারেট ধোঁয়া, রহস্যময় ঘর। চোখের পিছনে, স্মৃতিতে পুরনো লোদীপুরের বাড়ি, দুপুরের স্কুল ফিটন, প্রেমিকার চোখ, দীঘার সমুদ্র সৈকত। নিজের এই দুটি বাস্তবকে চরিত্রটি মেলাতে পারে না। বরং বর্তমানের শূন্য নিরাবলম্বতায় ভীত হয়ে পড়ে। সহসা বেড়াল দেখে ভাবনাগুলো যেন ছড়িয়ে পড়ে। বেড়ালই হয়ে ওঠে পিতার পূর্ণ প্রতিকৃতি - যদিও কিছুক্ষণ পরে তা আবার বেড়ালই হয়ে যায়। তখন সে তাকে ঘাড়ে চেপে ধরে, বেড়াল পালিয়ে যায়। সে জানালাটা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু দরজায় সুতো বাধা জিভ - এই রহস্যময় ঘরে।

দরজা বন্ধ করে দিলে ঐ জিভ দরজায় আঘাত করে বলে, আমি এসেছি দেয়াল প্রতিধ্বনিত করে, বাবা এসেছে। তার চিন্তাভাবনা বিমূঢ়তা লাভ করে। তবু সে ঘুমোতে চায়, ঘুমোতে চেষ্টা করে। আসলে আবদ্ধ ঘর থেকে চরিত্রটি বার হতে পারে না। বর্তমানের প্রতীক এই ঘর। সেখানে থেকে বেরুনো সহজ নয়। অতীত তো সেখানে আসবেই - ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। অনিশ্চয়তার আতঙ্কই গল্পটির মূল বীজ।

'অপ্রতিরোধ্য ভাইরাস'গল্পটি 'অধুনা সাহিত্য' পত্রিকায় ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ঘুমের ভিতর দুঃস্বপ্নেই বুঝিবা চেঁচিয়ে ওঠে তপন। ঘুম ভেঙ্গে যায়। অন্ধকারে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে সে। আশঙ্কা করে যে কোনো মুহূর্তে অরুণিমা তার শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তপন অরুনিণাকে ভালবাসে না। সে ভালবাসে প্রেমিকাকে। তার যৌবনের প্রেমিকা, স্বপ্নের নারী, প্রমীলার সঙ্গে তার বিয়ে হয় নি আর্থিক ও সম্প্রদায়গত হীনতার কারণে। এখন প্রমীলা যখন স্মৃতিবাহিত হয়ে তপণের কাছে আসে, তখন অরুণিমার উপস্থিতি যেন রয়ে হয়ে উঠে। প্রমীলা দেবী, অরুণিমা রাক্ষসী। তপনের কাছে প্রমীলার সঙ্গে নিজের ব্যর্থপ্রেম যেমন অপ্রতিরোধ্য ভাইরাস, তেমনই অরুণিমার সাহচর্যও অপ্রতিরোধ্য ভাইরাস। এটি চাওয়া ও পাওয়ার অসঙ্গতি ও অতৃপ্তির সঘৃণ উপাখ্যান। অরুণিমা কুশ্রীতার প্রতীক তপনের কাছে প্রার্থিতা নয় বলে, প্রমীলা সৌন্দর্যের প্রতীক তপনের কাছে কাম্যা বলে, এখানে লেখক সেই তথাকথিত 'Beauty and beast' র নক্শাই এঁকেছেন।

গ্রন্থের শেষ গল্প 'তেজস্ক্রিয় দুঃস্বপ্ন' 'গল্পকবিতা' পত্রিকায় ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বিশাল পৃথিবীতে গল্পের চরিত্রটি নিজেকে শুধু একা নয়, বিশ্বের একক প্রতিপক্ষ হিসেবেও দেখে। ফলে, তার যুদ্ধ বিশ্বের সঙ্গে কিভাবেই বা দাঁড়াবে ? তার যুদ্ধ নিজের সঙ্গেই রূপ পায়। সাঙ্কো পাঞ্জাও ছায়ার সঙ্গে একা লড়ছিল। সে ছিল যোদ্ধা। এ গল্পের নায়ক মেরুদন্ডহীন, অসুস্থ। তদুপরি যৌনকাতর। গোটা দুঃস্বপ্নটি চরিত্রটি ঘটিয়ে ফেলেছে একটি বাসের ভিতর। তার পাশে একটি স্বাস্থ্যবতী নারী বসে থাকাই এর কারণ। একটা সময় সে যখন দেখে তার শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে শ্বেতকুষ্ঠ তখন সে বিহ্বল হয়ে ওঠে। এই অংশে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজনের রক্তমাংস' গল্পের প্রভাব এসে পড়ে। তবে সন্দীপনের সর্বগ্রাসিতা সুবিমলে নেই। কেননা টার্মিনাসে বাসের হ্যাঁচকা টানে বস্তুজগতের জাগ্রত স্পষ্টতায় ফিরে আসে দুঃস্বপ্নের এই নায়ক।

'আত্মার শান্তি দু-মিনিট' গল্প গ্রন্থটি ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত। মোট পাঁচটি গল্প এবং একটি ইস্তাহার এখানে সংকলিত। এদের নাম যথাক্রমে - গেষ্টাপো অভিযান, গোপন আঁতাত, আত্মার শান্তি দুমিনিট, মাংস খাওয়া হলে, মেফিস্টোফিলিসের হাত এবং প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রথম গল্প, গেষ্টাপো অভিযান-এর নায়ক কীভাবে আমিত্বের অসুখ থেকে, ভালবাসার আকর্ষণে আরোগ্য পেল তাকেই ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। নায়কটি জীবনযুদ্ধে যখন ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন যৌনতা, যৌনতার স্মৃতি তাকে উজ্জীবিত করে। নায়িকা কেয়ার সঙ্গে তার আলাপ হয় বাসস্ট্যান্ডে। কেয়ার সঙ্গে প্রথমে তার শারীরিক সম্পর্ক ঘটে। কেয়া ক্রমে সঞ্চারিত হয় তার মনে। তার কর্মব্যস্ত জীবনের অনেকটা সময় সে নিয়ে নেয়। প্রথম দিকে কেয়াকে সে এতো সময় দিতে প্রস্তুত ছিল না। পরে কেয়ার কাছে, যৌনতার কাছে, ভালবাসার কাছে সে সর্বাংশে আত্মসমর্পণ করে। এ গল্প রুক্ষ্ম যুবকের প্রেমের কাছে আত্মসমর্পনের গল্প। তার ব্যাখ্যা এরকম,-

> ভালবাসতে বাসতে নিজেকে ধ্বংস করা ছাড়া অন্য কোন গতি পাইনা। নিজেকে ক্ষয় করা ছাড়া ভালবাসার অন্য কোনো স্বাভাবিকতা দেখা দেয় না।২৮

দ্বিতীয় গল্প 'গোপন আঁতাত'-এ নরনারীর গোপন দ্বিতীয় সর্ম্পকের রহস্য বিচার করেছেন সুবিমল। নায়ক অফিসের কর্মচারী। অবিবাহিত তরুণ। সে কারুর সঙ্গে সর্ম্পক বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। যে কোনো মুহূর্তে অন্যের ত্রুটি বিচ্যুতি, অসঙ্গতি, সৌন্দর্যের ব্যতয় তার প্রতি নায়ককে বীতস্পৃহ করে তোলে। ঐ বিরাগ সে প্রকাশিত করে চরম অভদ্রভাবে। এভাবেই সুচন্দ্রা, মণিকা, রমেন - সকলের সঙ্গে সে অস্বাভাবিক দূরত্ব রচনা করে ফেলেছে। এ সবের মধ্যেই সে ভেবেছিল সুচন্দ্রা তাকে ভালবাসে। একদিন সুচন্দ্রা তো তাকে অফিসেই যেতে দেবেনা। তাকে আদর করে, ঘরে ঢুকে রান্না করে খাওয়ায়। কত কি! যদিও শেষ বেলায় সে অফিসে যায়। সেখানে অফিস সহকর্মী নববিবাহিতা মনিকা তাকে কেবিনে নিয়ে গিয়ে চুম্বন করে উপহার হিসেবে তাকে মনে রাখতে বলে। পরদিনই স্বামীর সঙ্গে গোপালপুরে যাচ্ছে সে। এদিকে রাত্রিবেলা বাড়িতে ফেরার সময় দেখে, ব্যালকনির একপাশে অন্ধকারে নতুন প্রতিবেশী যুবকের সাথে সুচন্দ্রা এলোপাথারি চুমু খাচ্ছে। পরদিন অফিস গিয়ে দেখে, মণিকা বেল বটম পরে রেকর্ড নিয়ে অফিসারের ঘরে ঢুকল। "একটু বাদে জিভ চাটতে চাটতে বেরিয়ে আসে কুক্কুরী।"২৯

জীবনের এই বাস্তবগুলোকে সুবিমল নীতি না হোক হৃদয় দিয়ে মেনে নিতে পারেন নি। সে জন্যই গোপন প্রেম না বলে বলেছেন গোপন আঁতাত। আঁতাত মানেই অশুভ সম্পর্ক। প্রেম সম্পর্কের অতীব ঘৃণা এ গল্পের প্রাপ্তব্য। কিন্তু গল্পের কথন ভঙ্গী, প্রতিপাদন কৌশল খুবই আর্কষণীয় ও স্বাভাবিকতার গুণ সম্পন্ন।

'আত্মার শান্তি দু-মিনিট' গ্রন্থের নাম - গল্প। অফিসের এষ্টাবিলিশমেন্টের এক কর্মচারী শর্বরী গুহ ঠাকুরতা আগুনে পুড়ে মারা গেলে আর উদ্দেশ্য শেষ সভায় কথককে দু-মিনিট নীরবতা পালন করতে হয়। ঐ নীরবতার মুহূর্ত গুলিতে তার চিত্তে অনেকগুলি ভিন্ন দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর ছবি ভেসে উঠতে থাকে। ঐ টুকরো টুকরো ঘটনা ও ছবির মাধ্যমে আরও অনেকগুলি চরিত্র, গল্পাভাস পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে। নির্মিত হতে থাকে কনকের মৃত্যু ভাবনার আদলটি। কাঁচের শোকগৃহে সকলের শোকপ্রকাশ হয়ে গেলে কথক একা রয়ে যায়। সে চারপাশে বাসি রক্তের গন্ধ পায়, তার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে ওঠে, বেজে ওঠে আর্তনাদ। দেয়ালে মৃত্যুর কথা, চারদিক থেকে শোনাতে শুরু করে তীব্র হাহাকারে।৩০

ভিতরের বাতিগুলো ফট ফট করে নিভতে গুরু করে। শেষ আলোটা নেভার পূর্বে কাঁচের দরজা ঠেলে সে বাইরে বেরিয়ে আসে। দু-মিনিটের পরে বেশীক্ষণ সেখানে থাকা উচিত নয়। শোকের জন্য সময়ের বরাদ্দ কম। লক্ষণীয়, কথক দু-মিনিট নীরবতার মধ্যে আতঙ্কের সরব উপস্থিতি-ই লক্ষ্য করেছে কেবল। রক্ত, মাংস, কান্না, আর্তি, দোমড়ানো মোচড়ানো শরীর, ফাঁসির মড়ার গলায় মোটা নীলের দাগ, চোখে অশ্রুর দাগ, নাকে জমাট রক্ত এই সব বীভৎস দৃশ্যবলী দিয়ে লেখক আত্মার জন্য শান্তি প্রার্থনার দু-মিনিটকে পরিপূরিত করেছেন। নিষ্ঠুর বাস্তব তার প্রগাঢ় অবিশ্বাস মৃত্যু ও শোককে ঘিরে এখানে একটি বিশেষ আকার ধারণ করেছে। তবে লেখকের অতি সংবেদনশীল চিত্ততা ও মানবিকতা ধারনাটিই তাতে পুষ্টি পেয়েছে। গ্রন্থভুক্ত চতুর্থ গল্পটিরনাম 'মাংস খাওয়া হল'। অত্যন্ত সাধারণ মানের রচনা। বাসুদেব দাশগুপ্ত, শৈলেশ্বর ঘোষের ক্ষুধার্ত প্রবণতারই ছবি অঙ্কিত এখানে। যথা,-

> ক্ষুধা যেন চর্চিয়ে বেড়ে ওঠে। আকণ্ঠ ক্ষুধার ভাবনা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ..... রাস্তা ক্রশ করে একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকে পড়ি ....

আমি নিবিষ্ট একাগ্রমনে খেয়ে চলি। আমার দু-চোখ মাংস ও পরোটায়। ঘ্রাণে এসে ধরা দেয় মশলার গন্ধ। পরোটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাংসের সঙ্গে মুখে পুরে ফেলি, পেঁয়াজ খাই কচ্ কচ্ শব্দে।৩১

অপরিসীম ক্ষুধায় চরিত্রটি এত খায় যে নির্জীব সাপের মত ঘাসের উপর শরীর এলিয়ে দেয়।

গ্রন্থের পঞ্চম গল্প 'মেফিস্টোফিলেসের হাত'। এটি বিচ্ছিন্নতা বোধের গল্প। চেতন ও অচেতনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই চরিত্রটির ভিতর। তাই সে আচ্ছন্ন, ভূতগ্রস্ত। পথে বিপথে সে একা একা হেঁটে বেড়ায়। শৈশবকালকে মনে করতে পারে না সে। প্রতিটি ঘটনাকেই মনে হয় আকস্মিক। শরীর একটু অসুস্থ হলেই বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকে। চারপাশের মানুষের সকলের সঙ্গেই তার আচরণ হয়ে ওঠে অদ্ভুত। অস্বাভাবিক। সহসা মনে হয়, অদূরে দাঁড়িয়ে গুপ্তঘাতক। কালো ছায়ার মতো ভয় তাকে পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে। প্রথমে সে হাঁটতে থাকে। তারপর দৌড়ায়, নিরুদ্দেশ, দিগ্বিদিকহীন। পায়ের তলায় মাড়িয়ে যায় নিজেরই ছায়া। সময় ও নিজেকে অতিক্রমণের একটি ব্যর্থ চেষ্টা যেন। দিশেহারা আধুনিক মানুষের এটাই নিয়তি, কাম্যুতে, কাফকায় এবং সেই প্রভাবে সুবিমল বসাকের মধ্যেও।

ষষ্ঠ রচনাটি - হাংরিদের দৃষ্টিতে সাহিত্যে কী তারই একটি প্রচারপত্র। ছোট ছোট দশ লাইনের রচনাটির নাম 'প্রতিদ্বন্দ্বী।' মানুষ এবং সাহিত্য যে আধুনিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী বোধ করি এমন কথাই সুবিমল এখানে বলতে চেয়েছেন।

সুবিমলের বসাকের 'ছাতামাথা' গদ্য গ্রন্থটি প্রথম ১৯৬৫ সালে বার হয়। এর দ্বিতীয় সংস্করণ ২য় ২০০২ সালে। গ্রন্থটি আদ্যন্ত ঢাকাই কুট্টিতে লেখা। লেখক নিজে এবং সহযোগী লেখক অনেকেই এটিকে উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন। উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস, চরিত্রায়ন, বাস্তবতা, দর্শনচেতনা এ গুলো কিছুই এখানে মিলবে না। শুধু লেখকের দৃষ্টিকোণ (point of view) ছাড়া। সুবিমলের গল্পের মধ্যে যে আত্মপ্রক্ষেপণ ও বিচ্ছিন্নতা বোধের অনুভবগুলি মেলে - তারই বিস্তার ঘটেছে 'ছাতামাথা' নামক গদ্য আখ্যানে। আখ্যানের চরিত্রটি স্বয়ং লেখক। তিনি একটি ফ্ল্যাটে একাই থাকেন।

তার কেউ আছেন বলেও জানা যায় না। শুধু মাঝে মাঝে বাবা ও মায়ের স্মৃতিচিত্রণ করা হয়। লেখক একটি অফিসে কাজ করেন। সেই অফিস সম্পর্কেও বিস্তারিত জানা যায় না। তবে চাকুরিটি যে নিম্ন মধ্যবিত্ত তা অনুমান করা যায়। ফ্ল্যাটে একা থাকলেই তাঁর কেবল নরক তার শয়তানের কথা মনে আসে। নরক তাঁর সারা জীবনেই ছড়ানো, চারপাশে রয়েছে শয়তানেরাও। তাই বোধ হয় তিনি নিরুদ্বিগ্ন নন, সুস্থির নন। শয়তানকে তিনি খুঁজে পেতে চান। পানও। তাঁর নিজেরই মধ্যে শয়তানের বাস তারই মন চেহারা শয়তানের। শয়তানের অন্বেষণ শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে, আত্মানুসন্ধানের নামান্তর।

একদিন কেউ তাঁকে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়। তিনি বেরিয়ে পড়েন। উঠে পড়েন বাসে। কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে যেতে থাকেন। জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন বাইরে। তার পাশের সীটের লোকটি তাঁকে বলে- জানেন চিড়িয়াখানা থেকে জন্তুরা সব বেরিয়ে পড়েছে। কলেজ ষ্ট্রীটে নেমে একটি ঘরে পেইন্টিং একজিবিশান দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। এই বিস্ময় যেমন তার বিস্মরণশীল মনের জন্যে, তেমনই তার গেঁয়ো সাবঅল্টার্ন চরিত্রের জন্যে। সবিতা, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্ত্তী, শকুন্তলা, নীহার, অনিমা, অরুন্ধতী বলে ডাকেন। মেয়েদের খুবই অচেনা বলে মনে হয় তাঁর। নারীদের প্রতির এই উদাসীনতা বিদ্বেষ ছাড়া আর কী? যে ফ্ল্যাটে তিনি থাকেন তার পাশের ফ্ল্যাটে নারীদেহের ব্যবসা চলে। একেক দিন একেক নারী সেখানে ভাড়াটে হিসাবে আসেন। তিনি তাদের সঙ্গে মেশেন না। কারুর সঙ্গেই মেশেন না। জনমানব থেকে নিজেরই মুত্রা দোষে কেবলই আলাদা হতে থাকেন। কিন্তু একদিন পাশের ফ্ল্যাটের জ্যোৎস্না তাঁর কাছে এসে আলাপ করে। তাঁরও পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। তিনি তাঁর সব বায়োডাটা দেন, এমনকি শারীরিক মাপজোকও। কিন্তু নাম দিতে পারেন না। কারণ নিজের নাম খুঁজে পান না। তিনি নাম গোত্রহীন, জনসমাজে এক অচেনা আগন্তুক। তাঁর নিজের ফটোগ্রাফের প্রয়োগ একটি সংখ্যা পাওয়া যায় ৫৫৭৪৩, নামের বদলে সেটিই হয়ে ওঠে তাঁর চিহ্ন। তাঁর অস্তিত্ব একটি সংখ্যাচিত্রের বেশী কিছু নয়। এরপর তিনি তাঁর নানা দিনের দিনলিপি নানা অভিজ্ঞতা অনুভূতি, কয়েকটি জানা ঘটনার বিবৃতি দেন। ক থেকে ঞ পর্যন্ত ১০টি শিরোনামাঙ্কিত অনুচ্ছেদে। পরে আবার ধারাবিবরণীতে ফিরে যান। তখন আর জ্যোৎস্না নেই, এসেছে পুলিশ। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংখ্যা এবার পেয়ে গেছে নাম। শ্রী সুবিমল বসাক। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেক। বেশীর ভাগই উদ্ভট - যে গুলোর কোনো অর্থ-ই নেই।

একটি অভিযোগ স্পষ্টগোচর - অধিক প্রহর রাত্রে পথে বিপথে একাকী ঘোরাফেরা করা। অভিযুক্ত হবার পর বিচারে তিনি নির্বাসন দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হন। এর পরে আসে ক বাবুর প্রসঙ্গ। সেও পাগল, অন্যমনস্ক, উৎকেন্দ্রিক। ক বাবু আচার আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে তিনি পুনর্বিশ্লেষণ করেছেন। এও বোঝেন, তাঁর আয়ু ফুরিয়ে আসছে। মৃত্যু চেতনায় আক্রান্ত হন তিনি। জ্যা পল সার্ত্রের মৃত্যু ভাবনার মত দার্শনিক গঠন কিন্তু নেই এখানে: ,আবার রোম্যান্টিক, মৃত্যুচেতনাও নয়। উন্মার্গগামিতাই বুঝি; এর কারণ এবং নিঃসঙ্গতাও। যে কোনো নিঃসঙ্গতাই মৃত্যুকে ভয় পায়। লেখক এখন আর ফ্ল্যাটে, একদম তিষ্ঠোতে পারেন না, বিকেল হলেই বেরিয়ে পড়েন। অনির্দ্দেশ্য ভাবে মহানগরীর রাস্তায়, গলিঘুঁজি ময়দান নানা জায়গায় চড়কির মতো ঘুরে বেড়ান। তাঁর খিদে পায়। মিষ্টি খান। পরে সিগারেট খান। চেনা পরিচিত স্থানে হাঁটতে হাঁটতে একে তিনি সব গুলিয়ে ফেলেন। তাঁর মধ্যে দেখা দেয় স্মৃতিকাতরতা, চোখে ঘনিয়ে আসে অন্ধকার। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এই ঘুম যেন মৃত্যুর ইশারা।

বাসুদেব, সুভাষ ও সুবিমলের কথা সাহিত্যের বিষয় সাধারনভাবে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। প্রধানত যুব জীবনের অস্থিরতা, বিক্ষোভ ও জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে এরাঁ আবর্তিত হয়েছিল।অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই যুবকেরা ভবঘুরে, উদ্বাস্ত, পেশাহীন। এঁদের পারিবারিক পরিচয় নেই, সামাজিক দায়িত্ব নেই, রাজনৈতিক পরিচয় নেই অথবা ক্ষীণ। উদ্দেশ্যহীন, দিশাহীন, ভবিষ্যৎহীন এই যুবকদের তাই নেশাগ্রস্ত, উন্মত্ত ও আত্মহত্যাকামী হিসেবে দেখানো হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, এই লেখকদের জন্ম চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে, মারী, মন্বন্তর আক্রান্ত বঙ্গদেশে। এঁদের বড় হয়ে ওঠা স্বাধীনতা আন্দোলন, বিশ্বযুদ্ধ, দেশবিভাগ প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিপর্যয়ের মধ্যে। যেমন শৈলেশ্বর, বাসুদেব ও সুভাষের পরিবার পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু। সুতরাং এঁদের অভিজ্ঞতা ও চেতনায় কালের করাল কালো ছায়া রয়েছে। ক্ষুধা, নিঃসঙ্গতা, আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা শৃঙ্খলাহীনতা - এই সব ব্যাপার তাই বার বার এঁদের লেখায় আসে। এ হল বস্তুগত কারণ। আবার একটি শৈল্পিক কারণও আছে। কারণ এই সমস্ত জৈবিকতার মধ্যে দিয়েই মানবমনের নানা দিককে উন্মোচন করা যায়। স্বাভাবিকতা নয়, অস্বাভাবিকতার মধ্যেই থাকে জীবনের অনেক অচেনা অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা অর্জনেরও চেষ্টা করেছেন এই লেখকেরা। জগৎকে বাইরে থেকে দেখতে এক রকম। ভিতর দিক থেকে অন্যরকম। জগতের সেই আভ্যন্তরিন সত্যকে হাংরি লেখকেরা ফোটাতে চেয়েছেন। পোষাক খুলে মানুষের নগ্নতাকে একেবারে নির্মমভাবে তাঁরা তুলে এনেছেন। বাসুদেবের 'দূরবীন,' 'রিপুতাড়িত' 'বমনরহস্য,' 'বাবা' ইত্যাদি প্রতিটি গল্পেই সেই অভিপ্রায় স্পষ্ট। সুভাষের 'হাঁসেদের প্রতি,' 'গোপালের নয়ন তারা', সুবিমলের 'অযথা খিটক্যাল' 'গেরিলা আক্রোশ', প্রভৃতির মধ্যেও ভিতরের মানুষটিকে টেনে বার করার প্রয়াস আছে। এই লেখকদের মধ্যে যৌনতার অতিরেক আছে।কারন হাংরি সাহিত্য মূলত পুরুষবাদী সাহিত্য - এখানে যৌনতাও পুরুষবাদী। যৌনতা দিয়ে হাংরিরা শুধু জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ নয়, সংঘাত এবং পুরুষবাদী আধিপত্যও প্রকাশ করতে চান। তাই নারীদের এখানে কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। নারী যৌন চিহ্নের বেশী কিছু নয় হাংরি সাহিত্যে। নারী হাংরি লেখকদের সেজন্য কোথাও উত্তীর্ণ করে দেয় না। উত্তরণের কোনো ব্যাপারই যে এঁদের লক্ষ নয়। নিরর্থকতার বোধও এঁদের মজ্জাগত।তাই এত শূণ্যতা, মৃত্যু চেতনা, আত্মহত্যার বোধ। মলয় বলেছিলেন,-

> বেঁচে থাকার কোনো উদ্দেশ্য নেই জানার পরেও মানুষ বেঁচে থাকে, মৃত্যু পর্যন্ত মৃত্যুর জন্য জীবনপাতী শ্রম করে যায়, বেঁচে থাকে ..... কিসের জন্য অপেক্ষা করছে তা সে কোনোদিনই জানতে পারে না সে কেবল অপেক্ষা করে থাকে অপেক্ষা করে যায়।৩৩

আবার যেটুকু সময় মানুষ বেঁচে থাকে - তার মধ্যে জেগে থাকে শরীর। অতএব শরীর সত্য। সেই শরীরের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামনা, জিজ্ঞাসা সেগুলোও সত্য। এই শরীরের সব দিকগুলোকে জানার চেষ্টাই হাংরিদের লক্ষ। এই অর্থেই তাঁরা ক্ষুর্ধাত। এই অর্থেই তারা অপরাধী ও যৌনকাতর।

শৈলেশ্বর বলেছেন -

> মানুষ শরীরকেই চেনে না। শরীরই তার জীবন। শরীরই তার বন্ধনমুক্তি, শরীরই তার ঈশ্বর, শরীরই মৃত্যু, আবার মৃত্যু অতিক্রমও করে শরীর। ক্ষুন্নিবৃত্তিগত শরীরের মধ্যেই সমস্ত সত্য লুকিয়ে আছে। বুর্জোয়া কোনো অবস্থাতেই চায় না যে, এই শরীর জেগে উঠুক।৩৪

শরীরের অবদমন এঁরা সহ্য করেন নি। তাই পিউরিটানদের বিরোধিতা করেছেন। শরীর দিয়েই আক্রমণ করেছেন শরীর বিরোধীদের। হাংরিদের যৌন অতিরেক তাই প্রতিবাদের চিহ্ন। বাসুদেব অধিকাংশ গল্পে, সুভাষের প্রথম দিকের গল্প এবং সুবিমলের গল্প গুলিতে তার প্রমাণ রয়েছে।

হাংরি কথাসাহিত্যের চরিত্রগুলোর আচরণ ও সংলাপে কিংবা ঘটনা ধারার বর্ণনায় অসংলগ্নতা একটি পুনরাবৃত্ত ব্যাপার। এটা একদিকে যেমন চরিত্রগুলোর জেনেটিক, তেমনই তাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও ঐতিহ্যের পেষন বা প্রভাব জাত। শৈলেশ্বর লিখেছিলেন,-

> অধঃপতিত ভারতবর্ষের সন্তান আমরা। অন্তহীন শূন্যতা পরিবেশের সন্তান আমরা। বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের মধ্যে আমাদের জন্ম।৩৫

বাসুদেবের গল্পে প্রতিটি চরিত্র অস্থির, দিশেহারা শেষে হিংস্র হয়ে ওঠে। সুভাষের গল্পের মধ্যে অস্থিরতা আরও বেশি ও চরিত্রগুলোর প্রতিবাদ ও সরাসরি রাষ্ট্র, সমাজ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে উচ্চকিত। সুতরাং এঁদের আপাতবিশৃঙ্খল তরে ব্যাপারটি প্রতিবাদের উদ্দেশ্যই নিয়োজিত। শুধু চরিত্রগুলোর আদল দেখানোর জন্য নয়। সুবিমলের গল্পে অসংলগ্নতার ব্যাপারটি খুবই কম বলা যায়।

তবে মৃত্যুর ব্যাপারটি তিনজনের লেখাতেই বহুবার নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। ১৯৬৫ সালে মলয় রায়চৌধুরী লিখেছিলেন,-

> অ্যাবসল্যুট আত্মাকে মুক্তি দেবার জন্যে আত্মহত্যার অস্ত্র ব্যবহার করতেই হয়, অদৃশ্যকে নয়তো দেখা যায় না।৩৬

সুতরাং মৃত্যু হাংরিদের লেখায় একটি জীবন প্রকরণই নয় শুধু। শিল্প প্রকরণও বটে। লক্ষণীয়, এই তিন গল্পকার মৃত্যুকে তিন ভাবে ব্যবহার করেছেন। কারন তিনজনের উপস্থাপনরীতি এক নয়। বাসুদেবের গল্পের জগৎ রূপকের জগৎ, সুভাষের প্রতীকের আর সুবিমলের প্রত্যক্ষ বর্ণনার। অতএব 'বমন রহস্য' গল্পে সুকুমারের বাবা ও শ্বশুর মশাইয়ের মৃত্যু, 'দূরবীন' গল্পে নায়ক ও তরলতার মৃত্যু কিংবা 'বসন্ত উৎসবে'র গল্প মণিকার মৃত্যু যেন ঠিক মৃত্যু নয়, একটি চিহ্ন মাত্র। সুভাষের গল্পে মৃত্যু শোষণের একটি হাতিয়ার, প্রতিবাদের কণ্ঠরোধকারী, বিচ্ছিন্নতার একটি অস্ত্র। 'হাঁসেদের প্রতি' গল্পে হাঁসেদের ধ্বংশকরা হচ্ছে তাড়াতাড়ি অধিকাংশ ডিম সংগ্রহের জন্যে। 'শীর্ষ অভিযানের' মৃত্যু আহত চরিত্রেরা প্রকৃত পক্ষে শহীদ। 'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট' গল্পে বলা হচ্ছে :

> তাবৎ মানুষের সঙ্গে যখন নিজেকে জড়াতে যাই
> মৃত্যু হঠাৎ-ই বেজে ওঠে ঠিক মাঝখানে।৩৭

সুবিমলের গল্পে মৃত্যু একজন জীবিতের জীবনকে আলোড়িত করে। হয়ে ওঠে সংক্রামক। সুবিমল মৃত্যুকে ভয় করেন 'আত্মার শান্তি দু'মিনিট' গল্পে অফিসের একটি মৃত্যু সংবাদ লেখকের সমগ্র অস্তিত্বকে গ্রাস করে ফেলেছে। আসলে আতঙ্ক সুবিমলের গল্পের একটি বৈশিষ্ট্য। তা অনেক সময়ই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়।

অনেক সময় এই আতঙ্ককে জয় করবার জন্য তিনি মৃত্যুকেই আশ্রয় করেন। 'আগ্রাসী অপকর্ম' শীর্ষক গল্পে জীবনের অর্থহীনতাকে মৃত্যু দিয়ে জয় করতে চেয়েছেন সুবিমল। বলা যায়, সুবিমলের কাছে মৃত্যু একটা পালানোর পথ। মলয় আত্মাকে মুক্তি দেবার জন্যে মৃত্যুকে প্রয়োগ করার কথা বলেছিলেন। সে দৃষ্টি অধিবিদ্যক। তত্ত্বে বা কবিতায় তাকে রূপায়িত করা সহজ হলেও গল্পে কঠিন। কাম্যু বা কাফকা এ ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়েছিলেন। সুবিমল তা পারেন নি।

হাংরি কথা সাহিত্যে সামাজিকতা, প্রেম, সৌন্দর্য ইত্যাদিকে প্রত্যাখান করা হয়েছে, প্রচলিত রাষ্ট্র ও সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জনেই এটা তাঁরা করেছেন। এটা তাঁদের একটা দৃষ্টিভঙ্গী। একটু চড়া সুরেই করেছেন যাতে মানুষ তাঁদের দিকে তাকান। তবুও কিন্তু শিল্পমূল্য অর্জন এঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। বাসুদেবের রূপক ও রূপকথার জগতে শুধু হাংরি চেতনা নয়, একটি চিত্তাকর্ষক পরিবেশও ফুটে ওঠে। তাঁর ভাষারীতি, চিত্র নির্মাণ বা সংলাপ রচনাও প্রশংসনীয়। অনেক ক্ষেত্রে গল্পকার বাসুদেবের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সুভাষের গল্পে প্রতীকের ব্যবহার বেশী। চিত্রল বর্ণনা সমারোহ, কোলাজ - রীতি এগুলোও ছাড়াও নাটকীয় দৃশ্যকল্পনা সেখানে সুপ্রচুর। সুভাষই এই ধারার একমাত্র গল্পকার যিনি কোথাও একটুকু আবেগবিহ্বল হন নি। বাসুদেব ও সুবিমল কিন্তু হয়েছেন। সুভাষ বুদ্ধিপ্রধান গল্পকার। তাছাড়া রাষ্ট্রের ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ সরাসরি। একদিকে কলকাতা মহানগরীর তাঁর লেখার উপজীব্য - আর পটভূমি সারা ভারতবর্ষের। সুবিমলের লেখায় পটভুমি ও পরিবেশের গুরুত্ব নেই। নিঃসঙ্গতা, আতঙ্ক ও যৌনতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিচৈতন্যের একটি ছবি ফুটিয়ে তোলাই তাঁর লক্ষ। শ্রেণী চরিত্রের বিচারে তিনজনের মধ্যে সুবিমলই সবচেয়ে প্রান্তিক। ছাতামাতা রচনাটির শুরুতে আছে ,-

> পূজা - পাইলের দিনে, তেহার পরবে, ঐ স্থানে গিয়া দুই একদিনের লাইগ্যা ঘুইরা আওন যাইতো - আয়েরও পথ হইতো ..... রোজ নিত্যি ধর্মের তিরিশো দিন ডাইল ভাত মাছ চরচৈটা পাতরি আর খাত্তন যায় না।৩৮

গ্রন্থের শেষ পাতার আগের পিঠে আছে ,-

> আদখা আমার ক্ষুধা পায়। টের পাই প্যাটের ভিৎরে ক্ষুধা চনমন কইর‍্যা উঠছে। হপার বাইরনের আগে প্যাট ঠেইস্যা খাইয়া উঠছি - অহন আবার ক্ষুধা পাইছে। ৩৯

যৌনতা যেমন অনেক সময় এঁদের একটা মানসিক প্রবণতাও বিশেষ; এক্ষেত্রে সুবিমলের ক্ষুধাও তাই। তাছাড়া, নিজেদের তত্ত্ব ও ভাবনাকে শিল্পরূপ দেবার ক্ষমতা বাসুদেব ও সুভাষের যতটা, সুবিমলের ততটা নেই। তবুও বাসুদেব ও সুভাষের সহযোগী কথাকার হিসেবে এবং হাংরি আন্দোলনের গঠনপর্বের একজন লেখক হিসেবে সুবিমলকে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করেই দেখতে হবে।

তথ্য সূত্র ঃ

১. বাসুদেব দাশগুপ্ত, রন্ধনশালা গল্প, রন্ধনশালা, কলকাতা, বিদ্রোৎসাহী প্রকাশ, ১৯৮৩ পৃ: ৯ ।

২. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, কলকাতা ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, ১৯৯৫ পৃ: ২৬ ।

৩. মলয় রায়চৌধুরী, ইস্তাহার সংকলন, কলকাতা, মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা ১৯৮৫ পৃ: ৮ ।

৪. বাসুদেব দাশগুপ্ত, রন্ধনশালা গল্প, রন্ধনশালা, কলকাতা, বিদ্রোৎসাহী প্রকাশ, ১৯৮৩,পৃ: ১ ।

৫. বাসুদেব দাশগুপ্ত, বমন রহস্য গল্প, তত্রৈব পৃ: ৩৩ ।

৬. অমিতাভ দাশগুপ্ত, ক্ষুধার্ত তরুণদের গদ্য তা তজ্জাতীয় কিছু, ক্ষুধার্ত পত্রিকা, কলকাতা, ১৩৭৬, পৃ. পত্রিকাটি পৃষ্ঠা সংখ্যাহীন ।

৭. ক) বাসুদেব দাশগুপ্ত, বসন্ত উৎসব, রন্ধনশালা. কলকাতা, বিদ্রোৎসাহী প্রকাশ. ১৯৮৩, পৃ: ৪৫ ।

৭. খ) শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রতিবাদের সাহিত্য, ধৃতরাষ্ট্র. পাবলিকেশন, শিলিগুড়ি, ১৯৮৫, পৃ: ০২ ।

৮. দেবেশ রায়, বিলম্বিত সওয়াল, ক্ষুধার্ত পত্রিকা,কলকাতা, ১৯৭২-৭৩ পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই ।

৯. তদেব।

১০. মলয় রায়চৌধুরী, ইস্তাহার সংকলন, কলকাতা, মহাদিগন্ত প্রকাশন সংস্থা, ১৯৮৫ পৃ: ৪৯ ।

১১. বাসুদেব দাশগুপ্ত, বাবা, ক্ষুধার্ত পত্রিকা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা, ১৯৮৫ পৃ: ১১২-১১৩ ।

১২. বাসুদেব দাসগুপ্ত, খেলাধুলা, দন্দশূক পত্রিকা, চন্দননগর, ১৯৮১, পৃ: ২ ।

১৩. সুভাষ ঘোষ, আমার চাবি, দন্দশূক প্রকাশনী, চন্দননগর, ১৯৮৪, পৃ: ৪৪ ।

১৪. সুভাষ ঘোষ, যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট, হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন, কলকাতা, কথা ও কাহিনী, ১৯৯৮ পৃ: ১৫৮।

১৫. তদেব, পৃ: ১৫৭ ।

১৬. ক) সুভাষ ঘোষ, নেশা কলোনী, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৭ পৃ: ১ ।

১৬. খ) তত্রৈব পৃ: ১ ।

১৬. গ) তত্রৈব পৃ: ১৭ ।

১৭. তদেব পৃ: ১৭ ।

১৮. সুভাষ ঘোষ, গোপালের নয়নতারা, সেমিকোলন, শিলিগুড়ি, ১৯৯৩, পৃ: ৫৬ ।

১৯. সুভাষ ঘোষ, শীর্ষ অভিযান, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ: ৫৪ ।

২০. তদেব পৃ: ৫৫ ।

২১. তদেব পৃ: ৫৫-৫৬ ।

২২.তদেব পৃ: ৫৩ ।

২৩.তদেব পৃ: ৫৪ ।

২৪.তদেব পৃ: ২০ ।

২৫. তদেব পৃ: ১৯ ।

২৬. সুবিমল বসাক, গেরিলা আক্রোশ, জেব্রা বুকস, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ: ৫ ।

২৭. তদেব, পৃ: ৩০ ।

২৮. সুবিমল বসাক, আত্মার শান্তি দু-মিনিট, জেব্রা বুকস, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ: ৬ ।

২৯. তদেব পৃ: ২৮ ।

৩০. তদেব পৃ: ৪৫ ।

৩১. তদেব পৃ: ৪৮ ।

৩২. সুবিমল বসাক, ছাতামাথা, গ্রাফিত্তি, কলকাতা, ২০০৫, পৃ: ১১ ।

৩৩. মলয় রায়চৌধুরী, ইস্তাহার সংকলন, মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, কলকাতা ১৯৮৫, পৃ: ১৬ ।

৩৪. শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রতিবাদের সাহিত্য, ধৃতরাষ্ট্র পাবলিকেশন, শিলিগুলি, ১৯৮৪ পৃ: ৭ ।

৩৫. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ: ১ ।

৩৬. মলয় রায়চৌধুরী, মৃত্যু মেধীশাস্ত্র : প্রথম ইনষ্টলমেন্ট ওরফে আমার জেনারেশনের কাব্য দর্শন, মলয় রায়চৌধুরী প্রকাশিত, পাটনা, ১৯৬৫ পৃ: ৪ ।

৩৭. সুভাষ ঘোষ /হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন, কথা ও কাহিনী, কলকাতা, ১৯৯৮ পৃ: ১৫৮ ।

৩৮. সুবিমল বসাক, ছাতামাতা, গ্রাফিত্তি, কলকাতা, ২০০৫ পৃ: ৭ ।

৩৯. তদেব পৃ: ৪৭ ।

তৃতীয় অধ্যায়

নাট্যকৃতি

ক. মলয় রায় চৌধুরীর নাটক

১. ইল্লত

হাংরি সাহিত্য ধারায় নাটকের পরিমান অত্যন্ত কম হলেও তাদের কিছু বিশিষ্টতা আছে। হাংরি লেখকদের মধ্যে মলয় রায় চৌধুরী প্রথম নাটক রচনা করেছিলেন। 'জেব্রা' পত্রিকায় ১৯৬৩ সালে তাঁর 'ইল্লত' নাটকটি প্রকাশিত হয়। এটি আকারে ক্ষুদ্র - দুই অঙ্ক বিশিষ্ট। আলাদা করে কোনো দৃশ্য বিভাগ নেই। প্রথম অঙ্কের শুরুতে যে মঞ্চ নির্দেশ আছে তা উচ্চকিত ও উৎকট। যেমন - মঞ্চের মাঝখানে দু মানুষ সমান উঁচু অর্থাৎ কমবেশী ১২ ফুট উঁচু একটি চারপায়া। ওরই দক্ষিণ দিকে বারান্দা যুক্ত একটি প্রাচীন সিংহাসন। মাটি থেকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে সিংহাসনের বাঁ দিকে। সিংহাসনের সামনের পায়া দুটো থেকে আরও দক্ষিণে একটি এক ফুট উঁচু বেদি সেটি গাঢ় লাল। ডান দিকে দুটি ঝুলন্ত দড়ি দৃশ্যমান। বোঝাই যাচ্ছে, মঞ্চ নির্দেশনা বাস্তবানুগ নাটকের অনুসারী নয়।

যাই হোক, এরপর নাট্যকার চরিত্রগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দিয়েছেন। ছোটবড় মিলিয়ে এখানে চরিত্র সংখ্যা নয়টি। এরা হলো - ডোডোন, জম্বুক, রোমেশ, লোমেশ, ধঞ্জয় (ধনঞ্জয় নয়), রজন, ধূর্তক, টিকলু এবং গণেশ। ডোডোন রাজকীয় বেশে সিংহাসনে বসে নাক ডেকে ঘুমায়। ডান দিকের আবছা নীল বেদিতে অলস ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে জম্বুক। তার কাঁধে ঝোলানো পেট মোটা ব্যাগ। সিংহাসনের পায়াগুলোকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে রোমেশ ও লোমেশ। দু'জনেরই পোষাক ছিন্ন, অবিন্যস্ত, মলিন, বিসদৃশ ও উদ্ভট। দু'জনেরই গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রোমেশের পাকানো গোঁফ, মাথায় টাক। মাথায় স্বল্প কেশ কাঁচা পাকা, গোঁফ সম্পুর্ন সাদা।

লোমেশের গোঁফ নেই ; তবে চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে । মঞ্চের সামনের বাঁ দিকের কোণে গোল হয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারজন - ধঞ্জয়, রজন, ধূর্তক, টিকলু। ধঞ্জয় কোট পরিহিত যা এতো বেশী আঁটো যে , বোঝা যায় ছোট হয়ে গেছে । তবে চিকন জেল্লা রয়েছে । রজনের পোষাক ঢিলেঢালা । ধূর্তক ও টিকলুর পোষাক ও চেহারা সাধারণ , মাঝারিধরনের , নিষ্প্রভ । ডানদিকের দুটি মোটা ঝুলন্ত দড়ির মাঝখানের বিরাজমান ফাঁকের মধ্যে গনেশ পা ফাঁক করে পায়চারি করছে ।

বোঝাই যায় যে , নাট্যকারের এই প্রস্তাবনা অংশটি বাস্তববাদী নাটকের জন্য নয় । প্রতীকী বা অ্যাবসার্ড নাটকের উপযোগী । এখানকার মঞ্চোপকরণ বা চরিত্ররা সবাই এক একটি আইডিয়ার প্রতীক । এখানে রঙের প্রয়োগও অত্যন্ত সতর্কভাবে করা হয়েছে । এধরনের নাটকে বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয় । এই নাটকে মলয় 'সিংহাসন' কে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতীক হিসাবে দেখিয়েছেন । সুতরাং ঐ বিশেষণ দুটি সুপ্রযুক্ত বলতে হবে । কেননা , যুগ যুগ ধরে অপ্রতিহত ভাবে তাতে কেউ বসে ক্ষমতা ভোগ করে চলেছে । সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রের রূপান্তর পর্বেও তার কার্যকারিতা কমেনি ।

সিংহাসনের সামনের বাঁদিকের বেদিটি লাল এবং ডানদিকের বেদিটি যে আবছা নীল তার কারন দক্ষিণপন্থা ও বামপন্থার পার্থক্য । সুতরাং আবছা নীল বেদিতে দন্ডায়মান অলস জম্বুক দক্ষিনপন্থী মোসাহেব বই কিছু নয় । সে স্থিতাবস্থার সমর্থক , সুবিধাভোগী । সিংহাসনের পায়াগুলিকে কেন্দ্র করে রোমেশ ও লোমেশকেও তো ঘুরতেই হবে । সাধারণ মানুষের প্রতীক তারা । রাজা বা মন্ত্রীর বা রাষ্ট্রের যে বৃত্ত তা থেকে সাধারণ মানুষের যুক্তি কোথায় ? ধঞ্জয় , রজন , ধূর্তক , টিকলু - এরাও সাধারণ মানুষ , সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এসেছে । অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেনীর বিন্যাস মলয় প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এখানে করেছেন। গণেশ এই নাটকের 'প্রটাগনিষ্ট'। সেই একমাত্র সক্রিয় চরিত্র এ নাটকে। ডোডোন এখানে যেমন অনড়, অন্যেরাও তেমনি স্থাণু। গতিময় চরিত্র বলতে রোমেশ, লোমেশ ও গণেশ। নামেরও অনুপ্রাস আছে তাদের ।

প্রথম দুজন যেহেতু সিংহাসনের পায়াদুটোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে ,তাই বলা যায় তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের খুব কাছেই আছে । হয়ত রাষ্ট্রের যান্ত্রিক কৌশলেরই তারা শিকার এবং বিভ্রান্ত। কিন্তু গণেশ ডানদিক থেকে নেমে আসা দুটো মোটা ঝুলন্ত দড়ির মধ্যিখানে , সিংহাসনের অনেকটা দূরে কিছুটা দৃপ্তভাবেই পায়চারি করছে । প্রত্যেকটি চরিত্রের পরিচয় পর্বেই নাট্যকার যে কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের ছাপ তাদের মধ্যে রেখেছেন নাটকের পরবর্তী অংশেও তারই এক পরিণতি পর্ব রচিত হয়েছে ।
স্পষ্ট করে না বললেও ডোডোন এখানে রাজা । সে সিংহাসনে সমাসীন , রাজবেশধারী । প্রজা এবং রাজ্যের প্রতি তার কোনো দায় নেই । তাই নাক ডেকে ঘুমোনো । আবার সেই ঘুম থেকে উঠে সংলাপ " দেকচি সআবি ঠিকাচে "। ১
সে বলছে , -"মানুষকে এর আগে আমি এতো খুশী দেখিনি "। ২

ধঞ্জয় , রজন , ধূর্তক , টিকলু , জম্বুকেরা তাঁকেই সমর্থন করে । তাঁর সংলাপেরই অনুসরণ তাদের কণ্ঠে । ডোডোনের মধ্যে মলয় সামন্ত মানুষ এবং আধুনিক মানুষের যেন একটি মিশ্রণ ঘটিয়েছেন । কখনও তাঁর কাব্যিক মেজাজ , কখনও চাষাড়ে গলা । সে মোসাহেবি যেমন পছন্দ করে তেমনই ব্যক্তির স্বাধীনতার কথাও বলে ; নানারকম আইনকানুনের কথা বলে । বলার পরে সবাইকে বলে সমর্থন সূচক হাততালি দিতে । জম্বুক তাঁকে সন্দেহের বিপরীতে বাতাসের আঁচ দেয় । ডোডোন বলে " হ্যাঁ , চাদ্দিকে চোক বুলিয়ে নাও দিকিনি (স্বগত) যা দিনকাল পড়েচে । সব ঠিক আচেতো ? " ৩ হাল আমলের অবস্থা দেখে নেবার আদেশ জম্বুকে দিয়ে ডোডোন আবার নাক ডাকতে শুরু কর । যেমন একজন আধুনিক শাসন কর্তা - আমলাদের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত বোধ করে ।

এরপর গণেশের সংলাপ । সে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রবক্তা । মৌলিক অধিকারের দাবিদার । শুধু রাজনৈতিক নয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও তার কাছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক । তবে একনায়কতন্ত্রেরও বিরোধী সে । শিল্প , সাহিত্য সংস্কৃতি সর্ব ক্ষেত্রেই যে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা গনেশ বলেছে তাতে মানবাত্মা, বুক্তের রক্ত ইত্যাদি অনুষঙ্গগুলি এসেছে । মনে হয় , একধরনের সদর্থক ব্যাক্তি স্বাধীনতার কথাই সে বলে ।

কিন্তু গনেশ যেহেতু যতিচিহ্নহীন এবং স্বাভাবিক অন্বয়হীন বাক্যে কথা বলে তাই তার ভাষায় দুটি তত্ত্বগুণ আসে : ১ - প্রবহমানতা ২ - সামঞ্জস্যহীনতা । তার অস্ফুট ও অর্ধস্ফুট কথা থেকে পাঠককেই অর্থ অনুমান করে নিতে হয় ।গনেশের লেকচারে জম্বুক চমকে ওঠে, ডোডোনও ইতিমধ্যে জেগে ওঠে । যদিও গনেশের উপস্থিতি টের পায়না । আবারও ঘুমিয়ে পড়ে । পুনরায় গনেশ বকতে শুরু করে । এবার তার বক্তব্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের দু'একটি ঝলক লক্ষ করা যায় । যেমন , " উন্মাদনায় মাতিয়ে রাখো।তাতিয়ে রাখো কুড়ি বার্ষিকী বৃষ্টি উন্নয়ন আকাশ খাঁ খাঁ করছে মানুষের দুঃখ বিলাসের কাছে .....।"৪

এছাড়া "আমলাতন্ত্র" জনসাধারনের কণ্ঠরোধ , কোমড়রোধ , "নানান আইনকানুন নিয়মের আওতায় পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নানান আইনকানুন নিয়মপ্রনালী কোড সেসনের আওতা "৫

ইত্যাদি প্রসঙ্গও এসেছে । গণেশের বক্তৃতার প্রভাব পড়ে রোমেশ ও লোমেশের উপর । এতক্ষণ তারা সিংহাসনের পায়াগুলিকে কেন্দ্র করে ঘুরছিল। এবার কথা বলতে শুরু করে ।বলে , দশদিক জাগিয়ে তুলতে হবে , বিপ্লব, বিক্ষোভ ,আন্দোলন করতে হবে । যদিও তাদের কণ্ঠস্বরে বাচালতা ও লঘুতার স্পর্শ আছে , তবু আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার নানা সংকটের প্রতিছবি মেলে সেখানে । যেমন :-

লোমেশ ।। .....জয় করতে হবে পৃথিবী। রোমেশ ।। যন্ত্রণাজর্জর সমস্যাসংকুল মানুষকে ।

লোমেশ ।। উৎপাদন শক্তির দাস মানুষকে (নীরবতা) মানুষের দাস উৎপাদন শক্তিকে ।

রোমেশ ।। শক্তির দাস সমাজকে ।

লোমেশ ।। সমাজের দাস মানুষকে ।

রোমেশ ।। দ্বন্দের দাস মানুষকে ।

লোমেশ ।। মনুষ্যত্বের দাস মানুষকে।৬

লোমেশ এখানে মুক্তির কথা বলেছে । সে চায় " উত্তাল মানুষ সাগর ধাপে ধাপে মানুষ নতুনতর ইতিহাসের নায়ক হবে "।৭

লোমেশ নিজেও সেই নায়ক হতে চায় নাকি ? বলে , " আর আমি নেতা । লোকে বলবে মহান লোমেশ"(সমগ্র মঞ্চ ঘুরতে থাকে গটমট করে । গণেশের কাছাকাছি এলে আচমকা দাঁড়িয়ে যায় ··। ভাবে৷ মাথা নাড়ে । ভাবে৷ দৌড়ে ফিরে যায় রোমেশের কাছে ।) বলে ,- " কিন্তু আমি তো বক্তৃতা দিতে জানি না।"৮

রোমেশ তাকে বক্তৃতার কেতা শেখায় । তাদের কথাবার্তা চলতে থাকে । এমনি সময়ে মঞ্চে চারজন ব্যক্তি লাল , নীল , হলুদ , সবুজ রঙের কৌপীন পরা - ঢুকে পড়ে । মঞ্চের এক পাশ থেকে অন্য পাশে কৌণিকভাবে প্রস্থান করতে থাকে । দু'বার তারপর একযোগে সা - ব - ধা - ন বলে চেঁচিয়ে উঠে । এদের প্রবেশ মুহূর্ত থেকেই মঞ্চে চাঞ্চল্য দেখা দেয় । ডোডোন নাক ডাকা থামিয়ে উঠে পড়ে । সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে আসে । তাড়াতাড়ি জম্বুকের কাছে অধৈর্যের মতো দাঁড়ায় । নিজের সমস্ত পোষাক দ্রুত খুলতে থাকে । জম্বুক তার নিজের কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে এক প্রস্থ সামরিক পোষাক বার করে দিলে , ডোডোন তা দ্রুত পরে নেয় । জম্বুক ডোডোনের পরিত্যক্ত পোষাকগুলো কুড়িয়ে নিয়ে নিজের ব্যাগে পোরে৷ নতুন পোষাক পরে ডোডোন মঞ্চময় কুচকাওয়াজ করে বেড়াতে থাকে ও মাঝে মাঝে যেখানে সেখানে শ্যালুট করতে থকে । জম্বুক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে । ধঞ্জয় ও রজন সিংহাসনের পায়ের কাছে গিয়ে তাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে । রমেশ ও লোমেশ আগে যেদিকে ঘুরছিল তাঁর উল্টোদিক দিয়ে ঘুরতে শুরু করে । সাধারণ মানুষের অবস্থান যেমন হয় আর কি! রমেশ ও লোমেশ , ধূর্তক আর টিকলু তাদের মুখগুলো এক জায়গায় এনে গোপন আলোচনার ভঙ্গী করে , পরক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়ায় । গণেশের অবস্থান পূর্ববৎ থাকে । কিন্তু সমস্ত ছাপিয়ে কৌশলধারীদের দ্রুত আনাগোনা আগাগোড়া চলতে থাকে ।

আসলে গণেশের যে আদর্শবাদ ও তাত্ত্বিকতা - তাঁর প্রভাব স্তিমিত । মানুষের চিন্তা-চেতনাকে তা প্রভাবিত করে , সক্রিয় তত করতে পারে না । বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী মানুষকে । এখানে গণেশ ছাড়া সকলেরই সাজ - পোষাকের বর্ণণা দেওয়া হয়েছে । ডোডোন ছাড়া সকলেরই পোষাকে মধ্যবিত্তের স্তরগুলি দ্রষ্টব্য ।

রোমেশ ও লোমেশের পোষাক ভিখিরি বা ভবঘুরেদের মতো। গণেশের পোষাকের বর্ণনা নেই, তবে সে তাত্ত্বিক এবং একজন সংগঠক। নানারঙের কৌপিন পরা, চারজন মানুষ মঞ্চে আসতেই গোটা পরিবেশ পাল্টে গেছে। তাদের উচ্চনাদী সাবধান ধ্বনিতে দৃপ্ত পদচারণায় মঞ্চের মধ্যে আলড়ন পড়ে যায়। মলয় সম্ভবতঃ বলতে চেয়েছেন, নোংরামী (ইল্লত) দূর করতে হলে, নোংরামীপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পাল্টাতে গেলে এইরকম তত্ত্ব নিরপেক্ষ নিঃস্ব (কৌপিনধারী) বলিষ্ঠ ত্যাগী মানুষেরই প্রয়োজন। তত্ত্ব নিরপেক্ষ ও রাজনৈতিক দলমতহীন সমস্ত বিদ্রোহী মানুষকেই নোংরামী দূর করতে প্রয়োজন। এ কারণে ওদের কৌপিনের মধ্যে মূল সব রংগুলি আছে - লাল, নীল, হলুদ, সবুজ।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দৃশ্যবর্ণনা পূর্বেকার মতই,শুধু কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া। ডোডোন এখানে সিংহাসনের বারান্দায় সামরিক পোষাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। স্যালুটের ভঙ্গীতে। জম্বুক নীল বেদি পাল্টে লালটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। ধঞ্জয় ও রজনের স্থানে চলে গেছে রোমেশ ও লোমেশ এবং ধঞ্জয় ও রজন চলে এসেছে রোমেশ ও লোমেশের স্থলে। সুতরাং সিংহাসনের পায়াগুলোকে কেন্দ্র করে ঘুরছে তারাই। গণেশের অবস্থানের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। বস্তুত, রোমেশ ও লোমেশের মধ্যে সচেতনতার জাগরণ ও চার কৌপীনধারীর ঘোষধ্বনি ডোডোনকে সতর্ক করে তোলে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। তাই রাষ্ট্রের জন্যই তার এই সামরিক পোষাক পরিধান। প্রথম অঙ্কের শেষে নাটকে যে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তারই ফলে দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুটা হয় অন্যরকমভাবে। ডোডোনের মার্চপাস্টে ভুল হয়, তবু সে কুচকাওয়াজ করে। মার্চ করেই সিঁড়ি বেয়ে নামে এবং সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে। সিংহাসনে ওঠে। সে সিংহাসনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ধঞ্জয়, রজন এবং গণেশ ছাড়া সবাই কুচকাওয়াজ করতে থাকে। সবাই যেন তটস্থ। ডোডোন যখন বলে ''সঅবি দেকচি ঠিকাচে''।৯

তখন তটস্থতা ত্যাগ করে কুচকাওয়াজকারীরা সহজভাবে দাঁড়ায়। জম্বুক, রোমেশ, লোমেশ, ধূর্তক, টিকলু একবাক্যে সমর্থন করে ডোডোনকে। আসলে রোমেশ ও লোমেশ তাৎক্ষণিক ভাবে গণেশের দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছিল।

কিন্তু তথাকথিত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আবার পূর্বতন মানসিকতায় অসহায়ভাবে ফিরে গেছে । ডোডোন যেহেতু স্তাবকদেরই কেবল দেখতে ও শুনতে পায় কিংবা বেশি সংখক মানুষের সমর্থন লাভ করে তাই নিশ্চিন্তবোধ করে । অথবা পরোয়া করে না । গণেশের সুদীর্ঘ বিদ্রোহী বক্তব্য তার ভালও লাগে না । জম্বুক ডোডোনকে সঙ্গত দেয়,-

কোথা থেকে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি যেন !
মেরে অ্যাগবারে ঠান্ডা করে দেবো গুজুর
গুজুর ফিস ফিসানি করলে কেউ !ওসব
এখানে চলবে না ।১০

ডোডোন জম্বুককে বলে , 'ধুল ধাবড়ি উড়িয়ে দেবার কথা বলো' ।১১

জম্বুক শুধু ডোডোনের হুকুম আমিল করে না , সে বলে , 'ঘুম পাড়ানির অক্লান্ত যোদ্ধা আমরা । ঠেঙিয়ে তক্তা ফাটিয়ে দেবো কেউ আমাদের ঘুম ভাঙালে '।১২

এই উক্তির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের যে অসাড় স্থাণুত্ব তারই প্রতি সে ইঙ্গিত করে । রাষ্ট্রনায়কেরা কিন্তু এই স্থবিরতাকে টিকিয়ে রাখতে চায় । একদিক থেকে তা মানুষের আর্থক ও আত্মিক অবরোধের অন্যরূপ । ক্ষমতায় থাকতে গেলে স্থবিরতা বজায় রাখা প্রয়োজন । ডোডোন বলে ,

আমি - মানেইয়ে - আমারই হলুম কি বলে গিয়ে
জাতির প্রাণসত্তা । আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন কোল্লে
চোটকিয়ে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো ।১৩

জম্বুককে নির্দেশ দেয় -'দেকো দিকিনি কেউ কোতাও মামদোবাজী কচ্ছে কিনা '? ১৪.
তারপর ঘুমোবার জন্য তৈরী হয় । এরপর অবশ্য ডোডোনকে আর কথা বলতে দেখা যায়নি ।ডোডোনের মতই গণেশের উপস্থিতিও নাটকে স্বল্পস্থায়ী । তারপর তারও কণ্ঠস্বর শোনা যায় নি । এটাও তাৎপর্যপূর্ণ । গণেশ শব্দের অর্থ - গণের রাজা বা নেতা ।

এই গণেশ নেতা না হলেও জনগণের একজন প্রতিনিধি তো বটেই। মঞ্চে এই সর্বহারা মানুষটি সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ উগড়ে দিয়েছে। আমলাতন্ত্র, আইনি কণ্ঠরোধ, দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যর্থতা সব কিছু নিয়েই গণেশের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রতিবাদ স্বল্পস্থায়ী। গণেশের কণ্ঠ স্তিমিত হতে হতে নিভে যায়। রাষ্ট্রযন্ত্র তার কায়েমী ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ততক্ষণে গণেশের ভূমিকা পালন শেষ। রোমেশ ও লোমেশকে সে অনুপ্রাণিত করে ফেলেছে। গণেশই নাটকের মধ্যে স্পষ্টভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলেছে। বলেছে যুক্তিবাদ ও আলোক প্রাপ্তির কথাও। সেদিক থেকে গণেশ নাটকের প্রটাগনিষ্ট বটে। ডোডোন আর গণেশের উল্লেখ নাটকে পরে না থাকলেও তারা যে শেষ পর্যন্ত মঞ্চে উপস্থিত ছিল। তা অনুমান করা যায়। কেননা, এদের নিষ্ক্রমণের কথাও বলা হয় নি। তাদের যে নিষ্ক্রমণ নেই, তার কারণ বৃহৎ সমাজ পট থেকে কেউ নিষ্ক্রান্ত হতে পারে না। তবে তারা নিরুত্তাপ হয়ে পড়ে। তাই তারা অনুপস্থিত বা ক্ষমতার কেন্দ্রের বাইরের মানুষ হিসাবে তাদের অস্তিত্ব এখানে অননুভূত।

প্রথম অঙ্কে, যেমন রোমেশ ও লোমেশ গণেশের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শেষ পর্যন্ত কথা বলে গেছে, দ্বিতীয় অঙ্কেও তেমনই ধঞ্জয় ও রঞ্জন শেষ পর্যন্ত কথা বলে গেছে। বিবিধ ইজম্, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, মানব সভ্যতার বিবর্তন, বিচার ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত জীবনের গতানুগতিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি সবই তাদের বক্তব্যের বিষয়। এসব কথাবার্তার মধ্যেই ডোডোন ঘুমে আড়মোড়া ভাঙে, নাক ডাকায়। অর্থাৎ এসব নিয়ে তার কোন চেতনা কাজ করেনা। এই সময় আকস্মিক প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণ ছড়িয়ে পড়ে। গ্রেনেড, মর্টার, রাইফেল গর্জে ওঠে। উপর্যুপরি বিস্ফোরণের মধ্যে যখন ধঞ্জয় ও রজন এগুলির জন্য পা বাড়ায়, তখনই সেই চার রঙের কৌপীন পরা চার ব্যক্তি মঞ্চের এপাশ থেকে ও পাশ কোণাকুনি প্রবেশ-প্রস্থান করে। বিভিন্ন রঙের আলোর বিচ্ছুরণ ও বিলয় ঘটে। ঐ চারজন চেঁচিয়ে ওঠে - সাবধান - ; নাটক শেষ হয়।

লক্ষণীয় , যে বিস্ফোরণ ঘটেই । সামাজিক শৃঙ্খলার একটা ভাঙন ঘটেই । এ হয়তো বিপ্লব নয় , কারণ সামগ্রিক পরিস্থিতি এতে পাল্টে যায় না । বিপ্লব খুবই কঠিন - নাট্যকার তা দেখালে বাস্তবোচিত হত না ।

ধঞ্জয় ও রজন গনেশ দ্বারা যতই উদ্বোধিত হোক - যথার্থ বিপ্লব ঘটানোর ক্ষমতা তাদের নেই । এই মধ্যবিত্ত চরিত্র দুটির পোষাক আশাকও ইঙ্গিত পূর্ণ । ধঞ্জয় কোট পরিহিত । কোট এত বেশী আঁটো যে , চিকন জেল্লা সত্ত্বেও হাস্যকর । রজনের পোষাক সমস্তই ঢিলেঢালা মধ্যবিত্তের সামঞ্জস্যের অভাব জীবনযাত্রা ও জীবনসাধনা দু'ক্ষেত্রেই- এমনটাই হয়তো নাট্যকার বলতে চান । তবুও বিপ্লব তথা আন্দোলনের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । রজন ও ধঞ্জয় সেই ভূমিকাই পালন করে । তাদের সঙ্গে শেষে লাল , নীল , হলুদ , সবুজ রঙের কৌপীন পরা , উদোম গা চারজন মানুষের দৃপ্ত আবির্ভাব নাটকটিকে একটি আলাদা মাত্রা দেয় । এর সঙ্গে মেশে নানা রঙীন আলোর বিচ্ছুরণ ও চারজনের সাবধান বানী । এটা যেন এক ধরনের খেলা । সমস্ত নাটকে প্রাতিষ্ঠানিকতার একটি স্থান রূপ রচনা করে তার বিপরীত ক্রমে সেই প্রতিষ্ঠানিকতাকে ভেঙে ফেলার একটা খেলা যেন ।

আসলে এই ধরণের নাটকের এটাই বৈশিষ্ট্য । তবে, প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলার পর তাকে আর একটা রূপ দেবার সম্বন্ধে কোন প্রত্যয় বোধের অভাবও নাট্যকারের রয়েছে । ডোডোনের রাজার পোষাক যেমন প্রয়োজনে সামরিক পোষাক হয়ে যায় - পুলিশ আর মিলিটারির আবির্ভাবে , তেমন কোনো রূপান্তরের ছবি জনতার মধ্যে নেই । আসলে প্রতিষ্ঠানের রূপ ফুটিয়ে তোলায় মলয় যতটা সার্থক , তার রূপান্তর বা ধ্বংশের চিত্রায়নে ততটা নয় ।

নাটকটির ভাষার মধ্যে কলকাতার উপভাষা যেমন আছে , তেমনই আছে তৎসম শব্দের আড়ম্বর । জম্বুক ও লোমেশের ভাষা পাশাপাশি রাখলেই তা বোঝা যায় যেমন জম্বুকের সংলাপ :'আট্টু দেকুন তালে । কতোদূর এয়েচি দেখে থ হবেন অ্যাগবার।'১৫

লোমেশ : 'ভাইসব আমার চিত্তদাহ সমগ্র মানবের পক্ষে ..... মানুষের দুর্মানবিক কু ন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ '।১৬

এছাড়া সংলাপ দীর্ঘ , পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, তত্ত্ব দ্বারা পূর্ণ বাক্যে কোনো যতিচিহ্ন নেই ।বাকপটু চরিত্রগুলো টাইপ ও একরৈখিক । আকস্মিকতা , দ্বন্দ্ব , আবেগ নয় , পুতুল চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে নিজস্ব বক্তব্যপ্রেক্ষণই লক্ষ নাট্যকারের । তবু ১৯৬৩ সালে ভারতবর্ষে যখন প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বাঁধেনি , তখন এই বিদ্রোহের আঁচ , প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার সুরটি এ রচনায় তুলে ধরার জন্য ইল্লত-এর একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে ।

২. হিবাকুষা

'হিবাকুষা' নাটকটি আরও ক্ষুদ্র । অঙ্ক বা দৃশ্য বলে কোনো নির্দেশিকা নেই । এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে । তবে মঞ্চের যে বর্ণনা আছে তাতে বাহুল্য ও অতিরঞ্জন বেশি । হয়তো নাট্যকার অতিরিক্ত তত্ত্বপ্রবণ হবার ফলেই এটা ঘটেছে। মঞ্চের মাঝখানে চৌকাঠসুদ্ধ একটা বন্ধ দরজা আড়াআড়ি ভাবে রাখা । দরজার কপাট দুটো ডানদিকের উইংসের দিকে মুখ করে খোলা যায় । খাপচা খাপচা আলো যেখানে সেখানে । ডানদিকে , একটা বিরাট টেবিলের পাশে নিচু চেয়ারে বসে আছে ষাভ । খালিগা , পরনে হাফপ্যান্ট । টেবিলে বা কোণে একটা জাহাজের চোঙ লাগানো । ষাভ বেঁটে , মোটা , প্রৌঢ় । তার পায়ে গামবুট । দুই হাঁটুতে দুটো খঞ্জনী বাঁধা । দু'হাত দিয়ে রুটি খাচ্ছে সে । খাওয়া শেষ হলে টেবিলের উপর থেকে রুটির টুকরো ও গুঁড়োগুলোকে সে ঝাড়তে থাকে । নিচে থেকে চারজন নোংরা শতচ্ছিন্ন পোষাকের হাফন্যাংটো লোক ডানদিক থেকে মাটি শুঁকতে শুঁকতে হামাগুড়ি দিয়ে মঞ্চে ঢোকে । হাত দুয়েক অন্তর ফাঁক রেখে একটা মোটা দড়িতে তাদের কোমর বাঁধা । রুটির টুকরোগুলো মেঝে থেকে খুঁটে খায় তারা , কাড়াকাড়ি করে । ষাভ তাদের হাত নেড়ে তাড়ালে তারা সরে যায় , একটু পরে আবার খেতে আসে ।

নাট্যকার তাদের আচরনে জন্তুর স্বভাব লক্ষ করেছেন । ষাভ আবার তাদের তাড়ালে তারা চলে যায় । এবার বাঁদিক থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে ঢোকে শ্বস , লম্বা চওড়া , জোয়ান। ষাভের ছেলে । কান দুটো তার বিশাল - প্রায় মুখের মাপের । মাথায় তার বিচারকদের পরচুলা । বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে কলিং বেল খোঁজে । খুঁজে পেলে বাজাতেই জাহাজের ভোঁ বাজে । ষাভ চমকে ওঠে , জাহাজের চোঙের ওপর ঝুঁকে পড়ে , হাত ঢুকিয়ে দেখে । ষাভ আবার একই ভাবে ভোঁ বাজায় । ষাভ দরজার ফুটো দিয়ে দেখে , দাঁড়িয়ে ভাবে । তারপর ফ্রেমের সামনে গিয়ে ঘুরে গিয়ে শ্বসকে দেখতে পেয়ে আনন্দে দু'হাত তুলে লাফিয়ে ওঠে , দরজা খুলে দেয় ।

এই নাটকে সাতটি চরিত্র । অর্থনীতির স্তর এখানে দুটি। ষাভ, শ্বস ঢপকে একটি স্তরে ফেলা যায় - মধ্যবিত্তের স্তরে । দড়ি বাঁধা লোকরা বিত্তহীনের দলে ।

লেলিন যাঁদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'শিকল ছাড়া তাদের হারাবার কিছু নেই।' এই দুটি স্তরের মধ্যে দ্বন্দ্ব না হলেও শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত দলটি বিত্তহীনের দলে যোগ দিয়েছে। এখানে ভিন্ন যে স্তরটি নাট্যকার উপস্থিত করেছেন তা প্রজন্মের ব্যবধান গত। পুরনো প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছে যাভ ও ঢপ। নতুন প্রজন্মের শ্বস। পিতা হিসাবে যাভ পুত্র শ্বসের প্রতি স্নেহশীল। পুত্রের জিজ্ঞাসাকাতর মননের জন্য বিশেষত ঐ সব জিজ্ঞাসার রেফারেন্সগুলির জন্য যাভ বিশেষ গর্ববোধ করে। ইতিমধ্যে ঢপ প্রবেশ করে। নিজের পরিচয় সে দেয় 'জাতীয়তাবাদী খবরকার' বলে। অর্থাৎ স্বদেশ ও স্বজাতির ঐতিহ্যের সে সমর্থক। ঢপের আগমনের পর যাভ তাকে সমর্থন করে। ঢপ বলে, আমরা গুরুজন। এবং যার বয়স বেশি, তার কথা শুনবে। ঢপ ধনী ও বিদ্বান মানুষকেও সমীহ করতে বলে। যাভ বলে, বলবানের কথা শুনতে হয়। শ্বস অবশ্য এসব কথায় মজা পায়, বলে, যার হাত পা বেশি, যার নখ, লোম - দাড়ি বেশি তার কথাও কি শুনতে হবে? লক্ষণীয়, ঢপ ও যাভকে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজের ভোঁ বেজে ওঠে। যাভ গর্বিত ভাবে জানায় 'এসব আমাদের সংস্কার'১৮

ঢপ 'জানায় - আমাদের ঐতিহ্য। আমাদের হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য'১৯ দু'জনের মধ্যে এই ঐতিহ্যের সময়কাল নিয়ে বিতর্ক শুরু হতে শ্বস নীলামওয়ালার ধাঁচে টেবিলে হাতুড়ি ঠুকে তাদের মদত দেয়। আমাদের প্রাচীনতা, রেনেশাঁস, বল্লাল সেন, সেন রাজত্ব প্রভৃতি প্রসঙ্গ তুলে খোটা দেয়। এস্টাবেলিসম্যান্টের বিরোধিতা করে লঘু ভঙ্গীতে। হয়ত সেজন্যই বাকী দু'জনের সঙ্গে করমর্দন ও নৃত্য করতেও তাকে দেখা যায়। যাভ ঐতিহ্যশালী সভ্যতার জন্য গর্ববোধ করে। তার পুরনো পন্থী, রক্ষণশীল মানসিকতাকে সঙ্গত দেয় ঢপ: বলে, 'আমাদের উন্নতি সবচে উঁচু'। ২০

শ্বস বলে, উন্নোতি; গাদা গাদা টাকা।

যাভ বলে, তালতাল সোনা।

শ্বস বলে, খেতাব।

যাভ বলে, সেলাম।

শ্বস বলে, হারেম----কুলীন-----অবিবাহিত কিন্তু স্ত্রৈণ।২১

এভাবে তিন জনের সংলাপে আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক রূপের একটা স্থূল ছবি ভেসে ওঠে । লক্ষ করবার যে, এই অংশে তিনজনই সমালোচকের ভূমিকায় । তাদের মধ্যবিত্ত চরিত্র একেবারে স্পষ্ট এভাবে, জীবনের তিক্ততার অভিজ্ঞতায় তিনজনই সমান । যান্ত্রিকতার যন্ত্রণায় তিনজনেই ক্লিন্ন। ঐতিহ্যবাদী ঢপকে বলতে হয় - 'কল্যানময় সাহিত্য আর সুস্থতাবর্ধক কবিতার আশার বানী দিন।' ২২ কিন্তু শ্বসের কথায় ত্রয়ীর ঐক্য ভেঙে যায় । সে আচমকা বলে , 'খিদে! অ্যাঁক'? ২৩

ষাভ তাকে বলে , 'এ সব ভাল নয়।' ২৪

চপ বলে , 'এ সব অসামাজিক দাবীদাওয়া।' ২৫

শ্বস অবশ্য তার স্থানে অনড় । তাকে চুপ করে থাকতে বলে দেওয়া হলে সে প্রকৃতির লীলাখেলার কথা বলে । মহান অতীত কিংবা সোনালী ভবিষ্যতের কথা বলে শ্বসকে নিরস্ত করা যায় না । সে শুধু এই ক্ষুধাময় বর্তমান ও প্রকৃতির স্বাভাবিক লীলাবিলাসকে বড় করে দেখায় । নাট্যকার ক্ষুধার সংক্রমনকেই বড় করেও দেখান । যেহেতু এই মুহূর্তে মঞ্চে সেই দড়ি বাঁধা চারজন লোক মাটি শুঁকতে শুঁকতে ঢোকে এবং ষাভ ও ঢপ হামাগুঁড়ি দিয়ে দড়ির বাড়তি অংশে তৈরী করা ফাঁসে নিজেদের গলা ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের মত করেই হামাগুঁড়ি দিতে দিতে বেরিয়ে যায় । শ্বস অবাক হয়ে এইসব দেখে । জাহাজের ভোঁ বাজতে থাকে । শ্বস জাহাজের চোঙে প্রথমে হাত ঢোকায় পরে নিজের মাথাটাই । জাহাজের ভোঁ থেমে থেমে নানান সুরে বাজতেই থাকে । মঞ্চে অন্ধকার নেমে আসে। নাটক শেষ হয় ।

'হিবাকুষা' নাটকটির অতিরঞ্জনই - এর বৈশিষ্ট্য ।নিকল বলেছিলেন, 'অতিরঞ্জন প্রহসনের ধর্ম।' ২৬

অথচ এ নাটকটি প্রহসন নয় । ষাভের পায়ে কেন গামবুট , হাঁটুতেই বা কেন খঞ্জনী বাঁধা তা স্পষ্ট নয় । মঞ্চের মাঝখানে আড়াআড়ি যে বন্ধ দরজাটি রাখা ছিল সেটি শ্বস ও ষাভের দুই পৃথিবীর একটি বিভাজক মাত্র ।

তাই ঐ দরজা খুলে শ্বসকে যাভ তার জগতে নিয়ে এসেছিল । জাহাজের চোঙ্ যন্ত্রের নির্দেশক হতে পারে , হতে পারে সুদূরের বার্তাবহও । নাটকের শেষে দেখি যাভের,ঢপের ঐতিহ্যবাদী পুরনো প্রজন্ম ক্ষুৎকাতর মৃত্তিকানিষ্ঠ জান্তব মানুষদের দলে ভিড়ে গেছে । শ্বসের যে তত্ব তাকে আত্তীকরণ করেছে । যদিও শ্বস তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে না । যন্ত্রের সঙ্গেই তার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে ।

৩. ন পুং পং

মলয় রায় চৌধুরীর তৃতীয় নাটক 'ন পুং পং' ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। আর্থার আদামভের 'লে পিং পং' নাটকের সঙ্গে এর নাম সাদৃশ্য কিছুটা রয়েছে । অ্যাবসার্ড নাটকের ইতিহাসে 'লে পিং পং' কে মাষ্টারপিস বলা হয় । লক্ষণীয় , আদামভের নাটকে দুটি চরিত্র , মলয়ের নাটকেও তাই । যদিও মলয়ের নাটকের চরিত্র দুটি মানুষ নয় । যন্ত্র এবং মানুষ ও জন্তুর সমন্বয় । আদামভের নাটকে যন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ন , ফ্লাশ লাইটের ব্যবহারও তিনি করেছেন সেখানে । দেখিয়েছেন , Man engazed in purposeless exertions , in a futile frenzy of activity that is bound to end in senility and death ২৭.ক

মলয়ের নাটকেও যন্ত্র তার ব্যাপকতায় উপস্থিত ।ফ্লাশ লাইটের ব্যবহার তিনিও করেছেন প্রচুর।'Purposeless exeretions' এবং 'futile frenzy of activity' এখানেও মূল প্রতিপাদ্য । তবে মলয়ের নাটকটি এত ছোট যে , এটিকে একটি কবিতাও বলা যায় । তদুপরি বক্তব্য ও বর্ণনার অতিরেকে ভারাক্রান্ত । সুতরাং আদামভের শৈল্পিক মূল্যের ধারে কাছেও এটিকে রাখা যাবে না । তবে হাংরিজেনারেশনের প্রতিবাদী মনোভাব ও যৌন আনুষঙ্গিকতা এখানে সুপ্রচুর । যীশুখ্রীষ্টের একটি বাণী দিয়ে নাটকের শুরু ।

যে আমার মধ্যে নেই বা সঙ্গে নেই , সে - ই আমার বিরোধী ।

(He who is not with me is against me) অন্ধকারে ফেউ - এর কান্না , ঝিঁ ঝিঁ ও তক্ষকের ডাক , ভারী জুতার চলা ফেরার আওয়াজ । এভাবে কালবেলার একটি অশুভসূচক পরিবেশ রচনা করা হয়েছে ।

মঞ্চে স্বল্প আলোয় টোরসোকে দেখা যাচ্ছে - বাঁ দিকের কোনে মুষ্টিযোদ্ধার রিঙ , উপর থেকে ঝুলছে তালিম নেবার বস্তা । রিঙের মধ্যে স্ত্রীলোকের টোরসো দেখতে মোম মোম হলেও আদতে কাঠের । টোরসো'র স্তন দুটিকে ঢাকনির মতন বোঁটা ধরে বাইরে থেকে খোলা যায় আর লাগানো যায়। টোরসো তার ইচ্ছেমত যে কোন স্তনের ভিতর থেকে বা যোনির ভিতর থেকে স্ত্রীকণ্ঠ , পুরুষ কণ্ঠ বা পশুকণ্ঠে কথা বলতে পারে । মঞ্চের অন্ধকার সরিয়ে যখন সরাসরি কটকটে রোদ্দুর নিয়ে আসা হলো তখন য়লমের প্রবেশ । য়লম একেবারে ন্যাংটো । যখন য়লম অশ্লীলতা পছন্দ করে না , তখন ক্রিকেট খেলোয়ারদের অ্যাবডোমেন গার্ড পরে । বসন্তকালে য়লমের পেছনদিকে শেয়ালের লেজ গজায় । তার দুহাতে মুষ্টি যোদ্ধার দস্তানা । ডানদিকে কমোডের উপর বসে সে ভাবনাকাতর।

এ নাটকে প্রথম সংলাপ টোরসোর। সে জিজ্ঞাসা করে যে য়লম এতক্ষণ কোথায় ছিল ? যাহোক , এরপর য়লম মুষ্টিযুদ্ধের অনুশীলন করে নানান কায়দায় । কখনও তাড়াতাড়ি, দমাদ্দম, কখনও আলতো। টোরসো কিন্তু তাকে তাচ্ছিল্য করে । বস্তাটা নীচে নেমে আসে । য়লম হাওয়ায় ঘুষি চালিয়ে নানান পায়তারা কষে । বস্তার উপর ঘুষি কসাবার জন্য তৈরী - হয় । হঠাৎ টোরসের বাঁদিকের স্তনের ঢাকনি খসে পড়ে । একটা রোমশ হতে বেরিয়ে আসে স্তনের ঘুলঘুলির ভিতর থেকে । হাতটা য়লমের গালে কষে থাপ্পর জমায় । য়লম ছিটকে পড়ে যায় । রোমশ হাত টোরসোর ভিতর গায়েব হয়ে যায় । টোরসো তাকে উঠে বসতে বলে । য়লম উঠে দাঁড়ায় । তার দুই কষ দিয়ে মধু গড়ায় । স্তনের ঢাকনিটা হাতে নিয়ে সে টোরসার দিকে এগিয়ে যায় । চেঁচিয়ে বলে সেটা সে টোরসাকে লাগিয়ে দেবে কিনা ? এবার টোরসোর ডানদিকের স্তনের ঢাকনি খুলে যায় এবং সেখান থেকে একটি ডান্ডা বেরিয়ে এসে য়লমের মাথায় পড়ে ।

য়লম মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ে যায় । টোরোসো বলে , নিরক্ষর , শালা । দু'হাতে স্তনের ঢাকনি নিয়ে য়লম উঠে দাঁড়ায় । মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায় । শুধু দুই স্তনের ঘুলঘুলি (কেননা ঢাকনি নেই) আর যোনির ভিতর দিয়ে নীল রোম্যান্টিক আকাশ দেখতে পাওয়া যায় । মঞ্চে আলো জ্বলে ওঠে । মঞ্চে য়লম নেই । কিছুক্ষণ পরে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে য়লম প্রবেশ করে । ঢাকনি দুটো মেঝে থেকে তুলে টোরসের বুকে লাগিয়ে দেয় । চারদিকে অভিবাদন করে ।

তারপর বস্তাটাকে ঘিরে নানান মস্তানি প্যাঁচ ছুঁড়তে থাকে হাওয়ায় । সব দাঁও ফসকে যায় । পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় প্রতিটি ঘুষি । য়লম হাঁপিয়ে পড়ে । ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে কমোডের উপর গিয়ে উবু হয়ে বসে গালে হাত দিয়ে দার্শনিকের মত ভাবতে বসে । পরে কিছুক্ষণ বকে । বলে ব্লাফ রাত্তিরটা থাকবো । এরপর মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায় - শোনা যায় নানাধরনের শব্দ । কাঁচের বাসন ভেঙে পড়বার , পৃথিবীর সমস্ত নেতাদের বক্তৃতাধ্বনি , ঝড়ের শিস , মাদি শেয়ালের মড়া খাওয়ার হুক্কা হুয়া আনন্দধ্বনী ইত্যাদি । টোরসোর যোনির ভিতর থেকে তীব্র সার্চলাইটের আলো মঞ্চের উপর য়লমকে খুজে বেড়ায় , খুঁজতেই থাকে , নাটক শেষ হয়ে যায় ।

নারী নামক আইডিয়াটিকে মলয় এখানে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন । তাই স্ত্রীলোকের পূর্ণাবয়ব নেই , আছে টোরসো তাও কাঠের, কিন্তু দেখতে মোমের মত কোমল । তার মাথা নেই । তার স্তন দুটিও ফাঁকা গহ্বর মাত্র । কণ্ঠস্বরেও সে কখনো পুরুষ , কখনও নারী , কখনও বা জানোয়ার । সে স্বাধীনচেতা , কর্তৃত্বপরায়ণ । যখন তখন য়লমকে ঘুষি মারতে সে দ্বিধা করেনা । তার সংলাপে আছে ,'ভালবাসা হ্যান্ডগ্রেনেড বেনজেড্রিন ডাবলিং ডিয়ার ডিয়ার'।২৭খ. টোরসো যেমন যন্ত্রসভ্যতার তৈরী, আধুনিক নারীও তেমনি এই সভ্যতার নানা অসুখে তাড়িত । পুরুষ চরিত্র ভাবনাতেও মলয়ের ধ্যানধারণা অন্যরকম ।

সুতরাং য়লমের দেহ এবং স্বভাবে মানুষ এবং জন্তুর সমন্বয় ঘটিয়েও টোরসো নামক এক যন্ত্রমানবীর থেকে তাকে সব দিক থেকেই নিকৃষ্ট করে উপস্থাপিত করা হয়েছে । মলয় বলেছেন , য়লম সবসময় অশ্লীলতা পছন্দ করেনা । মানে কখনও কখনও করে ।

তার শেয়ালের মতো লেজ , সে মুষ্টিযোদ্ধা কিন্তু ছাগলের বাচ্চার মতো লাফাতে লাফাতে রিঙের ভিতরে ঢোকে । টোরসোর প্রতিটি ঘুষিতেই সে কাৎ , একবারেও ঘুরে দাঁড়াতে পারেনা । লেখক জানিয়েছেন, য়লমের নানান মস্তানি প্যাঁচের প্রতিটি দাঁও ফসকে যায় । শুধু পৌরুষের অভাব নয় , ব্যক্তিত্বেরও অভাব রয়েছে চরিত্রটিতে । সে নানা ছন্দ , ছন্দের মাত্রা নিয়ে মাথা ঘামায় অর্থাৎ ব্যাকরণের বাইরে জেতে পারে না । বেড়াজাল ভাঙতে পারে না । তাই দুর্বল মানুষ ও জন্তুস্বরূপ য়লম পরাজিত হয় যন্ত্রমানবী টোরসোর কাছে । নাটকের শেষে তাকে দেখা যায় না ।

টোরসো হাজার খুঁজেও তাকে পায়না । যন্ত্রেরই প্রাধান্য নাটকে সূচিত হয় । সেদিক থেকে মলয় রায়চৌধুরীর 'ন পুং পং' মানুষ ও মানবতাবোধের বিপর্যয়ের নাটক । আর মানুষও তো এখানে ক্লীব । তার পৌরুষ নেই । ন পুং পং - সেরকম ইঙ্গিত দেয় । আরেক দিক থেকে মনে হয় , নাট্যকার নিজেকেই এখানে ব্যঙ্গ করেছেন । 'য়লম ' চরিত্রটির নাম মলয়েরই ওল্টানো রূপ দেখে আমাদের এরকম মনে হয়েছে।

খ . ফাল্গুনী রায়ের নাটক , চিত্রনাট্য ইত্যাদি

কালো খ্রীষ্ট

ফাল্গুনী রায়ের 'কালোখ্রীষ্ট' নাটকটি ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় । এটি আবার এত ক্ষুদ্র যে এটিকে নাটক বলতে বাধে । রচনাটির কিছু কিছু অংশে কাব্যময় ভাষাও রয়েছে । প্রতীক ও ব্যঞ্জনাকেও বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । সুতরাং সেসব দিক থেকে 'কালোখ্রীষ্ট' কে কবিতা বললেও বলা যায় । আবার ফাল্গুনী এখানে মঞ্চের কথা বলেছেন, যবনিকার কথা বলেছেন ।

দু'জন মানুষের সংলাপ , পরস্পরের মধ্যে বিতর্কের আভাস ; দর্শকদের দিকে তাকিয়ে কথা বলা , উপহাস , অট্টহাসি - সবই রয়েছে এখানে । বাস্তবতা ও বাস্তবতাকে অতিক্রম করে প্রতীক সংরচন, ঘৃণা, ক্রোধ, প্রতিবাদ উচ্ছৃঙ্খলতার যে বয়ন তাতে একে কবিতা বা নাটক দুইই বলা যায় । মলয় রায় চৌধুরীর মতো ফাগুনী রায়ের এই নাটকটিও অ্যাবসার্ড নাটকের শ্রেনীভুক্ত । কেননা এই শ্রেণীর নাটকে ''তথাকথিত শৃঙ্খলাবদ্ধ এই বিশ্বে মানুষের যে জটিলতা ও উদ্বেগ বেড়েছে তাকে কতকগুলি প্রতিমান পরম্পরায় ধরবার চেষ্টাই - ই অ্যাবসার্ডবাদীদের উদ্দেশ্য । কাজেই এই নাটকে তথাকথিত কোন প্লট বা চরিত্র নেই যার মধ্যে দ্বন্দ্ব ফুটে উঠতে পারে । এবং সেই জন্যেই প্রচলিত অর্থে নাটকীয়তাও নেই ।সংলাপে যে ভাষা ব্যবহার করা হয় তাও নাটকীয় গতির বিরোধী , অর্থহীন স্বগতোক্তি ''।২৮.

ফাল্গুনীর নাটকে এসব বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলিই বর্তমান । তবে দ্বন্দ্বের ব্যাপারটি রয়েছে । নাটকের দুটি চরিত্রেই রয়েছে । নাট্য উপস্থাপনার সাধারণ রীতির অনেকগুলিই এখানে মান্য করা হয়েছে ।তাই মঞ্চ পর্দার আড়ালে কিছু ধ্বনি শুনিয়ে তিনি নাটক শুরু কড়েছেন । এই ধ্বনির মধ্যে আছে , করাতের কাঠ চেরা শব্দ , মাঝে মাঝে সম্মিলিত কণ্ঠের উপহাস, অট্টহাসি । এরপরে পর্দা সরে যায় । সব শব্দ থেমে যায় । দৃশ্য গোচর হয় মঞ্চের মাঝখানে গোল টেবিল । টেবিলের উপরে ইতস্তত মড়ার খুলি, খুলিদের চোখের কোটরে জ্বলন্ত মোমবাতি । পাশেই রয়েছে মদের বোতল , সোডা গ্লাস । মুখোমুখি বসে দু'জন মানুষ । একজনের মুখ দর্শকের দিকে যার মাথার চুল হতে পায়ের পাতা পর্যন্ত আরবী আলখাল্লায় ঢাকা , চোখে কালো চশমা ।

অর্থাৎ একটি দীর্ঘ সাদা খোলের উপর একটি কালো চশমা নিয়ে একটি বিদঘুটে মূর্ত্তি । দ্বিতীয় ব্যক্তি যে দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে আছে সে সম্পূর্ন নগ্ন। চরিত্র দুটির উপস্থাপনার পিছনে নাট্যকারের বিশেষ পরিকল্পনা কাজ করেছে । বোধহয় , পাঠকদের সঙ্গে তিনি ইয়ার্কি করেছেন । প্রথমত ঃ এরকম দুটি আপাত বিপরীত , অস্বাভাবিক চরিত্র সৃজন । দ্বিতীয়ত নগ্ন লোকটির অঙ্গ প্রতঙ্গের উল্লেখ ও দৃশ্যগোচরতা নেই । পক্ষান্তরে সর্বাঙ্গাচ্ছাদিত লোকটির প্রতিটি অঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে । এখানেও রয়েছে অ্যাবসার্ডিটি ।

দর্শক বা পাঠকদের সঙ্গে যেন ক্রীড়া করছেন ফাল্গুনী । কারণ দর্শক বা পাঠকের কাছে দুই চরিত্রই অচেনা (stranger) থেকে যাচ্ছেন । মুখাবয়ব যেহেতু কারুরই স্পষ্ট নয় , তাই নগ্নতা বা আলখাল্লা দিয়েই তাদের চিহ্নিত করতে হবে । আবার এর মুস্কিল হল ঐ স্থানে ওরকম ভিন্ন দু'জন ব্যক্তিকেও যদি স্থাপিত করা যায় , তাহলে তাদের আলাদা করে সনাক্ত করা সম্ভব হবে কীভাবে ? সুতরাং নগ্নতা বা পোষাক , সম্মুখভাগ বা পশ্চাৎভাগ কোনোভাবেই মানুষকে চেনা যায় না । যাইহোক , এই দুটি মানুষই খুন সম্পর্কে আলোচনা করে । নগ্ন মানুষটি নিজেকে খুনি মনে করে , কালো চশমা পরিহিত আলখাল্লাধারী বলে সে - ই খুন করেছে । বলে , 'পুলিশ হিসেবে সে খাদ্য আন্দোলনের মিছিলের উপর গুলি চালিয়েছিল । শান্তি আনার জন্য , প্রশাসনের স্থিতির জন্য সেটা ছিল তার ডিউটি । তার ছোড়া বুলেটে একটা তেইশ বছরের মেয়ের দুই বুক ভরে উঠেছিল তাজা রক্তে ।' ২৯.

এসব কথা বলার সময় সে মাঝে মাঝে মদ্যপানও করে । ঐ ঘটনার পর লোকটি চাকরি ছেড়ে দেয় । জীবনবীমার দালালী শুরু করে । এখানেও ব্যঙ্গ - যে রাষ্ট্রের এজেন্ট হিসাবে অন্যের জীবন ছিনিয়ে নেয় , সেই আবার অন্যের জীবনকে বীমার আধারে সুরক্ষার দালালীও শুরু করে । হয়তো বা এজন্যই এ চরিত্রটির পোষাক দরকার ছিল । নিজের স্বরূপকে ঢেকে রাখবার জন্য দরকার ছিল । মধ্যবিত্ত মানুষের দ্বন্দ্ব , বিবেকতাড়না এবং সেন্টিমেন্টাল অভিব্যক্তি - সবকিছুই কালোচশমা, পরিহিত ব্যক্তিটির মধ্যে বিদ্যমান ।

উল্টোদিকে , নগ্ন মানুষটির কথাবার্তা দৃষ্টিভঙ্গী সোজা সাপটা । তার বাহ্য আচরণ, মুদ্রাদোষ সবই নগ্নতার মতনই যেন বেশ বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায় । সে অন্য ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞাসা করে, পুলিশি চাক্রি অত সহজে ছাড়লেন কী করে'? তারপর মদ্যপান করে, একটি খুলির চোখের কোটর থেকে জ্বলন্ত মোমবাতি তুলে ফুঁ দিয়ে নেভায় , তারপর সেটা দুই আঙুলের ফাঁকে চার্মিনারের মতো ধরে থাকে । কালো চশমা অবশ্য জানায় , তার গুলি করার কারণ মেন্টাল ডিজ অর্ডার' বলে,"সে সময় আমি জিনা লোলোব্রিজিডার একটা দারুন সেক্সি ছবির ভিতর একটা রাক্ষুসীকে হাসতে দেখেছিলুম - তার দাঁতে আমার মা'র রক্ত - আমার

নিজস্ব ভ্রূণ আমার মা'র রক্ত খেয়েই বড় হয়েছে মা'র জরায়ুতে - তবু ঐ ছবিটার ভেতরের রাক্ষুসীটার দাঁতে দেখেছিলাম আমার মা'র শরীরের মাংস টুকরো - শত শত সহস্র শিশু এবং তাদের মা'র সব - মায়েদের স্বামীরা - পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে খেয়ে চলবে , ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে অই রাক্ষুসী - ওকে মারো - ওকে মারো - এরকম মনে হওয়ায় আমি নাকি সে সময়ে গুলি ছুঁড়ে লাইটহাউসের একটা বিরাট ব্যানার তছনছ করে দিয়েছিলুম ।''৩০.

এই অংশে চরিত্রটির মনোবিকলনের মধ্যে ফ্রয়েডের ইডিপাস কমপ্লেকসই মূর্ত হয়ে উঠেছে । আছে মধ্যবিত্ত মানুষের অনুতাপ ও অপরাধবোধের আতঙ্কও । নগ্ন চরিত্রটি তাকে তা স্মরণও করিয়ে দিয়েছে । এভাবে তাদের কথাবার্তার মধ্যেই আবার ফিরে আসে উপহাস , অট্টহাসি ও নৈঃশব্দ্য । নগ্ন মানুষটি কালো চশমার মানুষটিকে একটি কূট প্রশ্ন করে । বলে , গুলিটা তো অন্য কেউও ছুঁড়তে পারত । সুতরাং খুন সম্পর্কে কিছু বলা হোক । কালোচশমার ব্যক্তিটি বলে , ''হতে পারে নিয়তির পেছনে হাঁটা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই - তবু যখন ঘটনা ফর্ম করে - আরো খোলাভাবে বললে অনেক কোষ না ফেটে হঠাৎ একটি কোষ ফেটে ভ্রূণ বেরিয়ে আসে - বেড়ে ওঠে গর্ভে , তখনি জীবন শুরু হয় , নতুন আরো জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে ।''৩১.

নগ্ন মানুষ মদ্য পান করে এবং এসব যুক্তিতর্কের ব্যাপারে তার বিরক্তি প্রকাশ করে । অসহিষ্ণুতায় তার ব্যক্তিত্বের জোর প্রকাশ পায় , '' হয় কবিতা পড়ুন , নয় আমার কথা শুনুন - আর্গু করতে আসিনি , সারগর্ভ জ্ঞান একটু দূরে থার এখন ।''৩২.

কালো চশমা পরিবেশ হাল্কা করার জন্যে বলে , 'কী বাবা, মদ খেলেই দেখছি তুমি বাচাল আর চপল হয়ে ওঠো - গাঁজাতে অত ইন্ট্রোভার্ট থাকা হয় ক্যানো ? ''৩৩.

বস্তুত এতক্ষণ প্রসঙ্গ ছিল খুন , এবার এল মাদকদ্রব্য । মদ তো ছিলই , এল গাঁজা । শুধু ফাল্গুনীর নিজের জীবনাচরণ নয়, এক্ষেত্রে আমাদের আমেরিকান ও ইংরেজ 'বিটনিক'দের কথা মনে পড়বেই ।

কেননা নগ্ন মানুষ বলে , 'আসলে , গাঁজা খেলে চামড়ার তলায় জেগে ওঠে অনেকগুলো চোখ ..... অত বেশি খোপ শরীরের ভেতর ..... এত জটিলতা , চিন্তার পিড়িং পিড়িং .....।' ৩৪.

লক্ষণীয়, কালো চশমা মাদকদ্রব্যের আলোচনায় উৎসাহী নয়, খুন বিষয়েই সে জানতে চায়। বলে, ''নার্কোটিকস নিয়ে থিওরি না করে জাস্ট টেল অ্যাবাউট মার্ডার ।''৩৫.

নগ্ন মানুষ বলে , থিওরি নয়, কেবল গাঁজাই তাকে একটা ভিশান দিয়েছে । কালো চশমা বলে তার ভিশান নেই , পেন্যানস্ আছে । এখানে বোঝা যায় যে , নগ্ন মানুষটি কল্পনাপ্রবণ, কবিতা প্রেমিক , ভাববাদী । আর কালো চশমা বাস্তববাদী , সমাজের সাধারণ মানুষেরই একজন । নগ্ন মানুষটির কথায় এরপর কালো চশমার মানুষটি আলোড়িত হয় । যখন নগ্ন মানুষটি বলে , পেট থাকলেই যেমন পেটের অসুখ , বেঁচে থাকলেই যেমন ক্ষুধা , তেমনই অপরাধ থাকলেই প্রায়শ্চিত থাকা স্বাভাবিক । ক্ষুধা শব্দটি কালো চশমার লোকটিকে উদ্দীপিত করে । বলে , ''বেড়ে বললে তো ; বেঁচে থাকলে ক্ষুধা - অ্যাঁ ? শালা খালি পেটে চাঁদের ভেতর আমি একটা চিতাকে জ্বলতে দেখেছিলুম হে ঃ।''৩৬.

তারপর লোকটা মদ খেয়ে একটা মড়ার মাথার খুলি নিয়ে তার কোটের থেকে মোমবাতি উপড়ে ফেলে , সেই গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে দেয় । এরপরই কিছু আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে থাকে । নাটকের মধ্য থেকে বাস্তবতার অন্তর্ধান ঘটে । বীভৎস ও কদর্য কিছু চিত্রকল্প ফুটে ওঠে যেন কবিতার অথবা বলা যায় , অনেকগুলি প্রতীককে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করে ফাল্গুনী গোটা পরিবেশটাই পাল্টে দিতে চান । মঞ্চের উপর এই দৃশ্য শুধু যেমন উপস্থাপনযোগ্য নয়, তেমনই যেন আবর্জনার স্তূপ স্বরূপ। অথচ ফাল্গুনী বোধহয় এখানে এভাবেই ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাঁর যে বক্তব্য তাকে ব্যাখ্যাও করতে চেয়েছেন। যাইহোক, কালোচশমার আঙুল পড়তেই শুকনো খুলি থেকে রক্ত ছিটকে এসে ছড়িয়ে পড়ে নগ্ন মানুষের যৌনাঙ্গে। আর তখন সেখান থেকে এক দুই তিন চার করে বার হয়ে আসতে থাকে সরু সরু মাংসল সুতো।

সেগুলি ক্রমে পাল্টাতে থাকে, রূপ নেয় মানুষ, কুকুর, গরু, ছাগল, শূকর ইত্যাদির অন্ত্রগর্ভনারী , অন্ডকোষ, যোনি, জরায়ুতে। ক্রমে, কালোচশমার আরবীয় পোষাকের চারপাশে জমতে থাকে রক্ত ল্যাপ্টানো বাদামী হলুদ নাড়িভুঁড়ি সব একটা জরায়ুর খোলের ভেতরে ঢুকে যায় সেই কালো চশমার কপাল সুদ্ধ মাথা। নগ্ন মানুষ টেবিলের উপর উঠে দাঁড়ায়। ক্রমে তার যৌনাঙ্গ হতে নির্গত ঐসব দ্রব্যসামগ্রীতে প্রতিটি খুলি ঢাকা পড়ে, জেগে থাকে শুধু জ্বলন্ত মোমবাতি, আর এই বিবমিষাময় পরিবেশে নগ্ন মানুষটি টেবিলে যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধভঙ্গীতে দাঁড়ায় । সঙ্গে সঙ্গে সেই সৃষ্টিশীল মাংসল সুতো তার যৌনাঙ্গচ্যুত হয়ে একটা কালো সাপে পরিবর্তিত হয়। সাপ নগ্ন মানুষটির দুই উরু, কোমর - বুক - গলা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়িয়ে ধরে ও ছোবলের ভঙ্গী করতে থাকে । নগ্ন মানুষ প্রার্থনা আর দোষ স্বীকারের সুরে কথা বলে চলে দর্শকদের দিকে চেয়ে ।

এই অংশে অনেকগুলি বিপরীতধর্মী ব্যাপার রয়েছে - যার সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না তবে লেখকের বক্তব্যের একটা গড় - আদল পাওয়া যায় । তাই বলা যায় যে , কালো চশমার হাতের ছোঁয়া পেতেই মৃত মানব শরীর থেকে রক্ত ছিটকে ওঠা অসম্ভব নয় । তার হাত যে খুনীর হাত , খুনীর হাত জীবিতদের হাতে পড়লে তো রক্ত ঝরবেই । সে যে খুনী ছিল , খুলিগুলিও ছিল জীবিত - উক্ত ঘটনা তারই ইঙ্গিত । আবার নগ্ন মানুষর যৌনাঙ্গ রক্তের স্পর্শে মানুষ ও নানা জীবজন্তুর নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি করেছে ।

রক্ত এখানে জীবনের প্রতীক ঠিকই কিন্তু সে জীবন অসম্পূর্ন , বিকৃত । মনে হয় , পৃথিবীর প্রচলিত জীবন ধারাকে ফাল্গুনী প্রবলভাবেই ঘৃণাই করতেন , তাদের স্বাভাবিক ও সুস্থ মনে করতেন না । কারণ আরও সুন্দর , সুস্থ ও মহৎজীবনের প্রত্যাশা ছিল তাঁর । কালো চশমাও বিকৃত মানুষই বটে ; তাই ঐ সব নবজাত জরায়ুর একটির খোলে তাঁর কালো চশমা ও কপালসুদ্ধ মাথাকে ঠেসে দেওয়া হয়েছে । যখনই নগ্ন মানুষটি যীশুখ্রীষ্টের ভঙ্গী গ্রহন করল তখনই মাংসল সুতোর বিকৃত ময় সৃষ্টি প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে আবির্ভাব হল কালো সাপ রূপী শয়তানের । বাইবেলের আদি শয়তান যেন । কিন্তু লোকটি তো যীশু নয় , সে কালো খ্রীষ্ট ; সুতরাং প্রার্থনা ও দোষ স্বীকার করতে হয় তাকে , বলতে হয় পুরনো প্রেমের কাহিনী , বলতে হয় প্রেমের স্বপ্নের কথা ,

এক অধরা স্বাধীনতার কথা - যা সে পেতে চায় , কিন্তু পাবেনা কোনদিনও । তার সেই সংলাপে জানা যায় সেই প্রেমিকার নামও , অনুরাধা । বোঝা যায় , সেই অনুরাধা খুন হয়েছে । কালো চশমাকে খুন করেছে সেই অনুরাধা । আবার নগ্ন মানুষের দাবী খুনী সে-ই ।

নগ্ন মানুষটির এই সংলাপে হত্যা রহস্যের কিয়দংশ যেমন উন্মোচিত (কিয়দংশ এইজন্য যে প্রকৃত হত্যাকারী কে তা বলা সম্ভব নয়) তেমনই কাব্যময়তারও এক চমৎকার প্রকাশ বিধৃত। আর আছে আবেগ , কোমলতা যা ফাল্গুনী রায়ের লেখায় সাধারণত প্রত্যাশা করা যায় না,-

> অনুরাধাকে আমি ভালোবাসি, আমাদের বিবাহ আগামি স্বাধীনতা দিবসে ঝাঁঝাঁর কাছে একটি পাহাড়ে অনুষ্ঠিত হবে ..... সাক্ষী নক্ষত্র আর অন্ধকারে আদিগন্ত উধাও পাহাড়.....আমরে দু'জন সেখানে ..... সেই অন্তহীন আকাশের তলায় - মাটির থেকে একটু ওপরে , মাটিরই উপরে পাহাড়ের বুকে নক্ষত্রের নির্জনতায় শুয়ে থাকব আবরণহীন - অশ্রুত মন্ত্র পড়বে সবুজ উপত্যকা , যে সবুজ অন্ধকারের যোনির ভেতর স্তনের ভেতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকে - এরকমই ঠিক আছে আমাদের বিবাহ - অনুষ্ঠান সম্মর্কে- আগামী স্বাধীনতা দিবসের দিন গুনছি আমরা দুজন ।৩৭.

তার সংলাপের শেষ লাইনে ' ইয়া - আই - অ্যাম - আ - মার্ডারার' বলার সঙ্গেই ভেসে ওঠে নাটকের শেষ দৃশ্য। নাটকের প্রথম দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হয় কিছুটা । কাঠ চেরা করাতশব্দ, সম্মিলিত উপহাস আর উচ্চরোল ধ্বনি তরঙ্গের মাঝে মঞ্চ উজ্জ্বল আলোয় ভরে ওঠে । সেই আলোক উদ্ভাসে মুছে যায় কালোসাপ আর মানুষ কুকুর গরু ছাগল শূকর , শূকর শাবকের অন্ত্রগর্ভনারী, পাকস্থলী, অন্ডকোষ, যোনি ও জরায়ু। আরবীয় পোষাকে সজ্জিত কালোচশমা উঠে দাঁড়ায় টেবিলে, পেছন থেকে, সমকামী আবেগে জড়িয়ে ধরে নগ্ন মানুষকে। সব শব্দ থেমে যায় । পর্দা নেমে আসে।

ফাল্গুনী রায়ের 'জরায়ু' চিত্রনাট্যটি ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। আসলে, এটিকে চিত্রনাট্যের আকারে কবিতা বলাই ভাল। নগ্নতা ও যৌনতার বাড়াবাড়ি ও রুক্ষতা থাকলেও আধুনিক সমাজ ও সভ্যতার ছবি ও সমালোচনার যাথার্থ্যের জন্যে এটিকে অগ্রাহ্য করা যায় না। জরায়ুর'র শুরু রাত্রিবেলার তারা খচিত আকাশ দিয়ে , সমাপ্তি মৃত্যুতাড়িত রক্তাক্ত পায়রাদের মাটিতে অবতরনের দৃশ্য । সৌন্দর্য ও কদর্যতার এক অদ্ভুত মিশেল ফাল্গুনী এখানে ঘটিয়েছেন । দু'একটি দৃশ্যে লেখকের কল্পনাশক্তির অভিনবত্ব স্বীকার করতে হবে। মানুষ এবং জন্তু, প্রকৃতি এবং যন্ত্র, ধর্ম এবং প্রবৃত্তি সব এখানে একাকার, প্রচলিত ধ্যান ধারণা, সামাজিকতা, সম্পর্ক রীতিনীতি কোনকিছুতেই আস্থা নেই ফাল্গুনীর, তাই প্রতিটি ব্যাপারেই প্রবল আঘাত হেনেছেন তিনি। প্রত্যেকটি বিষয়, চরিত্র, উপাদানের ও ঘটনার বর্ণনার মধ্যে একটা বক্তব্য ছড়িয়ে দেবার চাড় লেখকের অতীব প্রকট।

চিত্রনাট্যটির শুরু একটি লং শটে। রাতের তারকাখচিত আকাশ । রাতের রাজপথ, ফাঁকা ট্রামলাইন, হলুদ আলো নিয়ে ল্যাম্পপোষ্ট। এসবের উপর দিয়ে ক্যামেরা প্যান করে এসে এক জায়গায় স্থির হয়। একটা ডাকবাক্স। কালো বর্ডার শোক সূচক খামের পাশে প্রজাপতি মার্কা শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র। শব্দ; শানাইয়ের সুর এবং হরিধ্বনি। বোঝাই যাচ্ছে, মহানগরী কলকাতার একটি ক্ষয়িষ্ণু পটভূমিকায় ফাল্গুনীর রচনার শুরু । সমর সেন ও জীবনানন্দের বর্ণিত কলকাতারই একটি ভিন্নতর আধুনিক রূপ লেখক এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন । ডাকবাক্স মানুষের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম - তাই শ্রাদ্ধ ও বিবাহ দুইয়ের নিমন্ত্রণই তা বহন করে। বিবাহ এবং মৃত্যু এই মহানগরীতে , আধুনিক মানুষের জীবন এক অনিবার্য সত্য। তুল্যমূল্যও , দুইয়ে কোনো তফাৎ নেই - তাই দুটি ঘটনার আভাসকেই পাশাপাশি রাখা ।

কিছুক্ষন পরে ফাল্গুনী একই ভাবে দেখিয়েছেন, (মিড শটে) একটা ডাকবাক্স, একটা ডাস্টবিন। দেখিয়েছেন হাতপাহীন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে উঁচু দিয়ে ভেসে চলে দেয়াল ঘেঁসে , আর সেই ডাস্টবিন একটি যুবতী নারীতে রূপান্তরিত হয়ে দেয়ালের মাথার উপর দিয়ে দৌড়তে থাকে। শব্দ হিসাবে নদীর জলস্রোত, সাপের হিসহিস , কোকিলের ডাক অনুরণিত হয়।

টপঅ্যাঙ্গেল শটে দেখানো হয় ময়ূর ময়ূরীর সঙ্গম - ও হাত পা হীন মানুষের ভেসে যাওয়ার দৃশ্য । প্রত্যেকটা ল্যাম্পপোষ্ট নীচুতে নেমে আসে , ফুটপাতের উপর জ্বলে অসংখ বাল্‌ব - সমস্ত রাস্তা ভর্তি হয়ে যায় জ্বলন্ত বাল্‌বে। লং শটে দেখানো হয় একটা ছ'তলা বাড়ি হেলে পড়ে ক্রমশ, দ্রুত একটা ডবল ডেকার এসে বালবগুলোকে গুঁড়িয়ে যায়, বাল্‌বগুলো ফাটে, ডবল ডেকারও উল্টে যায়। উপরন্ত পটকা ফাটার আওয়াজও শোনা যায়। এরপরে, এতক্ষন ধরে ঘটে চলা ঘটনাবলীর একটি 'সিনথেসিস' রচনা করেন ফাল্গুনী। অবশ্য আরও কিছু উপাদানও সংযোজিত হয় । মিড শটে - দৃশ্যটির বর্ণনা এরকম :-

> শ্মশানচিতার আগুনে দেখা যায় একটা ষ্টিয়ারিং - উল্টানো ঘড়ি। একটা - হাত - পা হীন ধড় একটা চিতার সামনে এসে দাঁড়ায়। তার দুটি জলভরা চোখ। সেই চোখদুটিকে দেখা যায় সেই ডাস্টবিন রূপসীকে স্তন দিয়ে মুছিয়ে দিতে। তার (যুবতীর) নাভিদেশ হতে একটি বৃক্ষ বেড়ে উঠতে থাকে - বৃক্ষের প্রতি ডালে জোড়া জোড়া ময়ূর ময়ূরী - তলায় অসংখ্য পালক ছড়ানো - পালকের ওপর শোয়া - অধশোয়া অবস্থায় মানুষ - মানুষী শূকর শূকরী কুকুর কুকুরী সঙ্গমরত - হাতপা হীন মানুষটি বইয়ের ওপর ঝুঁকে , পড়ে শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা ।৩৮.

গীতাপাঠের আওয়াজ শোনা যায়। ফাল্গুনী দেখিয়েছেন, এই বিকলাঙ্গ মানুষটি কত অসহায়। একটা ডাকবাক্স যার অভ্যন্তরে শুধু খস্‌খস্‌ করত অন্যের চিঠিপত্র, তথ্যাদি ; যে একটি নাগরিক যন্ত্র বৈ কিছুই ছিল না - সে মানুষ হয়ে গেছে , একটি অপূর্ণ মানুষ। আধুনিক মানুষেরই সে প্রতীক, ডাকবাক্সের মত ফোঁপড়া এলিয়টের ফাঁপা মানুষ । আধুনিক যুগের ঈর্ষা ও সন্দেহের , ঘৃণার সন্তান সে। যেন মহাভারতের কদ্রুর সেই অসমাপ্ত বিকলাঙ্গ সন্তান। এই মানুষের যৌনক্ষমতা নেই , সৃষ্টিশীল হবার উপায় নেই।

মানব নিয়তির কি অসহায় ও অনভিপ্রেত পরিণতি। পরের অংশেই চিত্রনাট্যকার একটি অসাধারণ দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। "ক্লোজ শট - প্রচুর ময়ূরপুচ্ছ পোড়ে শ্মশানচিতায় - একটি জ্বলন্ত জাহাজ ডুবে যেতে থাকে সমুদ্রে। দূর হতে ভেসে আসে -save our soul (cut)"৩৯.

চিত্রনাট্যের পরবর্তী অংশে ফাল্গুনী দেখিয়েছেন , হাতপাহীন মানুষটির হাতপা গজিয়েছে । হাসপাতালে তার বাবাকেও দেখা যায় মারা যেতে । সেখানেই মধ্যবয়সী এক নার্স তার প্রতি আকৃষ্ট হয় । তার পিতার মৃত্যুর জন্য শোকজ্ঞাপন ও তার জন্য কামজ্ঞাপন নার্সটি একই সঙ্গে করতে থাকে । একদিকে মৃত্যুর আবহ , অন্যদিকে মাতৃবয়সী এই নারী - এই দুই আবর্তের মধ্যে পড়ে যায় নতুন হাত পা প্রাপ্ত মানুষটি । আবার যে ডাস্টবিন নারী আগে তাকে ভোগ করতে পারেনি অপূর্ণতার জন্য- সেও এবার লোকটির উপর অধিকার কায়েম করতে চায় । ফলে দুই নারীর মধ্যে চুলোচুলি শুরু হয় ।এভাবে চিত্রনাট্যের দ্বিতীয় অংশে hollow man কে যখন স্বাভাবিকতায় নিয়ে এলেন ফাল্গুনী , তখনও কিন্তু আধুনিক মানুষ পূর্ণতা পেলনা । এখানে সমস্যা বিচ্ছিন্নতার ।

যদিও ডাকবাক্স দুটি দূরের মানুষের যোগাযোগ মাধ্যম এখানে সেই মানুষটি কিন্তু সংযোগস্থাপন করতে পারে নি । সবাই এখানে আলাদা আলাদা সময়ের ফসল । নগরীর রাজপথে পুরুষটির জন্ম এক রূপান্তর- সে চলতে শুরু করলে ডাস্টবিনের নারীতে রূপান্তর - পুরুষটির বিকলাঙ্গতা দূর হবার সময় নার্সের আবির্ভাব । লোকটি এই দুই নারী বা দুই ভিন্ন সময়ের দুই প্রতিনিধিকে মেলাতে পারেনি । ফাল্গুনী একটি প্রতীকের সাহায্যে এ কথা ব্যক্ত করেছেন :-

> ক্যামেরা প্যান করে (মিড শটে) দেখা যায় নগ্ন পুরুষ বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে একটি দেয়ালঘড়ির দুই কাঁটাকে উপড়ে ফেলেছে ।৪০.

কাঁটা উপড়ানো গেলেও সময়কে তো বশ করা যায় না । অতএব ঘড়ি এক নাগাড়ে করতে থাকে ঢং ঢং। এরপর চিত্রনাট্যের তৃতীয় অংশ ।

রাত নেই , হাসপাতাল নেই , শ্মশানচিতা নেই, ডাকবাক্স - মানুষ , ডাস্টবিন - নারী , নার্স , চুলোচুলি - কেউ নেই ।

সকালের ঝকঝকে জ্যোতির্ময় আলোয় ট্রাম বাসে ভিড়ময় ব্যস্ত লোকের দ্রুত পা - লং শটে দেখা যাচ্ছে। স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েদের প্রাণবন্ত হাসাহাসি কথা বলার শব্দ শোনা যাচ্ছে । মিড ক্লোজ শটে দেখা যাচ্ছে দুটি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ডাকবাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে চিঠি লিখছেন । তাদের একজনের চিঠিতে লেখা আছে : 'আমার একটি ছেলে হয়েছে' ।অন্যের চিঠিতে 'রমেশ মারা গেছে ।' চিঠি দুটি ডাকবাক্সে ফেলা হয় । পাশের ডাস্টবিনে বিয়েবাড়ির বাসি খাবার , ফুল ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলে যায় একজন চাকর।

বোঝা যায়, রাতের ব্যাপারটি একটি স্বপ্ন ছিল যেন। ডাক বাক্স ডাকবাক্সেই আছে , ডাস্টবিন আছে ডাস্টবিনেই। রাতের অন্ধকারে আর দিনের আলোর মধ্যে, কলকাতায় তফাৎ অনেক। ফাল্গুনী রাত্রির ল্যাম্পপোষ্টের আলোয় অলৌকিকতার মায়া বা ভূতের গল্প শোনান নি, দেখিয়েছেন একটি দুঃস্বপ্ন। যা এই সময়ের একটি ভয়াবহ তাৎপর্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। যাই হোক, ডাস্টবিনে কুকুর, কাক, ভিখারির খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ির দৃশ্যের পাশে মোটরারোহী নরনারী যুগলের ছবি - শ্লোগানসহ লাল পতাকার মিছিল দেখিয়ে সমাজের অর্থনীতির বৈষম্যকেই প্রকট করে দেখানো হয়েছে পরবর্তী অংশে। ঐ মিছিলের শেষে একজোড়া ভিখিরি - মেয়ে ভিখিরিকে দেখা যায়। মেয়েটির রুখু খোঁপায় বাসি ফুলের মালা, শুকনো ঠোঁটে হাসি হাসি সাদা দাঁত। হঠাৎ প্রত্যেকটি দাঁত থেকে পায়রা উড়ে যায়। আকাশের দিকে ক্যামেরা প্যান করে। শব্দ শোনা যায় হাজার হাজার পায়রা ওড়ার। নিঃস্ব মানুষের এই প্রেমকে এই সমাজ ও অর্থনীতি বাঁচতে দেবে কেন ? যে প্রেম সহজ, স্বাভাবিক , অকৃত্রিম এই কৃত্রিম নগর সভ্যতা তাকে বেড়ে উঠতে দেবে কেন ? ফাল্গুনী জানেন এই বাস্তবতা। তাঁর নানা কবিতা, গল্পে সে কথা তিনি বলেওছেন বহুবার । বলেছেন এখানেও,-

টপ অ্যাঙ্গেল শট - কতকগুলো লোক অসম্ভব
লম্বা - মুখগুলো ঘোড়ার - দেহটি মানুষের - গুলি

করে পায়রা গুলোকে রক্ত ঝরাতে ঝরাতে
পায়রারা ওলট পালট খেতে খেতে নেমে আসে
মাটির দিকে।৪১.

১৯৭২ সালে ফাল্গুনী রায় রচনা করেন, 'অন্তিম জরায়ু' চিত্রনাট্যটি। এটিকে 'জরায়ু' চিত্রনাট্যেরই দ্বিতীয় পর্যায় বলা যেতে পারে। আসলে, জরায়ু আর কিছুই নয় সময়ের গর্ভ। এই বিকৃত সময়ের গর্ভ। ফাল্গুনী এই বিকৃত সময়ের গর্ভে ঘটে যাওয়া কিছু কাহিনীর ছবি এঁকেছেন মাত্র। সেই ছবি যে কার্যকারণ শৃঙ্খলায় রচিত নিটোল কাহিনী হয়ে ওঠেনি সে ব্যাপারেও তিনি ছিলেন ওয়াকিবহাল। এ কারণে এখানে একটি ক্ষুদ্র উপক্রমণিকাও রয়েছে তাঁর । তাতে লেখক জানিয়েছেন, 'অনেকসময় প্রকৃত লেখার ভেতরে মানুষেরা মিশে গেলে ফের লিখে ফেলার ব্যাপারটাই ঘুচে যায় অনেক সময় , অনেক সময় বিমূর্ত ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার ফলে মানুষ বিমূর্ত চিত্রকলা কবিতা সাহিত্য এবং বিমূর্ত চলচ্চিত্রের কাছে চলে যায় ।'৪২.

যাই হোক, 'জরায়ু' অপেক্ষা 'অন্তিম' জরায়ু অনেক বেশী সংহত একটি স্থান - বিন্দুতেই বিভিন্ন দৃশ্যগুলোকে লেখক এখানে চিত্রায়িত করেছেন। কবিতার রস ও প্রেমের বেদনাও এখানে বেশ নিবিড় । প্রথম দৃশ্যে দেখানো যচ্ছে - একটা জ্বলন্ত চিতা - চিতার চারপাশে এক দঙ্গল সুন্দরী ও কুৎসিৎ উলঙ্গ যুবতী - যুবতীদের জলভরা চোখ। দ্বিতীয় দৃশ্যে - একটা নিমগাছ - নিম গাছের পাতার ফাঁকে পূর্নিমার চাঁদ। তৃতীয় দৃশ্যে জ্বলন্ত চিতার লকলকে অগ্নিশিখা আকাশের দিকে আর যুবতীরা মাটির দিকে তাকিয়ে । চতুর্থ দৃশ্যে নিমগাছের ডালে ডালে গলায় দড়ি দিয়ে কতগুলি হাতপাহীন পুরুষ ঝুলছে, তাদের কোমড়ে ঝুলছে একটা করে টেলিভিশান সেট - তাদেরই নীচে রয়েছে উলঙ্গ যুবতীরা। পঞ্চম দৃশ্যে দেখানো হচ্ছে - ঐ নারীদের উলুধ্বনি দিতে। উলুধ্বনি দেবার সময় তাদের শরীর থেকে অসমাপ্ত কিছু ভ্রূণ মাটিতে থপ্ থপ্ করে গড়িয়ে পড়তে শুরু করে । যুবতীদের মুখ কুঁকড়ে যায়। তারা চীৎকার করে। ষষ্ঠ দৃশ্যে দেখা যায় টিভিগুলোতে সমকাম, আত্মকাম ও পশুকামের কিছু নীল ছবি।

সপ্তম দৃশ্যে উলঙ্গ যুবতী সম্প্রদায়কে জরায়ুচ্যুত ভ্রূণগুলিকে কুড়িয়ে নিতে দেখা যায়, তাদের চোখের জল শুকিয়ে আসে ও চোখের মণিগুলি সশব্দে ফাটতে থাকে। রক্তে ভেসে যায় তাদের মুখ। ফলে সুন্দর ও কুৎসিতের পার্থক্য ঘুচে যায়। অষ্টম দৃশ্যে - এবার টেলিভিশান সেটগুলোতে ভেসে ওঠে লেখাগুলো -

আমাদের খাদ্যবস্ত্র বাসস্থান চাই
আমাদের স্ত্রী চাই কবিতা চাই
আমাদের মদ চাই নির্জলা খাঁটি মদ
শিল্প আমাদের মদ
সাহিত্য আমাদের মদ
আমাদের মদ ক্ষুধার অনুভব।৪৩

নবম দৃশ্যে উলঙ্গ মেয়েরা চিতার দিকে মুখ করে বলে ওঠে, 'আমরা থিওরি চাই না, শরীর চাই। শুধু আমরা শরীর ও শরীরের থিওরি চাই।'৪৪

এই স্থানে মৃত পুরুষদের বক্তব্যকেই টেলিভিশান সেটে পরিস্ফুট করা হয়েছে। সাধারণ সামাজিক, ও সংবেদনশীল মানুষের এই আদর্শ চাহিদার সঙ্গে বাস্তববাদী নারীদের শরীরবাদের একটা সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং পুরুষ দের মৃত্যুর কারণ তারা ঐ জিনিসগুলি পায়নি বলেই - এটা যেমন অনুমান করে নেওয়া যায়, তেমনই নারীদের চোখে অশ্রুবিন্দু তাদের বাসনাপূর্তি হয়না বলে - এমনটা ভাবা যায় । দশম দৃশ্যে - জরায়ু নাটকের তত্ত্বই ফিরে এসেছে।

এরপরে ছোট একটি কবিতা শুনিয়েছেন ফাল্গুনী - 'রাস্তার মাঝখানে একজোড়া মানুষ মানুষী / মানুষ তার মানুষীকে কেন্দ্র করে পাক খায় / মানুষ তার মানুষীকে প্রশ্ন করে / মানুষী তার মানুষকে প্রশ্ন করে / মানুষ উত্তর দেয় / অথচ কেউ কথা বলে না কেবল ইঙ্গিত - / কেউ কথা বলে না কেবল চোখের ভাষা ।'৪৫.

সম্ভবত দুটি আলাদা সাইনবোর্ডের মতো নারী পুরুষের অবস্থানও দুটি আলাদা প্রান্তবিন্দুতে এবং একইভাবে তাদের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গীও আলাদা। নর - নারীর পরস্পরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়া এবং পরস্পরকে প্রশ্ন করে যাওয়ার এই পুরাতন ইতিহাসের সত্যই যেন কোনো শেষ নেই।

একাদশ দৃশ্যে - ঝুলন্ত টি.ভি গুলিতে পুনরায় ভিন্ন ছবি ফুটে উঠতে দেখা যায় - মৃত পুরুষেরা হাতপাহীন। আর একটা টিভিতে দেখা যায়, পরিবার পরিকল্পনার বিরাট পোষ্টারের তলায় দু'জন মানুষ - মানুষী বসে আছে - তাদের কোলের উপর তিনটি শিশু কাঁদছে। আরেকটা টিভিতে দেখা যায়, মানুষ উত্তেজিত, তার চুলে পাক ধরেছে, মানুষীর চুলেও পাক ধরেছে। তবে তাদের সামনে একটি উলঙ্গ কিশোর। অন্য একটি টিভিতে দেখা যায়, মানুষীর সমস্ত শরীর কঙ্কালে পর্যবসিত - শুধু দুটি চোখ জীবন্ত - সেই দু'চোখে কেবল অশ্রু। আর মানুষের দুই চোখ অন্ধ, সমস্ত শরীর কুষ্ঠাক্রান্ত। তাদের সন্তান পূর্ণ যুবক কিন্তু বুকে মেয়েদের স্তন, মাথায় মেয়েদের চুল। পিতা এবং মাতা দু'জনেই তার কাছে যৌনতা দাবী করে এবং বলতে থাকে -

আমাদের ভালবাসা ফিরিয়ে দাও
আমাদের ভালবাসা ফিরিয়ে দাও।৪৬.

আর সেই যুবতী পুরুষসন্তান উদভ্রান্ত ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। এখানে যে ভয়ংকর কুশ্রীতা, বীভৎসতা ও বিকৃতির ছবি এঁকেছেন ফাল্গুনী, আমাদের মানবিক ও পারিবারিক সম্পর্ক গুলির স্বার্থপরতা, পচন ও অধোগতির উপর ঘৃণার আঘাত হেনেছেন - তাতে আমাদের আঁতকে উঠতে হয়। অস্বস্তিবোধ হয়। কদর্যতা ও অশ্লীলতার এই চিত্রায়নকে যে শেষ পর্যন্ত মেনে নেওয়া যায়, তার কারণ ঐ মানবিক ধ্রুবপদটির উচ্চারন - আমাদের ভালবাসা ফিরিয়ে দাও। দ্বাদশ দৃশ্যে আকাশে পুর্নিমার চাঁদ এবং ত্রয়োদশ দৃশ্যে - জলন্ত চিতার নীচে উলঙ্গ যুবতী সম্প্রদায়ের কোলে তাদের জরায়ুচ্যুত অসমাপ্ত ভ্রূণপিন্ড এবং অশ্রু ভারাতুর কণ্ঠে - ভালবাসা ফিরিয়ে দেবার প্রার্থনায় চিত্রনাট্যটির সমাপ্তি ঘটেছে।

'অন্তিম জরায়ু' তে বহু কথার মধ্যে এ কথাটিই প্রধান যে এই যুগে ভালবাসার মৃত্যু ঘটেছে বা নেই । সেই ভালবাসারই জন্য কাতর ফাল্গুনী এবং এই ভালবাসা অবশ্যই শরীর নির্ভর । ভালবাসাই পারে সমস্ত অসংগতি ও কুশ্রী তাদূর করতে । ভালবাসা নেই বলেই , ঐ পুরুষরা গলায় দড়ি দিয়েছে , যুবতীদের অসমাপ্ত ভ্রূণ প্রসব হয়েছে , মানুষে পরিণত হয়েছে কঙ্কালে , মানুষ হয়েছে কুষ্ঠে আক্রান্ত , অন্ধ । তাই তো ভালোবাসা ফিরিয়ে দেবার আবেদন । সেদিক থেকে - জরায়ু র চেয়ে অন্তিম জরায়ু কিছুটা সদর্থক রচনা । অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যও বলেছেন, ''যে অপজগতে ঘুচে যায় 'সুন্দর ও কুৎসিতের পার্থক্য' (অন্তিম জরায়ু) , তার তীব্রতম অন্ধকারেও চোখে পড়ে উলঙ্গ মানুষ - মানুষীর জলভরা চোখ আর সেই মৃত মানুষদের ওপরে 'নিমপাতার ফাঁকে পূর্নিমার চাঁদ' । শোনা যায় স্তোত্রের মতো অশ্রুনিবিড় উচ্চারণ :-

আমাদের ভালবাসা ফিরিয়ে দাও
আমাদের ভালবাসা ফিরিয়ে দাও ।
এই বিশিষ্ট দৃষ্টির বিচ্ছুরণ আর উচ্চারণের অনুরণন সব প্রশ্ন ও সংশয় ডুবিয়ে দেয় ''।৪৭

ফাল্গুনী রায়ের 'মানুষ মানুষী' চিত্রনাট্যটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে । মোট পনেরোটি দৃশ্যে এটি গঠিত , যদিও সাত নম্বর দৃশ্যটি ফাঁকা রয়েছে । বিষয় , চরিত্র ভাষাভঙ্গী সব দিক থেকেই । বিমূর্ততা বা প্রতীকের তালগোল পাকানো জটও অনুপস্থিত । এখানে মূল চরিত্র চারটি । চারজনেই উচ্চশিক্ষিত ও স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত । চারজনেই বুদ্ধিজীবি । দু'জন অধ্যাপিকা, একজন শিক্ষক ও অন্যজন গ্রাজুয়েট তরুণী । এই চারজনের মধ্যে দুটি প্রজন্মকে তুলে ধরা হয়েছে । অশোক ও স্মৃতিময়ী সিনিয়র প্রজন্মের প্রতিনিধি, সুধাব্রত ও অনিন্দিতা জুনিয়ার প্রজন্মের প্রতিনিধি, অশোক পেশায় অধ্যাপক , বয়স পঞ্চাশ । স্মৃতিময়ী তার প্রেমিকা, বয়স চল্লিশ । সেও পেশায় অধ্যাপিকা । অনিন্দিতা স্মৃতিময়ীর কন্যা , সে বি .এ পাশ , বয়স একুশ । সুধাব্রত অনিন্দিতার প্রেমিক । সে শিক্ষক , বয়স তার তেইশ । সুধাব্রতের বেডরুম দিয়ে প্রথম দৃশ্যের সূচনা । সময় বেলা তিনটা ।

ঐ ঘরের দেয়ালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি, ছবির তলায় শোবার খাট । খাটের পাশে বই ভর্তি টেবিল , সেখানে জীবনানন্দের একটা বই ওল্টানো । আর একটা দেয়ালে ঝুলন্ত ঘুড়ি । দ্বিতীয় দৃশ্যে সুধাব্রতকে জীবনানন্দের একটি কবিতাংশ আবৃত্তি করতে করতে ঘরে ঢুকতে দেখা যায়। একসময় সে খাটের পাশে দাঁড়ায়, টেবিলের বইপত্র নাড়াচাড়া করে , খাটের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে মাথায় বালিশ চাপা দেয় । পরমুহূর্তেই তৃতীয় দৃশ্যে মন্তাজে অনিন্দিতার হাসি , চিবুক , ঘাড় , বুক , চোখ , ঠোঁট , ইত্যাদি দেখানো হয় । সুধাব্রত উল্টে গিয়ে পা দাপাচ্ছে । চতুর্থ দৃশ্যে অনিন্দিতাকে রজনীগন্ধা ফুল শুঁকতে দেখা যাচ্ছে ।

ফুলের দোকানে ফুলওয়ালার মিশকালো চোয়াড়ে চেহারা চোখে পড়ে দেঁতো হাসি হেসে সে অনিন্দিতার কাছে পয়সা নেয়। একটা কুকুর রাস্তা শুঁকতে শুঁকতে চলে যায় । এদিকে রজনীগন্ধার একটা গুচ্ছ সহসা সুধাব্রত'র মুখ হয়ে ওঠে । পাঁচ নম্বর দৃশ্যে দোতলা বাসের জানালায় অনিন্দিতার মুখকে দেখান হয় । ষষ্ঠ দৃশ্যে নিজের ঘরে সুধাব্রত ঘাড় নীচু করে সাদা পাতার উপর লিখে চলেছে। কবিতার কিছু লাইন, তার শরীর ঢেকে যাচ্ছে রজনীগন্ধা ফুলে ; চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পায় অনিন্দিতাকে । বলে , 'আরে তুমি । অনিন্দিতা বলে - অন্য কারুর কথা ভাবছিলে'। বলতে বলতে খাটে বসে । সুধাব্রত - হাঁ , একটা মেয়ের কথা , তার শরীরের কথা , সে কিন্তু তুমি নও - অন্য কেউ । অনিন্দিতা - (চোখে বিষাদ) কে সে সুধাব্রত - সে তোমার শরীরে থাকে, তোমার দৃষ্টির গভীরে থাকে কিন্তু সে তুমি নও অন্য কেউ ।'৪৮

অনিন্দিতা জানায় সে সুধাব্রত'র কথা কিছু বুঝতে পারছে না । সুধাব্রত জীবনানন্দের বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তার পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করে । হঠাৎ থেমে গিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে অনিন্দিতার চোখের দিকে চেয়ে থাকে , তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে । এরপর আসে অষ্টম দৃশ্য । এক টুকরো বারান্দা - সামনে বাগানের আভাস মুখোমুখি স্মৃতিময়ী ও অশোক । এদের সংলাপ থেকে জানা যায় যে, অশোকের কাছে স্মৃতিময়ী সার্ত্রের একটি বই পড়তে নিয়েছিল, সেটি আবার মেয়ে অনিন্দিতা নিয়ে তার এক বন্ধুকে পড়তে দিয়েছে । সুতরাং বইটি স্মৃতিময়ী এখনও পড়ে শেষ করতে পারেনি।

অশোক মদের বোতলটার দিকে তাকায় - বোতলটা স্মৃতিময়ীতে রূপান্তরিত হয়। খিল খিল করে হেসে উঠে কেঁপে ওঠে একটা চল্লিশ বছরের সুগঠিত নারী শরীর । সেতার বাজতে থাকে জোরে , হঠাৎ সব থেমে যায় । শুধু কানে আসে ঘড়ির টিক টিক । দেখা যায় ঘুরন্ত পাখা , শূন্য আরাম কেদারা । ক্যামেরা অনেক উঁচুতে উঠে যায় । ফের অশোক ঘুরে দাড়ায় , বইটা চোখে পড়ে , তুলে এনে রেখে দেয় বুকশেলফে । বলে ওঠে , you bloody civilization ।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দেয়, দপ করে জ্বালায় এবার । আসলে , এই দৃশ্যে প্রৌঢ় অশোকের নিঃসঙ্গতা , অসহায়তা ও হতাশার একটি পূর্ণ চিত্র ফাল্গুনী অঙ্কণ করেছেন । অজস্র বইয়ের জগতে এক প্রৌঢ় অধ্যাপকের শূন্যতার ছবিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । হয়ত মদ্যপান - এর কারণ হতে পারে, নাও পারে । স্মৃতিময়ীর সঙ্গে তার যথেষ্ট দূরত্ব - একদিকে সম্পর্ক ও বয়সের অন্যদিকে মানসিকতারও। স্মৃতিময়ী এখনও তরুণীর মতো হাসতে পারে , কিন্তু বিরক্ত অশোক তার সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না । সেতারের বাজনা সহসা থেমে যায়। সব থেমে যায়। অসহিষ্ণু অশোক সভ্যতাকেই গালিগালাজ করে। ঘড়ির টিক টিক, ঘুরন্ত পাখা , শূন্য আরামকেদারা এবং অশোক - একাকার। সে সভ্যতাকে গালি দিয়ে নিজেকেও কি ধিক্কার জানায় ?

ত্রয়োদশ দৃশ্যে স্মৃতিময়ীকে দেখানো হচ্ছে । তার ঘরে । টেবিল ল্যাম্পের আলোয় স্মৃতিময়ীর মুখ । পরীক্ষার খাতা দেখার ক্লান্তিতে মুখ ভরে আছে । আশেপাশে ছড়ানো ছিটানো পরীক্ষার খাতা , লাল পেন্সিলে নম্বরের দাগ । স্মৃতিময়ী উঠে দাঁড়ায় , এগিয়ে যায় দেয়ালের দিকে - সেখানে ফটোগ্রাফে স্বামীর সঙ্গে তার ছবি । প্রথম ফোকাসটা স্মৃতিময়ীর ছবির উপর স্মৃতিময়ীর শরীর - 'শরীর হঠাৎ লম্বা হতে থাকে , চুল বেড়ে যায় তরতরিয়ে , বুক ফুলে ওঠে বিরাট বেলুনের মতো , চোখের মণিদুটো বড় হয় - ছবির স্মৃতিময়ী - হাসছেন শান্ত বনলতা সেন - চোখ ।'৪৯

দ্বিতীয় ফোকাস অশোকের ছবির উপরে । সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিময়ী ছিটকে সরে আসে , তার বসন বিস্রস্ত হয়ে যায় , সে খাতাগুলো আঁকড়ে ধরে । কারন 'অশোক খালি গা , বুকভর্তি লোম , সেখানে স্মৃতিময়ী লাজুকমুখ ।'৫০

অশোকের মধ্যে বন্যতার প্রভাব - যা দেখে স্মৃতিময়ী আঁতকে ওঠে । এরপর ফাল্গুনী দেখাচ্ছেন যে স্মৃতিময়ী এগিয়ে গিয়ে , ক্রমে ছবির ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে সে গীন্সবার্গ, কেরুয়াক পড়ে । স্মৃতি বলে, "কেন , অনিন্দিতা তো কাম্যু , কাফকা , বেদান্তদর্শন সবকিছু নিয়েই নাড়াচাড়া করে"। অশোকের মতে অধিকাংশ মেয়েই নীহার গুপ্ত বা আশাপূর্না দেবীর পাঠিকা। স্মৃতি বলে যে, অশোকের ইন্‌ফারেন্স তো ভুলও হতে পারে । তাছাড়া অশোক পড়ায় ছেলেদের কলেজে , একালের মেয়েদের ব্যাপার স্যাপার তার তো জানার কথা নয় । তবে কি সে ইদানীং মেয়েদের সঙ্গেও মিশছে । স্মৃতির কণ্ঠে এসব উচ্চারণের সময় থাকে লঘুতার আঁচ। অশোক উত্তরে বলে, 'ইদানিং নয় , আজীবন বলতে পারো । স্মৃতি - (হেসে উঠে) বাব্বা , ডুবে ডুবে এত জল খাওয়া হচ্ছে - কে সে নারীরত্ন শুনি ।'৫১

অশোক - "সে তুমি কিন্তু তুমি নও , সে তোমার শরীর , তোমার মন , কিন্তু ঠিক তুমি নও , অন্য কেউ " - এখানে অশোকের কণ্ঠে নবীন প্রেমিক সুধাব্রতেরই প্রতিধ্বনি । ফাল্গুনী দেখিয়েছেন , নারী সম্পর্কে পুরুষদের ধারণা সব প্রজন্মেই এক, অপরিবর্তিত । বস্তুত , ফাল্গুনীর এই নারীভাবনা নারী সম্পর্কে প্রচলিত রোম্যান্টিক রহস্যময়তারই দ্যোতক । এই চিত্রনাট্যের আর একটি কৌতুককর ব্যাপার হল,রবীন্দ্রচেতনার স্বীকৃতিদান।যে হাথরি প্রজন্ম এবং তাঁদের কুলবর্ধন ফাল্গুনী আধুনিক কবিদেরও নানা সময় নানাভাবে আক্রমন করেছেন- সেই কবি শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে গ্রহিষ্ণু হয়েছেন। এর প্রমাণ নবম দৃশ্য থেকে শুরু হচ্ছে। ঐ দৃশ্যে পর্দা অন্ধকার। উদাত্ত কণ্ঠে গান ভেসে আসে - 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো / সেই তো তোমার আলো/সকল দ্বন্দ্ববিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো/সেই তো তোমার ভালো। ' । ৫২

পর্দার এক কোণে পাশাপাশি দুটো নক্ষত্র । গানের সঙ্গে নক্ষত্রদুটো পর্দার মাঝখানে - ক্লোজ - শট - দুটি চোখের তারা , সম্পূর্ন চোখ । আলো ঝাপিয়ে পড়ে পর্দায় । ছেঁড়া গেঞ্জি, আধময়লা লুঙ্গি পরা সুধাব্রতের মুখে সম্রাটের হাসি , গানটি ক্রমশ আস্তে হয় । সুধাব্রত এগিয়ে যায় ঘরের কোণে - ঢাকাচাপানো থালা। সুধাব্রত ঢাকনা তোলে, শূন্য থালা - খাবার নেই। এবার সে পাঞ্জাবীটা পরে নেয়। এখানে পর্দার মাঝখানে যে দুটো চোখ ফাল্গুনী দেখিয়েছেন - সে দুটি কার চোখ ? তারা কি সুধাব্রতেরই দুটি চোখের প্রতিভাস ? নাকি এই চোখ দুটি রবীন্দ্রনাথের ? কীসের ক্ষুধা আলোকিত ও জ্বলন্ত ঐ চোখ দুটিতে ? সৌন্দর্যের নাকি বিশ্বগ্রাসী ভোগবাসনার ? কীসেরই বা তেজদীপ্তি সুধাব্রতের মধ্যে ? কেননা তার মুখে সম্রাটের হাসি!

এরপর ক্যামেরা ঘুরে যায় দশম দৃশ্যে । সেখানে দেখানো হয় অনিন্দিতার ঘর অনিন্দিতা বিছানায় উপুর হয়ে শুয়ে আছে । সেখানে সুধাব্রতের ঠোঁট , মুখ , চোখ হাসি , সম্পূর্ণ শরীর ভেসে ওঠে । দেখানো হয় অনিন্দিতার মুখ ; সে ঠোঁট কামড়াচ্ছে তারপর বালিশে মুখ গুঁজছে । একাদশ দৃশ্যে আবার সুধাব্রত'র ঘর । সে ঘরে ঢোকে হাতে এক ঠোঙা মুড়ি নিয়ে , খেতে খেতে আবৃত্তি করে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা -

'তুমি মোরে দিয়েছ কামনা / অন্ধকার অমা রাত্রি সম / তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম / মিলাইয়া স্বপ্ন সুধাসম /'৫৩ .

পরে আবৃত্তি থামায়, মুড়ি খায় ঘর থেকে বার হয়ে যায়।ফাঁকা ঘর , দুটো আরশোলা ফড়ফড়িয়ে চলে যায় , সুধাব্রত'র কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত - 'আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন / তোমাতে করিব বাস / দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস ' ।৫৪

গান শেষ হলে সিগারেট ধরায় । এভাবে সুধাব্রত'র প্রেমভাবনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্যের রোম্যান্টিক ভাবনাকে মিলিয়ে দেন ফাল্গুনী । দেখান , সুধাব্রত'র মধ্যে প্রেমের ভাববাদী প্রেরণা কিভাবে ক্রিয়াশীল এবং অনিন্দিতার মধ্যে শরীর নির্ভর বাস্তবতার ।

দশম দৃশ্যের নিবিড় পাঠ তো সেরকমই বলে । রবীন্দ্রনাথও তো নারীপুরুষের প্রেম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ জাতীয় একটি ধারনারই সূচনা করেছিলেন । বলেছিলেন , 'পুরুষ প্রেমের আইডিয়া'র সাধনা করে , আর নারী রিয়ালের ।'৫৫

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শশী - কুসমের প্রেমে শশীর মুখ দিয়ে বলিয়ে ছিলেন, 'শরীর , শরীর তোমার মন নাই কুসুম' ? ৫৬.

দ্বাদশ দৃশ্যে অশোকের ঘরে চলে যায় ক্যামেরা । একরাশ ধোঁয়া (সম্ভবত সিগারেটের) ছেড়ে আরাম কেদারা থেকে উঠে পড়ে অশোক । টেবিলে হুইস্কির বোতল , মাংসের বড়া , আলমারি - ঠাসা বই, সোফা কৌচ, বুকশেলফ । ঘড়িতে রাত একটা । আশ্চর্য শূন্য চারপাশ, শূন্য খাট ,শূন্য আরাম কেদারা । বুকশেলফ থেকে সে একটা বই তুলে নেয় । চারিদিক বই বই , সার সার বই , অশোকের চশমা আঁটা শূন্য চোখ - সে পায়চারি করে , বই খসে পড়ে হাত থেকে । একটা বইকে ক্যামেরায় প্রকট করে তোলা হয় (existentialism and humanism : Jean Paul Sartre) বইটা মাড়িয়ে, অনিন্দিতা ডাক দেয় মা - মা - ; বিরাট প্রান্তরে, শাদা রোদ্দুরে উঁচু কালো পাহাড় গুহা থেকে বেরিয়ে আসে স্মৃতিময়ী ও অশোক । বন্য চেহারা দু'জনের, গা ভর্তি লোম অশোকের, মুখভর্তি দাড়ি , আদি মানুষ - মানুষী দু'জন। আলোর ভিতর দাঁড়িয়ে তারা আলিঙ্গন ও চুম্বন করে । এরপর চতুর্দশ দৃশ্যে অশোককেই শুধু দেখানো হয়, তার ঘরে স্মৃতিময়ী ও অশোকের সেই পুরনো সংলাপ শোনান হয় - 'বাব্বা , ডুবে ডুবে এত জল খাওয়া হচ্ছে - কে সে নারীরত্ন শুনি - সে তুমি কিন্তু তুমি নও , তোমার শরীর , তোমার মন কিন্তু তুমি নও । অন্য কেউ ।'৫৭

মন্তাজে আসে স্মৃতিময়ীর হাসি , পৃষ্ঠদেশ ইত্যাদি । লক্ষণীয় , স্মৃতিময়ী অশোককে তুলে আনছে ছবির ভিতর প্রবেশ করে । তবে বর্তমানের অশোক কি তার কাছে অবাস্তব ? আদিমতায় ফিরে যাবার জন্য যে যৌবন দরকার তা কি এখনকার অশোকের মধ্যে অনুপস্থিত ?

সেই জন্যই কি দ্বাদশ দৃশ্যে অশোকের নিঃসঙ্গতা , শূন্যতা ও অসহিষ্ণুতাকে দেখানো হয়েছিল ? নর - নারীর সম্পর্কের সূত্র যে আদিযৌনতা তাই তো এই রচনার প্রতিপাদ্য । কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী প্রৌঢ়ের সেখানেও এক সমস্যা । সে সমস্যা রোম্যান্টিক অতৃপ্তি ও অনুসন্ধিৎসার । তাই অশোক এমন এক নারীর কথা বলে - যে তার স্ত্রী নয় - 'সে তুমি কিন্তু নও, তোমার শরীর তোমার মন। কিন্তু তুমি নও, অন্য কেউ'। আবার ফাল্গুনী এও দেখিয়েছেন যে , স্মৃতিময়ীর ফটোগ্রফের ভিতর প্রবেশ করা একটা ঘোর মাত্র । দুঃস্বপ্নের মতো , চেতনা হারিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনীর নরকদর্শনের মতো । ৫৮

কেননা পরের দৃশ্যে অনিন্দিতা বলেছে যে, তার মায়ের সংজ্ঞালোপ ঘটেছিল । যাইহোক , পঞ্চদশ দৃশ্যে আবার সুধাব্রতের ঘর দেখানো হচ্ছে । যেখান থেকে চিত্রনাট্যের শুরু সেখানে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই তার পরিসমাপ্তি । সেদিক থেকে এর কাহিনী বিন্যাসকে বৃত্তাকার বলা যায় । এবার সুধাব্রতের ঘরে রেডিও বাজে । সেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতেরই কলি -'বল গোলাপ মোরে বল , তুই ফুটবি সখী কবে ?' ৫৯

ঘরে মুখোমুখি সুধাব্রত - অনিন্দিতা। অনিন্দিতা 'বলে জানো, মা কালরাত্তিরে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন'।সুধাব্রত - অনেক রাত অব্দি খাতা দেখেন , সেই জন্য হয়তো ।অনিন্দিতা - 'কী জানি , আজ কীরকম খিটখিটে মেজাজ , বুঝতে পারছি না ।'৬০

এরপর অনিন্দিতা সুধাব্রত'র খুনসুটি ও প্রেম নিবেদনের মধ্য দিয়ে চিত্রনাট্যের সমাপ্তি ঘটে ।চারটি চরিত্রকে নিয়ে 'মানুষমানুষী' চিত্রনাট্যে ফাল্গুনী একটি প্রেমেরই আখ্যান গড়েছেন । প্রবীন প্রজন্মের প্রেমটি সার্থকতা পায়নি , কারণ তাদের সেই বয়স এবং পরিস্থিতি নেই । ফলে প্রবীন অশোক শূন্যতা , নিঃসঙ্গতা ও ক্রোধকেই আঁকড়ে ধরেছে । আর উত্তর - ফাল্গুনী, স্মৃতিময়ী আপন লিবিডোর অচরিতার্থতায় উন্মাদ না হলেও দুঃস্বপ্ন মথিত আতঙ্কে অচৈতন্য হয়ে গেছে । মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে তার।

উল্টোদিকে তরুণ প্রজন্মের সুধাব্রত ও অনিন্দিতার রোম্যান্টিক প্রণয় সার্থকতার দিকে গেছে। বয়সের সুবিধা তারা পেয়েছে। যদিও সুধাব্রত'র বুকে রোম্যান্টিকতার অসুখ বিদ্যমান। সামগ্রিক ভাবে ফাল্গুনীর নাটক বা চিত্রনাট্যের মধ্যে দুটি জিনিস প্রকট । মার্টিন এস্‌লীনের ভাষায় The sense of metaphysical anguish at the absurdity of the human condition ও A similar sense of senselessness of life , of the inevitable devaluation of ideals.৬১

তাছাড়া প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে যেমন চাচাছোঁলা যৌনতার রুক্ষতা আছে , তেমনই রয়েছে প্রতীক ও চিত্রকল্পের কাব্যিকতা । সাধারণ ভাবে মনে হয় , এতে তাঁর নাটকের ভাষা বেপথু ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । আসলে তা নয় । কারণ The plays of the theatre of the Absurd are primarily intended to convey a poetic image or a Complex pattrern of poetic images ; they are above all a political form। ৬২ .

তথ্য সূত্র ঃ

১. মলয় রায়চৌধুরী , ইল্লত , নাটক সমগ্র , কবিতীর্থ প্রকাশনী , কলকাতা , ১৪০৫ পৃ:১৪ ।

২. তদেব পৃ : ১৪ ।

৩. তদেব পৃ : ১৫ ।

৪. তদেব পৃ : ১৬ ।

৫. তদেব পৃ : ১৭ ।

৬. তদেব পৃ : ২২ ।

৭. তদেব পৃ : ২৬ ।

৮. তদেব পৃ : ২৮ ।

৯. তদেব পৃ : ৩৫ ।

১০. তদেব পৃ : ৩৭ ।

১১. তদেব পৃ : ৩৮ ।

১২. তদেব পৃ : ৩৮ ।

১৩. তদেব পৃ : ৩৮ ।

১৪. তদেব পৃ : ৩৮ ।

১৫. তদেব পৃ : ১৭ ।

১৬. তদেব পৃ : ২৮ ।

১৭. মলয় রায়চৌধুরী , হিবাকুষা , নাটকসমগ্র , কবিতীর্থ প্রকাশনী , কলকাতা , ১৪০৫ পৃ : ৬২ ।

১৮. তদেব পৃ : ৬২ ।

১৯. তদেব পৃ : ৬২ ।

২০. তদেব পৃ : ৬৩ ।

২১. তদেব পৃ : ৬৩ - ৬৪ ।

২২. তদেব পৃ : ৬৫ ।

২৩. তদেব পৃ : ৬৫ ।

২৪. তদেব পৃ : ৬৫ ।

২৫. তদেব পৃ : ৬৫ ।

২৬. Allardyce Nicoll , The theory of Drama , Doaba House, London , 1974 , page = 214 ।

২৭ক. Martin Esslin, Arthur Adamov : The curable & measurable / The theatre of Absurd , Pelican Books , Britain , 1968 Page 113 ।

২৭খ. মলয় রায়চৌধুরী , নপুংপং , নাটকসমগ্র , কবিতীর্থ প্রকাশনী , কলকাতা ,
১৪০৫ পৃ : ৭১ ।
২৮. উজ্জল কুমার মজুমদার , সাহিত্যের রূপরীতি , প . ব . রাজ্য পুস্তক পর্ষদ , কলকাতা , ১৯৮৫ , পৃ : ১৫০ ।
২৯. ফাল্গুনী রায় , কালো খ্রীষ্ট / আমার রাইফেল আমার বাইবেল , আলিপুরদুয়ার , জলপাইগুড়ি , মনচাষা , ২০০২ পৃ : ৮৯ ।
৩০. তদেব পৃ : ৯০ ।
৩১. তদেব পৃ : ৯০ ।
৩২. তদেব পৃ : ৯০ ।
৩৩. তদেব পৃ : ৯০ ।
৩৪. তদেব পৃ : ৯০ ।
৩৫. তদেব পৃ : ৯০ ।
৩৬. তদেব পৃ : ৯০ ।
৩৭. তদেব পৃ : ৯০ ।
৩৮. ফাল্গুনী রায় , আমার রাইফেল আমার বাইবেল , মনচাষা , আলিপুরদুয়ার, ২০০২ ,পৃ :৯৫ ।
৩৯. তদেব পৃ : ৯৬ ।
৪০. তদেব পৃ : ৯৭ - ৯৮ ।
৪১. তদেব পৃ : ৯৯ ।
৪২. ফাল্গুনী রায় , অন্তিম জরায়ু , আমার রাইফেল আমার বাইবেল , মনচাষা , আলিপুরদুয়ার , ২০০২ ,পৃ : ১০৬ ।
৪৩. তদেব পৃ : ১০৭ ।
৪৪. তদেব পৃ : ১০৮ ।
৪৫. তদেব পৃ : ১০৮ ।
৪৬. তদেব পৃ : ১০৯ ।

৪৭. তপোধীর ভট্টাচার্য , উত্তর লেখ / আমার রাইফেল আমার বাইবেল, মনচাষা, আলিপুরদুয়ার, ২০০২ ,পৃ : ১০৯ ।

৪৮. ফাল্গুনী রায়, মানুষ মানুষী, আমার রাইফেল আমার বাইবেল , মনচাষা, আলিপুরদুয়ার, ২০০২ ,পৃ : ১০১ ।

৪৯. তদেব পৃ : ১০৪ ।

৫০. তদেব পৃ : ১০৪ ।

৫১. তদেব পৃ : ১০২ ।

৫২. তদেব পৃ : ১০২ ।

৫৩. বুদ্ধদেব বসু , বন্দীর বন্দনা , আধুনিক বাংলা কবিতা , এম . সি . সরকার কলকাতা , ১৯৮০ পৃ : ১৬৬ ।

৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / মায়ার খেলা , রবীন্দ্র রচনাবলী , ৪র্থ খন্ড , প . ব . সরকার , ১৯৮৭ পৃ : ১৪৮ ।

৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / নারীর উক্তি ও পুরুষের উক্তি / রবীন্দ্র রচনাবলী , প . ব . সরকার , ১৯৮০ পৃ : ৩৩৯,৩৪১ ।

৫৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পুতুল নাচের ইতিকথা, প্রকাশ ভবন, কলকাতা ১৩৯২ পৃ : ৯৪ ।

৫৭. ফাল্গুনী রায় , মানুষ মানুষী , আমার রাইফেল আমার বাইবেল , মনচাষা , আলিপুরদুয়ার , ২০০২ ,পৃ : ১০৫ ।

৫৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , চন্দ্রশেখর / বঙ্কিম রচনাবলী , পাত্রজ পাবলিকেশন , কলকাতা , ১৯৮৩ , পৃ : ৩৫৬ ।

৫৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / রবীন্দ্র রচনাবলী , চতুর্থখন্ড , প . ব . সরকার , ১৯৮৭ পৃ : ৫২ ।

৬০. ফাল্গুনী রায় , মানুষ মানুষী , আমার রাইফেল আমার বাইবেল , মনচাষা , আলিপুরদুয়ার , ২০০২ ,পৃ : ১০৫ ।

৬১. Martine Easlin , The Theatre of the Absurd , pelican books , Britain , 1968 Page 24 ।

৬২. Martin Esslin , Absurd Drama , Penguin , Britain , 1980 – Page : 13 ।

চতুর্থ অধ্যায়

সার্বিক মূল্যায়ন ও উত্তর কালের উপর প্রভাব

হাংরি জেনারেশান আন্দোলনের পর কমবেশী ৪৪ বছর পার হয়ে গেছে । ইতিমধ্যেই ঐ আন্দোলনের শরিক অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন । কেউ কেউ লেখা ছেড়ে দিয়েছেন । অনেকেই হাংরি আন্দোলনের নির্মোক ছাড়িয়ে অর্জন করেছেন নিজস্ব ধরনের অভিজ্ঞান । ভিন্ন পত্রিকা ও গোষ্ঠীতেও চলে গেছেন দু'একজন । এক কথায় সংঘ ভেঙে গেছে । বাংলা ভাষা ও সাহিত্যও ইতিমধ্যে নানা বাঁক নিয়েছে । প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা দিয়ে হাংরিরা সাহিত্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন । কিন্তু প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার রেশ এখন বাংলা সাহিত্য থেকে উঠে গেছে । এখন তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য পত্রেও সব শ্রেণীর , সব অঞ্চলের , সব মতাদর্শের লেখকদের স্থান দেওয়া হয় । উল্টো দিকে , ছোট পত্রিকা বা লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোও পাল্টে গেছে ।কলেবরে, বিষয়বস্তুতে , প্রকাশভঙ্গীতে , লেখক সূচিতে তারা যে কোনো বাণিজ্যিক পত্রিকার প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে । সর্বত্র এখন সমন্বয় ।

যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার যে অভিযোগ একদা হাংরি সাহিত্যের সম্পর্কে প্রবল ছিল - অন্যদের ক্ষেত্রে, আজ যেন তা কোনো ব্যাপারই নয় । যৌনতা নগ্নতা , কুশ্রীতা এখন সাহিত্য , শিল্প , চলচিত্র , সংবাদপত্র ও দৈনন্দিন জীবনে জল হাওয়ার মত সচল । সেদিক থেকে এই মুক্ত বানিজ্য ও মুক্ত সংস্কৃতির খোলা হাওয়ায় অস্পৃশ্য না ভাবারই কথা ।তবে হাংরিদের যৌনতা বাণিজ্যিক নয় । যৌনতা তাঁদের বিষয়ও নয়, শুধুই আক্রমণের একটি অস্ত্র ।

তবু সাধারণ ভাবে আজও হাংরি সাহিত্যের নিন্দার বিষয় এবং প্রদূষণের দায়ে অভিযুক্ত । আসলে , এঁদের রচনাগুলিকে সামগ্রিক ভাবে না পাঠ করার জন্য যেমন এটা হয়েছে , তেমনই আগে থেকে এঁদের লেখা সম্পর্কে একটা সংস্কার লালিত হয়ে আসছে ।

অনেক সময়ই ইতিহাসের চেয়ে মিথকে গুরুত্ব দিই আমরা । তার উপর যদি ঐতিহাসিক তথ্যগুলোর দুষ্প্রাপ্যতা ঘটে । হাংরিদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে । তাই হাংরি সাহিত্য ও ইতিহাসের পর্যালোচনা দরকার । প্রসঙ্গত বলা যায় যে , ক্ষীণভাবে হলেও এই এই আন্দোলন নানা স্থানে , নানা ভাবে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া শুরু করেছে । যেমন , ১৯৮৮ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ অষ্টম উজ্জীবনী পাঠমালায় হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সম্পর্কে একটি বক্তৃতা সভায় সভাপতি ছিলেন তৎকালীন বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় , আর বক্তা ছিলেন মলয় রায়চৌধুরী ।

২০০৩ সালের ৫ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃপক্ষ তাদের সভাঘরে মীর মশাররফ হোসেন স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করেন । তাতে বিষয় ছিল 'বাংলা কবিতার পালা বদল কৃত্তিবাস থেকে হাংরি জেনারেশন'। স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা আকাদেমির সচিব সনৎ কুমার চট্টোপাধ্যায় । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এই নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা দেন কবি উৎপল কুমার বসু । বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিক পবিত্র সরকারও সভায় উপস্থিত ছিলেন । এছাড়া , জানুয়ারি ১৯৯৯ সালে আকাদেমির মাসিক আলোচনা পত্রিকায় হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলনের রিভিউ করা হয় । আলোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে এই আন্দোলনে উত্তর - আধুনিকতার লক্ষণও অনুমান করেন । ৩

পরে এই গ্রন্থটিরই আলোচনা ২০০০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে দেশ পত্রিকায় বার হয় । সেখানে আলোচক সুধীর চক্রবর্তী লেখেন ,- 'বাংলা সাহিত্য সমাজে হাংরি আন্দোলন একটা ইতিহাসের অংশ অথবা একথাও ঠিক যে , হাংরিদের লক্ষ বা সিদ্ধি যাইহোক , তাঁদের কলম বেশ শক্তিশালী '। ৪

এসবই যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের মূল্যায়নে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই । কিন্তু মূল্যায়নের সূত্রগুলোর কিছুটা বিস্তার প্রয়োজন । হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের মূল্যায়নে দুটি দিক দেখা দরকার । একটি হচ্ছে এঁদের সাংগঠনিক । অন্যটি হচ্ছে শিল্প দৃষ্টির ব্যাপার । দুটি ক্ষেত্রেই তাঁরা কী করতে চেয়েছিলেন এবং কী করতে পেরেছিলেন তা বিচার্য ।

আন্দোলনের বহুকাল পরে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও সাহিত্যের প্রাণশক্তি আজ কতটা প্রাসঙ্গিক তারও অনুসন্ধান প্রয়োজন । একটা সাহিত্য আন্দোলন কতটা ফলপ্রসূ হয় তার দুটি উদাহরণ 'সবুজ পত্র' ও 'কবিতা' রেখে গেছে । চলিত গদ্যের যে আভিমুখ্য চালিত করেছিল সবুজপত্র সেখান থেকে বাংলা গদ্য আর পিছন ফিরে তাকায় নি । একই ভাবে কবিতা পত্রিকা বাংলা কাব্যে যে আধুনিকতার স্থান করে দিতে পেরেছিল তাতে সন্দেহ নেই । কুড়ি ও ত্রিশের দশকের অন্যান্য বাংলা কবিতার ধারাগুলো কিন্তু গন্তব্য পায়নি কোনো ।

হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সম্পর্কেও একটা সাধারণ ধারণা এই যে , তা ছিল একটা সাময়িক আলোড়ন । নেহাৎ তথাকথিত অশ্লীলতা ছড়িয়ে কিংবা পুলিশী ধরপাকড়ের উত্তেজনা হেতুই এই আন্দোলনের অস্তিত্ব অনুভূত হয়েছিল । কিন্তু সত্যি কি হাংরি জেনারেশন আন্দোলন কয়েকটি বছরের সীমায় পরিকীর্ণ শুধু ? এর কোন উত্তর নেই ? সে উত্তর যাবার আগে, প্রথম আবির্ভাব কালেই হাংরি আন্দোলন সমকালীন বাংলা সাহিত্যকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছে তার পরিচয় নেওয়া যাক । হাংরি জেনারেশন বুলেটিন প্রকাশিত হবার আগে বাঙালী তরুণ কবি সমাজে 'কৃত্তিবাসে'র প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী । কৃত্তিবাসের শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা উৎপল কুমার বসুরা অল্প কিছুদিনের জন্যে হাংরি জেনারেশন বুলেটিনে লিখেওছিলেন । তারপর নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা ।

একটা কারণ যদি পুলিশের ভয় , তো অন্য কারণ আদর্শগত। ১৯৬৫ সালে কৃত্তিবাসের বিশতম সংকলনে সম্পাদক বলেছিলেন যে, হাংরিদের মতো কোনো আন্দোলনে তাঁরা বিশ্বাস করেন না । তাঁরা বিশ্বাস করেন না । অথচ হাংরিদের প্রভাব কৃত্তিবাসকে ইতিমধ্যেই সংক্রামিত করতে শুরু করেছিল । এ বিষয় এক কৃত্তিবাসীর সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়,-

> অ্যালেনরা আসার পরে ১৯৬৩ তে প্রকাশিত কৃত্তিবাস এর ষোড়শ সংখ্যায় যেন রাতারাতি বদলে গেল বাংলা কবিদের লাজুক চেহারা । ভাষা , প্রকরন , এমনকী লিখন ভঙ্গিমাতেও দেখা দিল এক প্রবল নতুনত্ব ।

স্বভাবনম্র , স্থিতধী প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় এনে ফেললেন সঙ্গম, আরশোলা, ইঁদুর, মাকড়সা, এমনকি ফ্রয়েডকেও ।.....বীট কবিদের প্রভাব খুবই স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল , যেমন অস্থায়ী হয়েছিল হাংরি জেনারেশনের সাময়িক মত্ততা । (কৃত্তিবাস এবং কৃত্তিবাস , সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত)।৫

এখানে বলা দরকার যে ঐ সময় বীট এবং হাংরি জেনারেশনের মধ্যে একটা সম্পর্ক রচিত হয়েছিল । বীট এবং হাংরিকে তখন থেকেই এক ভাববার একটা চলনও গড়ে উঠেছিল । তবে সেটা যে ঠিক নয় তা আমরা পরে আলোচনা করব । আসলে, 'কৃত্তিবাসের' ষোড়শ সংখ্যা থেকেই ঐ পত্রিকার অনেক কবির ভাষা পাল্টে যায় । সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা বলেছেন । এরকম আরও আছে । যেমন ,শংকর চট্টোপাধ্যায় । যিনি লিখতেন-

যাত্রা শেষ তোর হল , জনপদে গির্জার গুহায়
হৃদয়ে অতৃপ্ত পাওয়া , অমৃত লগ্নের বেলা যায় - ৬ .

তিনিই লিখলেন -

ঘৃণা বা সমতা দিয়ে খালাসীটোলায় যাই , পারুলের বাড়ি
শেষদান ভুল করে নিজেকে লুকিয়ে আমি হত্যাকারী সাজি।৭

এমনকি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত লেখেন , 'আমি মানুষের পায়ের কাছে কুকুর হয়ে বসে / থাকি তার ভেতরের কুকুরটাকে দেখব বলে।' ৮

হাংরি আন্দোলনের প্রবল বিরোধী এই দুই কবির রচনাতেই যখন অজ্ঞাতসারে হাংরিদের শব্দ ও ভাবানুষঙ্গ এসে গিয়েছিল তখন অনুমান করা যায় বাকিদের রচনায় ব্যাপারটা আরও কত ব্যাপকতা পেয়েছিল ।

আরও একটা ব্যাপার দেখা গেল । এতকাল নতুন কোনো পত্রিকা বার হলে এবং তাতে সাহিত্য নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা থাকলেও আন্দোলন শব্দটিকে বিশেষণ বা অভিপ্রায় হিসাবে জুড়ে দেওয়া হত না । কিন্তু হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সংঘটিত হবার পর 'শ্রুতি' ও 'এই দশক' পত্রিকা তাদের প্রথম সংখ্যাগুলি থেকেই আন্দোলন শব্দটিকে জুড়ে দেয় । মলয় রায় চৌধুরীর অনুসরনে পুষ্কর দাশগুপ্ত 'শ্রুতি' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই কবিতা সম্পর্কে তাঁদের কিছু সূত্র জুড়ে দেন । বক্তব্যে অবশ্য মলয়দের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেন তিনি । লেখেন , বর্তমান কালের কবিদের আন্দোলন এবং চরিত্র পৃথিবীর কাব্য ঐতিহ্যের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত । ৯ এখানে আন্দোলন শব্দটি লক্ষণীয়।'শ্রুতির' প্রথম সংখ্যাটি বেরিয়েছিল ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে । ১৯৬৬ সালে মার্চ মাসে বেরোয় 'এই দশক' পত্রিকার পরিবর্তিত নতুন রূপ । সেখানে পত্রিকাটিকে বলা হয়েছে , 'শাস্ত্রবিরোধী ছোটগল্পের মুখপত্র এবং সমকালীন সাহিত্য আন্দোলনের দিগদর্শন ।' ১০

পরবর্তী কালে 'শ্রুতি' পত্রিকার সাহিত্য চর্চা 'শ্রুতি আন্দোলন' এবং 'এই দশক' পত্রিকার সাহিত্য চর্চা 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন' রূপে আখ্যাত হয়েছিল । বলা দরকার , 'শ্রুতি আন্দোলন' কবিতার প্রকরণগত পরীক্ষা নিরীক্ষাতেই সীমিত ছিল । বিষয়, জীবনবোধ, সামাজিক ও রাজনৈতিক তরঙ্গগুলিকে উপেক্ষা করে শুধু কবিতার ছন্দ , আকার ও বস্তুররূপ নির্মাণ করে আন্দোলনের প্রাণ সঞ্চার হয় না । প্রকাশভঙ্গীর একটা বিশেষ ক্ষমতা এতে প্রকাশ পেলেও , জীবনের সংরক্ত উত্তাপ , সংঘর্ষ ও বেদনা তাতে সজীব হয়ে ওঠেনা। বস্তুনির্ভরতা হয়তো জীবনের একটা দিক , কিন্তু ভাবজীবনের দ্বন্দ্বও চাই । জীবনের উদ্বেলতা নিয়েই তো আন্দোলন । সুতরাং 'শ্রুতি আন্দোলন' আজ বিস্মৃতিতে চলে গেছে । শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলনের ও প্রকৃতি ও পরিণতি একই। উপরন্তু শাস্ত্রবিরোধী লেখকেরা দেশ, আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃত, উল্টোরথ পত্রিকায় সমান্তরালভাবে লিখে আন্দোলনের স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারেন নি । অতীন্দ্রিয় পাঠকের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য,-

> হাংরিরা যেমন সাহিত্যের বিষয়কেই দুমড়ে মুচড়ে দিতে চেয়েছিল এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা

তাঁদের আমদানী করতে হয়েছিল ;'শাস্ত্রবিরোধী ও শ্রুতি'র লেখকেরা কিন্তু বিষয়ের , কোন গুরুত্বই দিতে চাইলো না । আঙ্গিক ও ভাষার চর্চাই ছিল তাঁদের লক্ষ ।১১

হাংরিদের আন্দোলনের সমসূত্রে , হাংরি আন্দোলনের বিভাজন পর্বে ১৯৬৭ সালে 'ধ্বংসকালীন আন্দোলন' নামে আরও একটি সাহিত্য আন্দোলন সূচিত হয় , সাতখানি সংকলনের প্রকাশের পর মাঝপথে 'সাম্প্রতিক' পত্রিকা মেনিফেস্টো ছেপে এরকম একটি আন্দোলনের ঘোষণা করলো । শুধু তাই নয়, ১৯৫৭ সালের আবির্ভূত 'কবিপত্র' পত্রিকাকেও সহযোগী করে নিল তারা । অভিজ্ঞতা , বিশুদ্ধতা ও অকৃত্রিমতাকে কবিতার আদর্শ করা হল । এই আদর্শের মধ্যেই বা নতুনত্ব কী ? বাস্তবে দেখা গেল পবিত্র মুখোপাধ্যায় , প্রভাত চৌধুরী , কানন কুমার ভৌমিকের কবিতার মধ্যে হাংরি কবিদের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে । এ ব্যাপারে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণেরই একটি অংশকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা যাক -

"ধ্বংসকালীন কবিতা - এই শিরোনামে ক সংখ্যক কবিতা ইবলিশের আত্মদর্শন - পবিত্র মুখোপাধ্যায় । শুরুটাই ছিল -

হাড়ি কাঠে মাথা পেতে খচ্চরের বাচ্চা শুয়ে আছি
তুই শালা যোনিদ্বারে মাথা ঠুকে হাফাচ্ছিস গর্ত থেকে নেমে
আমাকে ইবলিশ বলে সেজদা করিনি অবিশ্বাসী ।

তেরো পৃষ্ঠার কবিতাটিতে কোথাও দাড়ি কমা সেমিকোলন বাক্যের শেষে ব্যবহার করা হয়নি , শুধু প্রশ্নচিহ্ন ছিল । প্রভাত চৌধুরীর খ সংখ্যক কবিতা -

মৃতপ্রায় আলোগুলো গর্জন করছে ভীষন ক্রোধে ফুঁসে উঠেছে
অন্ধকারের কালো ঘাম টিকটিকির জিভে চেটে খাওয়ার সঙ্গে

আমি মেফিস্টোফিলিস শয়তানের দূত
বিছানায় সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটছি .....

গ সংখক কবিতার কানন লিখলো -

সব শেষে অন্ধকার থেকে নেমে এলো
এক গুপ্ত বিদ্যুৎ ঝলক
সমস্ত আকাশ চিরে গেল
নির্জন অপারেশন ঘরে
ঠান্ডা গলানো রক্ত
লিঙ্গ জঠরে ধারণ করলেন সর্বজ্ঞ .....”১২

এসব থেকে বোঝা যায় সমকালে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন পূর্ববর্তী ও সমকালীন পত্র পত্রিকার সাহিত্য চর্চাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কি ভাবে সাহিত্য চর্চা হবে শুধু সেই রূপরেখা রচনা নয়, অন্যদের সাহিত্যের বিষয় ও প্রকাশ ভঙ্গীকেও হাংরিরা সংক্রামিত করে চলেছিলেন। এটা হাংরিদের একটা বিরাট সাফল্য বলতে হবে। হাংরিরা এটা পেরেছিলেন, কারণ সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও ভাঙনের ভয়াবহতাগুলোকে হাংরিরা ধারণ করতে পেরেছিলেন। হাংরিদের ইস্তাহারে ও সাহিত্যকর্মে যুগের অভিজ্ঞতা ও অস্থিরতাকে মুদ্রিত করতে পেরেছিলেন। হয়তো এ কারনেই রাষ্ট্রযন্ত্রও সতর্ক হয়েছিল - এঁরা কোনো অতিবিপ্লবী কিনা, পুলিশী অভিযানের কারণও হয়তো সেটাই। বাংলাভাষার আর কোনো সাহিত্য আন্দোলনে এ রকম সর্বাত্মক আগ্রাসী আক্রমণ দেখা যায় নি। একমাত্র হাংরিরাই সাহিত্য থেকে রাজনীতি ধর্ম থেকে অশ্লীলতা, আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা প্রভৃতিকে শিরোনাম করে ১ থেকে ১০ পৃষ্ঠার বুলেটিন বিলি করেছেন। যেমন, সাহিত্য কর্মে, তেমনই ঐ বুলেটিন গুলিতে ঐ বিষয় গুলি সহ, প্রেম, রোম্যান্টিকতা, সমাজ, প্রভৃতিকে প্রবল ভাবে আক্রমণ করা হয়েছে।

তারা নানা প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে মুখোশ , চিঠি ইত্যাদি পাঠিয়েও আক্রমণ করেছিলেন । শুধু কলমের আঁচড় নয় , সাহিত্য বলতে তাঁরা বুঝেছিলেন , একটি সামগ্রিক জীবন পদ্ধতি । মলয়ের ভাষায় তাঁদের সাহিত্য ও জীবনের লক্ষ 'সর্বগ্রাস'। আবার সাহিত্যকে সমাজের সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত করে বিচার করার কথা মার্কসবাদও বলে ।মার্কসীয় সাহিত্য শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ছবি ও দ্বন্দ্ব মেলে । লক্ষণীয় , হাংরি জেনারেশন সাহিত্যেও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের কথা আছে । শৈলেশ্বর লিখেছিলেন ,

> অধঃপতিত ভারতবর্ষের সন্তান আমরা । অর্থহীন শূন্যতা পরিবেশের সন্তান আমরা । বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের মধ্যে আমাদের জন্ম । শোষণ হত্যা ও ধর্ষনের মধ্যে আমাদের বৃদ্ধি ।.....দাসত্বের অতীতকে অস্বীকার করবার সময় আজ সুবিধাবাদীদের মুখোশ খুলে দেবার সময় আজ । ভোগ নয় , ত্যাগ করতে শিখেছিল ভারতবর্ষের মানুষ ; শিখেছিল নাচার হয়ে , শেখানো হয়েছিল তাকে । উৎপাদনের চাবিটি যাতে চিরকাল নিজেদের জিম্মায় থাকে নিজেদের ভোগের পথ যেন কাঁটায় ছেয়ে না যায় , তারই জন্য আয়োজন এই ত্যাগব্রতের ।১৩

তিনি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন, মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন, বুর্জোয়াদের বিরোধিতা করেছেন । লিখেছেন , 'ভারতবর্ষে বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান - বিরোধী নন কর্মাসিয়াল সাহিত্যের জন্ম দিয়েছে হাংরি জেনারেশন '।১৪

তবে মার্কসবাদী সাহিত্য প্রতিবাদ, বিশ্লেষণ ও সমাধান এই তিনটি স্তরের যে বিন্যাস থাকে হাংরিদের মধ্যে তা নেই ।

এঁদের সম্পর্কে দেবেশ রায় লিখেছিলেন ,

> আমরা বুঝতে পারিনি স্বাধীনতার পর প্রায় দুই দশক ব্যাপী বঞ্চনা আর মূঢ়তার বিরুদ্ধে অধৈর্যে অস্থির এই লেখাগুলো আঘাত করতে চাইছে এই পুঁজি সমাজের গায়ে ভিতে ..... রাজনীতির নকশালপন্থার সঙ্গে বাসুদেব সুভাষের লেখার (হয়তো সমগ্র হাংরি জেনারেশনের) দার্শনিক মিল আছে। সামাজিক ভাবে এই দুটি আন্দোলনেরই ভিত্তিভূমি নিম্নবিত্ত সমাজের হতাশা , ক্লান্তি আর অধৈর্য। আর কর্মপ্রণালীর দিক থেকে এই দুটো আন্দোলনেরই পদ্ধতি স্বতোপ্রণোদনার ওপর নির্ভর করে প্রচলিত ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা এনে ইতিহাসের দিক থেকে নকশাল পন্থা যেমন রাজনীতিতে তেমনই সাহিত্যেও হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়া, ক্রিয়া নয়।১৫

এ কথা খুবই সত্য যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন ক্রিয়া নয় , তা প্রতিক্রিয়া মাত্র। হাংরিরা লক্ষের দিক থেকে শ্রেণীমুক্তির মার্কসীয় আদলটি গ্রহ করেন নি। এখানে স্মরণে আনা প্রয়োজন যে, ছাত্রজীবনে শৈলেশ্বর, বাসুদেব দু'জনেই বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

মলয়ও প্রথম যে গ্রন্থটি লিখেছেন বলে জানিয়েছেন , তার নাম - মার্কসবাদের উত্তরাধিকার । হয়তো এসব কারণেই এঁদের হাতে যৌনতাও শেষ পর্যন্ত তীক্ষ্ম প্রতিবাদের সমার্থক হয়ে উঠেছে । হাংরিরা দুটো প্রধান কাজ করেছিলেন । এক - ব্যক্তির অসহিষ্ণু অস্তিত্বের প্রকাশ । দুই - ঐ প্রকাশের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । ফলে শ্রেণী সংঘর্ষ বা অর্থনৈতিক রূপান্তরের ছবিটি আসে নি । তবে সাবঅলটার্ন সমাজের ছায়াটি বাংলা সাহিত্য প্রলম্বিত হয়েছে । শৈলেশ্বরের ভাষায় -

> এই সভ্যতার কাছে আমরা উপজাতি, অন্ত্যজ, ও ছোটলোক ।কিন্তু আগামী ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে ছোটলোকদের আনন্দ সঙ্গীতই ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত থাকবে ।১৬

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের মূল্যায়নে এ কারণে বাস্তবতার দিকটিকেই বেশী গুরুত্ব দিতে হয়। বাস্তবতা এবং প্রত্যাঘাত এই দুটি মেরুর মধ্যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন অবস্থিত। মলয় বলেও ছিলেন, 'যুদ্ধ পৃথিবীর মুখ বদলে দেয় না। বদলায় মানুষের মুখ, নিজের ও নিজের চতুর্দিকের ইমেজ তার মধ্যে যেমন ভাবে পুষ্ট হয়'।১৭

হাংরিরা নিজের ও নিজের চতুর্দিকের ইমেজকেই তাঁদের লেখায় পুষ্টি দিয়েছিলেন। আসলে হাংরিরা কোনো অবক্ষয়ের স্রষ্টা নন, এক বিশেষ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের সন্তান। তাঁরা যতটা না কালের স্রষ্টা, তাঁরও চেয়ে বেশী কালের কণ্ঠস্বর। ভারতবর্ষে তাঁদের আবির্ভাবে পটভূমিটিই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য কবি, সাহিত্যিকরা কালের যে স্পন্দন অনুভব করতে পারেন নি, হাংরিরা তা পেরেছিলেন। কিংবা অন্যেরা কালচেতনাকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনের পটে স্থাপন করেছিলেন, আত্মজৈবনিক রোম্যান্টিকতায় স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিলেন; কিন্তু হাংরিরা কলুষিত কালের করালগ্রাসে হাঙরের ঢেউয়ে লুটোপুটি খেয়েছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন হাংরিদের আবির্ভাব কালে ভারত বর্ষের স্বাধীনতার বয়স চৌদ্দ বছর। স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছরে মলয় ও শৈলেশ্বরের বয়স আট, পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় তাঁদের বয়স চার।

প্রদীপ চৌধুরী মন্বন্তরের বছরেই জন্মান। পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও তার পুনর্গঠণ কালে ভারতের দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট - আমাদের জীবনে এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। জন্ম থেকে নবযৌবন প্রাপ্তির কালে হাংরি তরুণ কবি - লেখকরা ঐ সব অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন, দর্শক ছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরে ব্রিটিশ ও ভারতীয় নেতাদের স্বার্থপরতা, বিকৃতি; নতুন দেশীয় শাসকদের ব্যর্থতা ও হঠকারিতার অনেক অভিজ্ঞতা-ই তখন তাঁদের তরুণ চোখের সামনে। এ সব অভিজ্ঞতার ছবি ত্রিশের কবিদের মধ্যেও ছিল। বিশেষতঃ, জীবনান্দ দাশ ও সমর সেনের কবিতার মধ্যে। জীবনানন্দ সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যেও আদর্শের মর্মরধ্বনি অনুভব করেছিলেন। সমর সেন ডুবে গিয়েছিলেন তীব্র সিনিসিজমের মধ্যে। হাংরিরা আদর্শকে যেমন পরিত্যাজ্য ভেবেছেন তেমনই সিনিক তিক্ততায় নীরব হয়ে যান নি। তাঁরা চীৎকার ও উল্লাসের কলরোলে মেতেছেন। ইয়েটস, এলিয়ট প্রমুখের যে আধুনিকতার ছায়া ত্রিশের প্রভাবশালী কবিদের নির্ভর ছিল - আধুনিকতার সেই আদর্শকেও হাংরিরা মান্য করেন নি। শৈলেশ্বর লিখেছিলেন, 'আধুনিকতার শবদেহের উপর উল্লাসময় নৃত্যের নামই হাংরি জেনারেশন। হাংরি সাহিত্য হাংরি আন্দোলন'। ১৮

এটা ঠিক যে, আধুনিকতা একটি ঔপনিবেশিক ধারণা হলেও, আমাদের দেশে উত্তর ঔপনিবেশিক পর্যায়ে তা জাঁকিয়ে বসেছিল - হাংরিরাই প্রথম তা প্রকাশ্যে, সবলে অস্বীকারের ঘোষণা করেন। তাই হাংরিদের সাহিত্য আদ্যন্ত নাগরিক চেতনা বহন করে না। কখনও কখনও তা গ্রাম্যতারই বাহক হয়ে ওঠে। পরিশীলিত রুচিবোধ ও কৌম সমাজের রীতি নীতি মান্য করার ব্যাপারটি হাংরিদের কাছে সেই জন্য নিরর্থক। এ প্রসঙ্গে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যগুলিকে পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় -

> আধুনিকতার এই বিরোধিতা কি উত্তর আধুনিকতার দিকে যাত্রা' ? অন্যত্রও (শৈলেশ্বর) বলেন,- কোনো রকম আধুনিকতাকে আমি স্বীকার করিনা। এ সময়ের উত্তর আধুনিকের কলরোলে মনে হয় তবে কি সেই ১৯৬০, -

> এর দশকেই এখানে এসে গিয়েছিল আধুনিকের বিসর্জন, উত্তর আধুনিকের সূচনা। ..... কেন্দ্র না থাকা বাস্তববাদের বিপ্রতীপে যাওয়া - এ রকম সব লক্ষণের মধ্যে ইদানীংয়ের পোষ্ট মডার্নকে যদি কেউ পান, তাহলে খুব দোষ দেওয়া যায় না।১৯

আবার কেন্দ্র না থাকা বাস্তবতার ধরণটি হাংরিরা সমকালের প্রেক্ষাপটে থেকেই যেন কুড়িয়ে নিয়েছিলেন। নবলব্ধ স্বাধীন ভারতের প্রশাসন সিভিল সমাজ ও তার অর্থনীতিও ছিল একটি দিশাহীন নৌকোর মতো। দ্বিখন্ডিত ভারতের ত্রিখন্ডিত চেহারা (ভারত-পশ্চিমপাকিস্তান-পূর্বপাকিস্তান) একটি উপমহাদেশের মত। একই দেশ শরীকী জ্ঞাতির মতো পারস্পরিক কলহে মত্ত। তিনটি স্থানেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উদ্বাস্তুর স্রোত। তার মধ্যে সামন্ততন্ত্রের পতন, বণিক সমাজের উত্থান, দেশীয় ধনতন্ত্রের অভ্যুত্থান একটি কিম্ভূতকিমাকার সমাজের বিন্যাস ঘটায়। সুতরাং ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু মিশ্র অর্থনীতির ঘোষণা করেন।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমেরিকার সঙ্গে যেমন পাকিস্তানের তেমনই ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার মিত্র সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গান্ধীবাদী নেহেরুকে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠণের সংকল্প ঘোষণা করতে হয়। অথচ দেশীয় পুঁজিপতিরা ধনতন্ত্রই জাঁকিয়ে বসায় ফলতঃ শ্রমিক আন্দোলন, রাজনৈতিক সংঘর্ষ ভারতে নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে ওঠে। আমাদের সরকারের কিছু করার থাকে না।

ইতিমধ্যে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির জন্ম হয়েছে। তাঁরা প্রথম থেকেই ছিল নেহেরু ও কংগ্রেস বিরোধী। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁরা অংশ নেয় নি। বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারকেই সমর্থন করে সোভিয়েত রাশিয়ার লবিকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিল। তার নাম দিয়েছিল জনযুদ্ধ। তাঁদের স্বপ্ন ও আদর্শ ছিল মার্কসবাদ, শোষিত সর্বহারার মুক্তি। সমাজবাদী সোভিয়েত রাশিয়া তাই কম্যুনিষ্টদের চোখে ধ্রুবতারা। কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতিও তাদের সমর্থন। কিন্তু ১৯৫৫ সালে সহসা কম্যুনিষ্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে দ্বন্দ্ব সূচিত হল।

সাধারাণ ভারতবাসী, যাঁরা রাজনীতি সচেতন তাঁরা সবাই এবার বিভ্রান্ত। কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্ব নিয়ে তাঁদের আশাভঙ্গ আগেই শুরু হয়েছিল। এবার আর্ন্তজাতিক কম্যুনিষ্ট নেতৃত্ব নিয়েও তাঁদের স্বপ্নভঙ্গ হতে শুরু করল। এর উপর ১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করে বসল। সুতরাং অস্থিরতা, নৈরাশ্য, অনাস্থা ছাড়া ভারত বাসীর সামনে আর রইল না কিছুই। ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণ যেমন একবাস্তবতা, ১৯৬২ সালে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের অভ্যুদয়ও তেমনই এক সাংস্কৃতিক বাস্তবতা।

১৯৬৪ সালে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির বিভাজন দেখিয়ে দিয়েছিল যে আদর্শগত কারণের চেয়েও নেতৃত্বের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সুবিধাবাদিতা একটি সংগঠন ভেঙে যাওয়ার পিছনে অধিক কার্যকরী। ১৯৬৪ সালে পুলিশী মামলার পর হাংরি জেনারেশন আন্দোলনও ক্রমবিভাজনের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে যে, আদর্শগত কারণে নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও একে অন্যকে অতিক্রমের দ্বৈরথ ও অহং-ই একটি সাহিত্যিক জোট ও আন্দোলনকে পূর্ণতা পেতে দেয় না। ১৯৬৬ সালে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হবার কালে আমাদের দেশে প্রবল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মন্দা'র সূচনা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে তিন বছরের অর্থাৎ ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত কাজ (PLANNING) স্থগিত রাখা হয়। শিল্প ক্ষেত্রে তাই ব্যাপক মন্দা দেখা দেয়। অনেক কলকারখানা লক আউট ঘোষণা করে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষ ফুটপাতে এসে দাঁড়ায়। এর উপর দেখা দেয় খরা। সরকার সঠিক খাদ্যনীতি গ্রহণ করতে পারে না। ভুল খাদ্যনীতির কারণে সারা দেশে ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা যায়। খাদ্যের আন্দোলনে মানুষ নানা জায়গায় পথে আন্দোলনে নেমে পড়ে। বসিরহাটে খাদ্য আন্দোলনে ১২ বছরের বালক নুরুল ইসলাম পুলিশের গুলিতে মারা যায়। আবার ব্যাপক এই খাদ্যাভাবে গ্রামের প্রান্তিক মানুষ চলে যায় নগরে, মহানগরে। সেখানে ফুটপাতে তারা আশ্রয় পায়। মোট বওয়া, মাদকের চোরাচালান দেওয়া, মেয়েদের নিষিদ্ধ জগতে পা বাড়ানো কোনো বড় ব্যাপার থাকে না আর। মূল্যবোধ, সুস্থতা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেনীতে একটা স্তরে শূন্যতায় নেমে যায়। আশাবাদ যেন হয়ে ওঠে অলীক অভ্রপুস্প।মলয় রায় চৌধুরী এই পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে যে, আদর্শের মৃত্যু প্রকৃতির মৃত্যু ব্যক্তির আত্মপরিচয়ের মৃত্যু, জ্ঞানের মৃত্যু অর্থাৎ কিছুই আর জীবিত থাকছে না।

সবকিছু শেষ। এই সব কিছু শেষের পটভূমিতেই হাংরিদের আবির্ভাব। সুতরাং মার্কসবাদী বাস্তবতার উজ্জীবনী স্তরটিকে তাঁদের সহিত্যে লক্ষ করা যায় নি। হাংরিরা মূলতঃ সমকালের অস্থিরতা ও নৈরাশ্যের ভয়াবহতাকে ক্রোধ ও যৌনতা দিয়ে আঘাত ও অতিক্রমের চেষ্টা করেছেন। আগুনের তাপ ও ছাই গায়ে মেখে নিয়েছিলেন - আগুনকে নয়, আগুনের ছবিকে নয়। তাই খাদ্য আন্দোলনের প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই, জঠরের ক্ষুধার প্রকাশ নেই; আছে যৌন ক্ষুধার। কাকদ্বীপ, তেলেঙ্গানা, বিহারে গমকলের শ্রমিকদের ধর্মঘট, গুজরাটে দুধ সমাবায়ের দুর্নীতি এবং ঐ সব ক্ষেত্রে পুলিশী দমনের ছবিগুলি এখানে চিত্রায়িত হয় না। নকশাল বাড়ি আন্দোলন হাংরি সাহিত্যে সত্তর দশকেও ছাপ রেখে যায় না কোনো। উত্তাল গণনাট্যের জোয়ারে এতটুকু প্রভাবিত হন না তাঁরা।

সমকালের বস্তুগত উপাদানগুলি তাঁরা এড়িয়ে যান বা অন্য ভাষায় যৌন ক্রোধে রূপান্তরিত করতে চান। অনেক ক্ষেত্রে মনে হয়, বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে তাঁরা একমাত্র প্রতিষ্ঠান ও সৌন্দর্যবোধের আদলটি ছাড়া বুর্জোয়াদের কোনো ক্ষতি পারেন নি। আসলে হাংরিরা ফ্রয়েডকে স্বীকারই করে নিয়েছিলেন। তবে ফ্রয়েডিয় যৌনতার সঙ্গে হাংরিরা মিশিয়েছিলেন সমপরিমানে বিদ্বেষ ও ঘৃণা। আবার আলবেয়র কাম্যুর আত্মকেন্দ্রিক বিদ্রোহবোধও তাঁদের প্রভাবিত করেছে। হয়তো এ কারণেই মলয়ের আন্দোলন নামক মেনিফেস্টোর শুরুতে কাম্যুর একটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। শিল্প এবং বিদ্রোহ সমার্থবাচক ও মানবীয় অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত - পংক্তিটির মমার্থ এরূপই ছিল। (Art and rebellion will only die with the death of last man on earth - Albert Camus) ।

শৈলেশ্বরও তো বলেছিলেন, কবি শব্দই বিদ্রোহবাচক। ফ্রয়েডের অনুসরণ করে অবদমন থেকে যেমন মানবীয় যৌনতাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন হাংরিরা, তেমনই যৌনতার মধ্যে রুক্ষতা ও কদর্যতাকেই প্রত্যেক্ষীভূত করে - বুর্জোয়াদের যৌন ব্যবসাকেও মূল্যহীন করে দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা। হাংরিদের যৌনতা প্রণয় সম্ভাষন নয়, রুক্ষ গালিগালাজ মাত্র।

নূতন তারুণ্যে বিশৃঙ্খল ভারতবর্ষে চূড়ান্ত অব্যবস্থা এবং অরাজকতার মধ্যে হাংরিরা ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র দুটি ব্যবস্থা থেকেই দূরত্বে অবস্থান করেছিলেন।

আসলে যে কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রতিবাদীদের একটি বর্গীকরণ না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রের যেমন স্বস্তি ঘটে না, তেমনই সমাজতাত্ত্বিকরাও নিজেদের দায়িত্বে অসম্পূর্ণ মনে করেন। হাংরিদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসের অভিযোগ এনেছিল। তদনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েও ছিল। যদিও আন্তর্জাতিক নানা চাল, বিচার ব্যবস্থার হস্তক্ষেপ ইত্যাদি জনিত কারণে অভিযুক্ত হাংরি কবি লেখকেরা বেঁচে গিয়েছিলেন। টাইম ম্যাগাজিনের রিপোর্টে ও এর পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। সমাজতোত্ত্বিকেরা হাংরি নিয়ে কী ভেবেছেন জানা যায় নি। কবি লেখক, বুদ্ধিজীবীদের পর্যালোচনাগুলোও হাংরিদের বিপক্ষেই গেছে। সেগুলির কিছু আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। কিছু গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশ পাওয়া যাবে। তবে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের বিচার করতে গিয়ে বীট জেনারেশন আন্দোলনের প্রসঙ্গ উঠেছে। এ যে একটি সরল বর্গীকরণ তাতে সন্দেহ নেই। 'কৃত্তিবাস' এর সম্পাদক, বীট অ্যালেন গীন্সবার্গের বন্ধু ও হাংরি মামলায় মলয় রায় চৌধুরীর পক্ষে সাক্ষী লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও বলেছেন,-

> সেবারে কলকাতার, বারানসীতে ও ভারতের অন্যান্য জায়গায় প্রায় বছরখানেক কাটিয়ে গিয়েছেন, অ্যালেন ও পিটার .... অ্যালেনের প্রভাব ও বীট জেনারেশনের সুত্র ধরে রায়চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয় (অর্থাৎ সমীর ও মলয় রায় চৌধুরী) শুরু করে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন; কিছুদিনের জন্য বাংলা সাহিত্যে তা বেশ হই চই তুলে দিয়েছিল।২০

কবি ও সম্পাদক পবিত্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন -

> হাংরিদের থেকে 'কবিপত্রে'র লেখকরা সব সময় দূরত্ব রেখেছেন, কারণ হাংরিদের সমস্যা যৌনতার,

উচ্ছৃঙ্খলতার সবটাই আমেরিকার শ্লাম এরিয়া থেকে উঠে আসা গীনসবার্গ ও অর্লেভস্কির মস্তিস্ক প্রসূত ।২১

দুটি মন্তব্যই চটজলদি করা, হাল্কা মন্তব্য মাত্র। নিজেদের উক্তির সমর্থনে কোনো যুক্তি বা প্রমাণ তাঁরা দেন নি। পবিত্রের বাক্যে 'সবটাই' শব্দটি লক্ষণীয়। প্রকৃত পক্ষে, গীন্সবার্গ তথা বীটদের হাংরি গোষ্ঠী মলয় ও সুবিমল ছাড়া সুনীল গঙ্গোপ্যাধায় ও কৃত্তিবাস গোষ্ঠীরই যোগাযোগ বেশী ছিল। তাছাড়া বীট জেনারেশনের সঙ্গে হাংরি জেনারেশনকে মেলানোও যায় না। বীটদের আবির্ভাব আমেরিকার এক ভিন্ন রাজনৈতিক পরিবেশে ঘটেছিল। ঐতিহাসিকের ভাষায় -

As social protest the movements for civil rights, integration and black nationalism. Yet as an expression of individual opposition to social conformity, it drew on a long American tradition from the orean and white man to Paul Bowles and Henry Miller. The leading figure of this movement Williams Burroughs (1914), Jack Kerouc (1922-69) and Allen ginsberg (1926 – 97) appalled by the growing regimentation of American Political and cultural life in the late forties and early fifties and the paranoiac suppression of dissent, viewed them selves as outsiders who found avenness of personal and aesthetic realization in exile, drugs and sexual non- conformity. ২২

শুধু সামাজিক অসন্তোষ নয়, এঁদের মধ্যে ধর্মীয় অন্তর্মুখীনতাও দেখা গিয়েছিল। আমেরিকান ভোগবাদী সমাজের উপসর্গ হিসেবেও বীটদের দেখা হয়েছে। আবদুল হাফিজ লিখেছেন,-

> বীটদের নতুন জীবন পদ্ধতি - অর্থাৎ জাজ সঙ্গীতের উন্মত্ত সুরের প্রতি অত্যাসক্তি, ভবঘুরে বৃত্তির সাথে জৈন, বৌদ্ধ ধর্মের মিলন, অবাধ সহমৈথুন, স্বপ্নালোক সৃষ্টির জন্য রাসায়নিক ঔষধপত্র ও অন্যবিধ নেশাদ্রব্যের ব্যবহার, আবর্জনার মধ্যে বাস করবার উদগ্র আগ্রহ, শরীর ও পোষাকের প্রতি সচেতন অবহেলা - সেদিন থেকেই জনসাধারণের আলোচ্য হয়ে উঠল।২৩

হাংরি কবি লেখকদের মধ্যে বীটদের এই সব দৃষ্টিভঙ্গী বা আচরণ কোনোটাই দেখা যায় নি। বীটরা ছিলেন উন্মত্ত। হাংরিরা অস্থির, বীটরা ছিলেন লোলুপ হাংরিরা সিনিক, বীটরা ছিলেন গৃহত্যাগী, হাংরিরা উদ্বাস্তু। সুতরাং দুটি আন্দোলন পরিকল্পনা এক নয়। আর পরিকল্পনা এক নয় বলে সাহিত্যের প্রতিফলনও আলাদা। ১৯৬২ সালে শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি' কাগজে লিখেছিলেন,-

> ওদিকে ও দেশে সামাজিক পরিবেশ অ্যাফ্লুয়েন্ট, ওরা বীট বা অ্যাংরি হতে পারে। আমরা কিন্তু ক্ষুধার্ত। যে কোনো রূপের বা রসের ক্ষুধাই একে বলতে কোনো রূপ, কোনো রসই এতে বাদ নেই বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। একে যদি বীটরা এ্যাংরী দ্বারা প্রভাবিত বলার চেষ্টা হয় তবে ভুল বলা হবে। ২৪

শক্তি ঠিকই লিখেছিলেন। কারণ আমেরিকান প্রভাব নয়, ভারতবর্ষের জটিল একটি আর্থ সামাজিক কাঠামোর রাজনৈতিক বৃত্তে হাংরি জেনারেশনের উৎপত্তি। দেশজ কার্যকারণ থেকে। ইংল্যান্ডের অ্যাংরী ইয়ংমেন আন্দোলনের সঙ্গেও তা তুলনীয় নয়।

অ্যাংরী ইয়ংম্যান আন্দোলন পঞ্চাশের দশকে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক মন্দা ও আন্তর্জাতিক ক্ষমতাহ্রাসের প্রেক্ষিকায় জন্ম নিয়েছিল। অর্থনৈতিক মন্দা কাটানোর জন্যে শিল্পস্থাপন, শিল্পে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের প্রয়োগ - একদিকে যেমন শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি করল, অন্যদিকে তেমনই ঐ শ্রমিকরা যন্ত্রপ্রভাবে রুক্ষ হয়ে উঠল। পরিশ্রম ও এক ঘেঁয়েমিতে তাদের হতা·, ক্রোধ, মনোবৈকল্য দেখা গেল। অথচ বাবু সমাজের চেয়ে তাঁরাই নিয়ামক হয়ে উঠল। M.H. Abrams তাই এ যুগকে বলেছেন, 'an area of greatly in-creased upward mobility of the social classes।' ২৫

পাশাপাশি চার্চের পতন শ্রেণী বিভাজনের বিনষ্টি ধ্বংশ করে দিল মধ্যবিত্ত নৈতিকতা। এই নতুন সামাজিক শ্রেণী চরিত্রটিই ইংরাজী সাহিত্যে অ্যাংরী ইয়ংম্যান মুভমেন্টে প্রতিফলিত হয়েছে। কিংসলি অ্যামিস, জন অসবোর্ন প্রভৃতিদের উপন্যাস, নাটকে এই আন্দোলনের রূপায়ন ঘটে। সুতরাং এঁদের সঙ্গেও হাংরিদের তুলনা করে মূল্যায়ন সম্ভব নয়। স্পষ্টতই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ভাবকল্পটি ছাড়া অ্যাংরি ইয়ংম্যনদের সঙ্গে হাংরিদের সাদৃশ্য নেই। আসলে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের আর্থসামাজিক চালচিত্রটিকে বাদ দিয়ে যাঁরা হাংরি আন্দোলনের বিচার করেছিলেন তাঁরাই এরকম নানা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিলেন। আমরা সমকালীন বা অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালের লেখক কবিদের উপর হাংরি সাহিত্যের প্রভাবের ইঙ্গিত করেছিলাম।

একইভাবে লক্ষ করা যায়, যে, হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সমকালে পূর্ব পাকিস্তানে 'দি স্যাড জেনারেশন' নামে একটি কাব্য গোষ্ঠীর আর্বিভাব হয়েছিল ।১৯৬৪ সালে তাঁদের ম্যানিফেস্টো বার হয়। হাংরি জেনারেশনের মতই তাঁরা ইংরাজীতে ম্যানিফেস্টো বার করেন। প্রথাবদ্ধ জীবনের বিরোধিতা, নৈতিকতার বিরুদ্ধচারণ, যৌন অতিরেক ও জীবনের অর্থহীনতার বোধ তাঁদের দুঃখিত ও বিপন্ন করে তুলেছিল। রফিক আজাদ, প্রশান্ত ঘোষাল, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ছিলেন এই গোষ্ঠীর কবি।

দি স্যাড জেনারেশেনের ম্যানিফেষ্টোতে বীট ও অ্যাংরিদের প্রসঙ্গ থাকলেও আশ্চর্য জনক ভাবে হাংরিদের উল্লেখ নেই। এঁদের একটি ম্যানিফেষ্টো এরূপঃ-

The sad Generation

We don't know what we are doing. We are really undone, really helpless. We are poisoning us consciously. Yet we are helpless and helpless. We are guilty. We are bearing dynamites in our blood. We know it. But we are helpless as simply undone. We have no other alternative except SELF-DESTRUCTION.

Death is our darling, but not those bloody ladies who are loitering before our eyes. We have no friends. We are not friendly with others. We have a faithful friend – CIGARETTE. We hate conventional life. We cannot tolerate the conventional notions of private and public morality. Life is meaningless, we are leaving meaninglessly. We are constantly living in anxieties. We know the intensity of our anxieties to feel and know that we exist, and that this is the root of all our anxieties.

We are every MOMENT, SWIMMING in the ocean of MENTAL and PHYSICAL agitations for which happiness in foreign to us. I should warn the headless conventional gentlemen and the bloody critics in this connection that we are not sex driven youths. We are faithful to ourselves, and to our SADNESS. There should be no doubt in it.

We are not beatniks or Angries, remember. We are 'bipanna'. And that is why we are 'sad'.

We are, for no time, interested in politics and newspapers. Then, what do we want ? NOTHING, NOTHING – We want nothing from our bloody society.

We are exhausted, annoyed, tired and 'SAD'. - vol. 1, 1964 – written by Rafiq Azad. ২৬।

মলয় রায় চৌধুরী যেমন 'শুভা' নামে এক নারীকে তাঁর অস্তিত্বের কেন্দ্রস্থলে করেছেন, তেমনই প্রশান্ত ঘোষাল স্থাপন করেছেন 'চম্পাবতীকে'। রফিক আজাদের কবিতা এরকমঃ

আলস্যে নেশায় বুঁদ - আমি এক বেশ্যার বেড়াল।
সারারাত শুয়ে থাকি অনাবৃত উষ্ণতম পেটে
বিছিয়ে কোমল থাবা -
রিরংসায় কেঁপে ওঠে নারী।
আমি তার সর্বগ্রাসী উন্মুখর উরুর আস্বাদে।

বগুড়া থেকে 'বিপ্রতীক' রাজশাহী থেকে 'সুনিকেত মল্লার' প্রভৃতি পত্রিকাও একই ধরনের ঘোষণা ও কবিতা ছেপেছে। আব্দুল মযীদ তালুকদার 'না' নামে একটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে কাজি শাহিদ হাসান লিখেছিলেন,

'সবই তাৎপর্যবিহীন এবং
আনন্দে আনন্দ নাই'।
ব্যথায় আনন্দ নাই

কবিতায় আনন্দ নাই
মদ সিগারেটেও না।

কবির সদর্থকতার প্রতি ঠাট্টাটি এরকম : শালা, আমার আত্মা আমাকে আর পছন্দ করে না। আমি মরে যাব। আমার আত্মার স্থির বিশ্বাস। আমার মধ্যে আমি নাই। হাঁ।

মহাদেব সাহা, ফারুক সিদ্দিকী, শাহনুর খান, সাইদ মোস্তাফা কামাল অনেকেই ষাট ও সত্তরের দশকে এ ধরনের কবিতা লিখেছেন। এঁদের মধ্যে রফিক আজাদ ও মহাদেব সাহা পশ্চিমবঙ্গেও খুব পরিচিত নাম। এঁদের এই ধারার কবিতা আজ তাঁদের পরিচয় জ্ঞাপকও নয়। কিন্তু একটা সময়ে নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যের ভয়াবহ অসুখে তাঁরা যথেষ্ট আক্রান্ত হয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রভাবেই যে এটা ঘটেছিল এমন অনুমান করা যায়। তবে হাংরি জেনারেশনের সঙ্গে স্যাড জেনারেশনের একটা মৌলিক পার্থক্য এই যে, হাংরিদের কবিতায় নারী শরীরের প্রতি লুব্ধতা নয় ঘৃণারই প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু স্যাড জেনারেশন' নারীশরীরের প্রতি লোভাতুর। তাছাড়া রফিকদের কবিতায় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ব্যাপারো কি প্রকট নয়। হাংরিদের মধ্যে যদি প্রতিবাদ পাই। তো স্যাড জেনারেশনে পাচ্ছি বড় জোর অসন্তোষ। তাই ওরা বিষন্ন, বিপন্ন বলে নিজেদের অনুভব করেছেন। যেখানে হাংরিরা বিষাদকে ঝেড়ে নৈরাজ্যবাদীর ভুমিকায় অবতীর্ণ। স্যাড জেনারেশনের কবিরা শেষ পর্যন্ত রোম্যান্টিকতারই ফসল, হাংরিরা অ্যান্টি - রোম্যান্টিক।

আসলে, পূর্ব পাকিস্তানের কবিরা তাঁদের কাব্যজীবনের ভাঙা গড়ার প্রথম পর্যায়ে, নবীন বয়সে হাংরি জেনারেশনের প্রভাবে একটা পথ খুঁজতে চেয়েছিলেন। তারপর ব্যক্তিগত কবিপ্রকৃতি অনুযায়ী অন্য ধারায় চলে গেছেন। যৌবনের উন্মাদনা কেটে গেলে যেমন নিজেদের সংযত করেছেন, তেমনই প্রভাবের চেয়েও স্বাধীন ভাবনা চিন্তাকে আশ্রয়যোগ্য বিবেচনা করেছেন।

কিন্তু তাতেও ঐতিহাসিক ভাবে এ সত্য থেকে গেছে যে, তাঁদের কাব্যনুশীলনের একটা পর্যায়ে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সক্রিয় ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সংঘটিত হবার পর পরই রাজ্যের রাজনৈতিক চালচিত্রটি বদলাতে শুরু করে। সত্তর দশক শুরুর অব্যবহিত পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। বামপন্থীদের সরকার গঠন প্রক্রিয়া বিপ্লব, প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা প্রভৃতি মূল্যমাণকে একটি নতুন ধারণা দেয়।

সত্তর দশকে উত্তাল নকশাল বাড়ি আন্দোলনে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার আরেকটি নকশা গড়ে উঠে। এর ফলে, সাহিত্যেও কিছু পরিবর্তন ঘটে। কবিতায় অগ্রজ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেক বেশী রাজনৈতিক জিগিরকে নিয়ে আসেন। মণিভূষণ ভট্টাচার্য, অমিতাভ গুপ্ত প্রভৃতি কবিরা এবং তপোবিজয় ঘোষ, শৈবাল মিত্র প্রভৃতি কথাকারেরা তীব্র বামদর্শনকেই প্রতিষ্ঠানবিরোধী অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করেন। এঁদের মধ্যে অমিতাভ গুপ্ত ও শৈবাল মিত্রকে বুর্জোয়া সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য পেতে দেখা যায়। ইতিমধ্যে 'দেশ,' 'অমৃত,' 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে 'কৃত্তিবাস' প্রায় একাত্মা হয়ে গিয়েছে। কৃত্তিবাসের লেখকরা জনপ্রিয় ও মনোরঞ্জক সাহিত্য সৃষ্টিকেই ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আরেকটি নতুন ধারাও গড়ে উঠছিল। যাঁরা ঠিক বাণিজ্যিক লেখকনন , আবার কেতাবী মার্কসবাদেও আশ্রয়প্রার্থী নন । কথাসাহিত্যে ভগীরথ মিশ্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং কবিতায় জয় গোস্বামী, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, মৃদুল দাশগুপ্ত প্রভৃতিরা এই ধারার অন্তর্ভুক্ত।

এ ভাবে বাংলা সাহিত্যে যেন একাধিক ধারার সহাবস্থানকে মেনে নিল। তাই নতুন করে কোনো আন্দোলন গড়ে উঠবার প্রয়োজনীয়তা রইল না। ভগীরথ বা ঝড়েশ্বরের গল্প, উপন্যাসে প্রান্তিক মানুষের অজ্ঞাত ছবি ফুটে উঠল। আরও পরে, অভিজিৎ সেন, নবারুণ ভট্ট চার্যেরা তাকেই আরও বাস্তববাদী করে তুললেন। জয়ের কবিতায় হাংরির অস্থিরতা রইল কিন্তু আঙ্গিক ও রসের নান্দনিকতাকে তিনি মান্য করলেন।

পার্থপ্রতিম প্রথমে 'ক্ষুধার্ত' আন্দোলনে ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি নিজেকে অনেকখানি পাল্টে নিলেন। এতদসত্ত্বেও হাংরিরা যে শব্দের শুচিবায়ুতা ভেঙ্গে দিলেন। বিষয়ের নিষিদ্ধতা বলে কিছু রাখলেন না - তা বাংলা ভাষায় এক গভীর প্রভাব রেখে গেল। ১৯৬২ সালের পর থেকে বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্যের কাঠামো ও ভাষা ব্যবহার পাল্টে গেল ।

তথ্য সূত্র ঃ

১. মলয় রায় চৌধুরী, একটি পশ্চিমবঙ্গীয় প্রবলেম্যাটিক : হাংরি আন্দোলন / এবং পত্রিকা, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ: ৯৩।

২. মলয় রায় চৌধুরী, কৃত্তিবাস থেকে হাংরি আন্দোলন/কবিতীর্থ/ গ্রীষ্ম-বর্ষা, ১৪১০, কলকাতা, পৃ: ১৩।

৩. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, হাংরি/বাংলা বই, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯, জানুয়ারী, পৃ: ১৫।

৪. সুধীর চক্রবর্তী, গ্রন্থ সমালোচনা, দেশ, ১৬/৯/২০০৪ - পৃ: ৮০।

৫. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, কৃত্তিবাস পঞ্চাশ / কৃত্তিবাস, কলকাতা, ২০০৩, পৃ: ১২৮-১২৯।

৬. শংকর চট্টোপাধ্যায়, (প্রথমত) কৃত্তিবাস সংকলন,প্যাপিরাস, ১৩৯১, পৃ: ১৩৮।

৭. শংকর চট্টোপাধ্যায়, (হত্যাকারী), কৃত্তিবাস সংকলন ২, প্যাপিরাস, ১৩৯১, পৃ: ১৩৮।

৮. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আমি কীরমক ভাবে বেঁচে আছি / কৃত্তিবাস সংকলন, ২ প্যাপিরাস, ১৩৯১, পৃ: ১১৮।

৯. উত্তম দাশ, হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলন, মহাদিগন্ত, কলকাতা, ২০০২, পৃ: ৬২।

১০. তদেব, পৃ: ৯৬।

১১. অতীন্দ্রিয় পাঠক, ষাটের দশক ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, জিগীষা, ১৯৮৮, পৃ: ২৭।

১২. পবিত্র মুখোপাধ্যায়, ধ্বংশকালীন আন্দোলন ও কবিপত্র / জিগীষা পত্রিকা, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ: ৩৬।

১৩. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আনন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ: ১।

১৪. শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রতিবাদের সাহিত্য, ধৃতরাষ্ট্র, শিলিগুড়ি, ১৯৮৪, পৃ: ৯৫।

১৫. দেবেশ রায়, বিলম্বিত সওয়াল, ক্ষুধার্ত পত্রিকা, কলকাতা, ১৯৭২-৭৩ পৃ: উল্লেখ নেই।

১৬. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯৫, পৃ: ৩।

১৭. মলয় রায় চৌধুরী, মৃত্যু মেধী শাস্ত্র .. / প্রকাশক লেখক স্বয়ং, পাটনা, ১৯৬৫, পৃ: ১।

১৮. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯৫, পৃ: ৪।

১৯. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, হাংরি / বাংলা বই, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃ: ১৫।

২০. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেশ পত্রিকা, ২৫ জানুয়ারী, ১৯৯৭ / কলকাতা, পৃ: ৬৯।

২১. পবিত্র মুখোপাধ্যায়, পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই কবিপত্র/ অমৃতলোক শারদীয়া, কলকাতা, ২০০৩, পৃ: ২৫৯।

২২. Boris Ford, New Pelican guide to American literature, Pelican, Britain, page 345.

২৩. আবদুল হাফিজ, আধুনিক সাহিত্যচর্চা মুক্তধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৩৮২, পৃ: ১৩।

২৪. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯৪, পৃ: ১৪।

২৫. M.B. Abrams, A Glossary of Literary Terms, Macmillan, India, 1985, page -10

২৬. আবদুল হাফিজ , আধুনিক সাহিত্যচর্চা মুক্তধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৩৮২, পৃ: ৬৮ - ৬৯।

উপসংহার

যে কোনো আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্য আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে । একদিকে তা কিছু সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাতের প্রতিফলন ঘটায়, অন্যদিকে সৃজনশীলতার নানা রূপ ফুটিয়ে তোলে । বিষয় ও আঙ্গিক দু'ক্ষেত্রেই আন্দোলনের অবদান অনস্বীকার্য । শুধু তাই নয় , বিগত আন্দোলন গুলির কিছু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াও এই নবতর সাহিত্য আত্মস্থ করে নেয় ।ফলে ঐতিহ্যের সঙ্গে নবতর আন্দোলনের একটি গ্রহণ ও বর্জনের টানাপোড়েনের সম্পর্ক থাকে । পৃথিবীর নানা সাহিত্য-আন্দোলন গুলির দিকে তাকালে একথা স্পষ্ট হয় ।

বস্তুত, আন্দোলনের তিনটি স্তর থাকে : (ক) প্রতিবাদ , (খ) সৃজনশীলতার স্তর (গ) ক্ষমতা দখল বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা । রাজনৈতিক , সামাজিক ও সাহিত্য - আন্দোলন তিনটি ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য । যাই হোক , সাহিত্যের ক্ষেত্রে আন্দোলন একটি নতুন গতিবেগ , সৃষ্টির - ঐশ্বর্য গড়ে তোলে । তাই পৃথিবীর সব ভাষাই নব নব আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শরিক হয়ে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে । বাংলা ভাষাও তার ব্যতিক্রম নয় । পৃথিবীর এইসব প্রধান প্রধান সাহিত্য-আন্দোলন গুলির স্বরূপ ও গুরুত্ব আমরা গ্রন্থের প্রথম পর্ব , প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি ।

পশ্চিমী দেশগুলিতে বিগত শতাব্দীগুলিতে নানা ধরনের সাহিত্য আন্দোলন আমরা লক্ষ করেছি । ইতালির রেনেশাঁস তো শিল্প সংস্কৃতিতে একটা প্রবল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল । উনিশ শতকের বঙ্গদেশেও নবজাগরণের একটা ধাক্কা লেগেছিল । কিছু সামাজিক আন্দোলন লক্ষ করেছিলাম আমরা । বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তাতে লাভবান হয়েছে । রামমোহন রায় , ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর , মধুসূদন দত্ত , বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সবাই উনিশ শতকের নবজাগরণের সন্তান ।

কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে কোনো সাহিত্য আন্দোলন ঐ সময় বঙ্গদেশে হয়নি । হয়তো বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার গঠনপর্বে তা সম্ভবও ছিলনা । কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রভূত ঐশ্বর্য মন্ডিত হয়ে উঠেছে । সাহিত্য - আন্দোলন হয়নি , অথচ আন্দোলন -সম্ভব ফসল উঠেছে ।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে , বাংলা ভাষায় একটা আন্দোলনের সম্ভাবনা তৈরী হয় । ১৯১৪ সালে 'সবুজ পত্র' পত্রিকাটি প্রকাশ পেলে বাংলা ভাষায় একটি আলোড়ন তৈরী হয় । মুক্ত চেতনা ও যৌবনের গতি ধর্ম প্রতিষ্ঠায় পত্রিকাটি একটি দৃপ্ত ভূমিকা নেয় । চলিত গদ্যকে সাহিত্যের প্রকাশ মাধ্যম রূপে একান্তভাবে দেখতে চায় 'সবুজ পত্র' । এর সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী শুধু তারুণ্যের জয়গান নয় , চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্তি , যুক্তির প্রতিষ্ঠা , তার্কিকতা ও মননশীলতাকে আধুনিক রুচি ও ভাষার বয়নে উপস্থাপিত করেন ।

'সবুজ পত্রে'র পর ১৯২৩ সালে 'কল্লোল' পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে । 'সবুজ পত্র' বলেছিল মুক্তির কথা , আর 'কল্লোল' উদ্দামতার প্রকাশ ঘটালো । তাছাড়া , সমকালীন যুগের সংকট 'কল্লোল' পত্রিকায় গাঢ় ছায়া ফেলল । একদিকে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজনা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বাঙালী শহীদদের আত্মত্যাগ , অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধের করাল প্রভাব 'কল্লোলে'র লেখকদের অস্থির করে তুললো । নৈরাশ্য , হতাশা , ক্ষোভ তীব্র হয়ে উঠল তাঁদের লেখায় । যুদ্ধ জনিত আর্থিক সংকট , খাদ্যাভাব , নৈতিক অধঃপতন , বেকার সমস্যা , নারীদের বিপথগামিতা 'কল্লোল' এর সাহিত্য ক্ষেত্রের অনেকখানি জায়গা জুড়ে নিল । একদিকে এই বাস্তবতার অভিঘাত অন্যদিকে 'কল্লোল' লেখকদের রোম্যান্টিক মনোভঙ্গী - যে ধরনের কবিতা ও কথা সাহিত্য আমাদের সামনে উপস্থিত করল তা অনেকখানি অভিনব । রবীন্দ্র ঐতিহ্য , এমনকি 'সবুজ পত্রে'র বৈদগ্ধ্য যেন 'কল্লোল' দ্বারা আহত হল । সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্যকে নাড়িয়ে দিল 'কল্লোল' তাই বলা যায় , বাংলা ভাষায় স্পষ্টভাবে 'কল্লোল' - প্রথম সাহিত্যআন্দোলনের বার্তাবহ । আন্দোলনের জন্য যে সংগঠন শক্তি দরকার তা-ও 'কল্লোলে'র ছিল ।

তাঁরা শুধু গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে সহিত্য রচনা করেন নি , অন্যান্য পত্রিকা গোষ্ঠীকে ও তাঁদের পত্রিকার ছত্রছায়ায় এনেছিলেন ।

'কল্লোল' - এর পরে 'বুদ্ধদেব বসু'র 'কবিতা' পত্রিকা বাংলা সাহিত্য - আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল । তবে সে আন্দোলনের ক্ষেত্র ছিল - কবিতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ । তাছাড়া , 'কল্লোল' যেমন গোষ্টীবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা করেছিল , 'কবিতা' তা করেনি । একই ধরনের ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠাও লক্ষ ছিল না 'কবিতা'র । প্রধানত কবিতার উপস্থাপণ রীতি কেই একটা নতুন আকার দেবার আন্দোলনে সামিল হয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকা ।

এই পত্রিকার মধ্যে একধরনের মননশীল আভিজাত্য ছিল । কবিতার পর বাংলা ভাষাকে সচকিত করে তুলেছিল 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার আবির্ভাব । এটি কোনো কোনো দিক থেকে কল্লোল - এর সমধর্মী । বিশেষ করে কল্লোলের - সাহিত্যগত ভবঘুরে ব্যাপারটি কৃত্তিবাসের কবি - গোষ্ঠির ব্যক্তি জীবনের মধ্যে এসে পড়েছিল । এঁরা শুধু মধ্যরাতের কলকাতা নয় । সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহারের কিছু কিছু অঞ্চলে দলবদ্ধভাবে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বেরিয়ে পড়তেন । এতে একটা ফল হয়েছিল এই যে , সমস্ত বঙ্গে তাঁরা তাঁদের কবিতাকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন । নিয়ন্ত্রণ কলকাতায় থাকলেও মফঃস্বলে এমনকি আসামের বরাক অঞ্চলে 'কৃত্তিবাস' - এর অনুগামী ছড়িয়ে পড়েছিলেন ।

তবে কৃত্তিবাস - আন্দোলন বেশীদিন স্থায়ী হয়নি । কারন ঐ পত্রিকার কবি - লেখকেরা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে যোগদান করেছিলেন । সুতরাং আমরা দেখেছি যে , বিশ শতকেই বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত আন্দোলনগুলির সূচনা হয়েছিল । 'সবুজ পত্র' ১৯১৪ সালে , 'কল্লোল' ১৯২৩ সালে , 'কবিতা' ১৯৩৫ সালে এবং 'কৃত্তিবাস' ১৯৫৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাল পরিধি প্রায় চল্লিশ বছরের । এরপর ১৯৬১ - ৬২ সালে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের আবির্ভাব ।

বলা যায় , পিছনে চল্লিশ বছরের আন্দোলন - ঐতিহ্য নিয়ে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের অভ্যুদয় । যদিও প্রথম আবির্ভাবেই তীব্র ভাষায় হাংরি আন্দোলনকারীরা শুধু ঐ চল্লিশ বছরের ঐতিহ্য নয় , বাংলা ভাষার হাজার বছরের ঐতিহ্যকেই যেন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ছিলেন । হাংরি আন্দোলনকারীরা প্রথমেই কোনো সাহিত্য পত্রিকা বার করেন নি । প্রথমে তাঁরা বুলেটিন বার করেছিলেন । সেটাও আবার ইংরেজিতে । পরে অবশ্য বাংলাতেও বুলেটিন তাঁরা ছেপেছিলেন । বস্তুত কোনো একটি বিশেষ পত্রিকা ঘিরেই যে তাঁরা সাহিত্যআন্দোলনটি সংগঠিত করেছিলেন তা-ও নয় । 'এষণা,' 'জেব্রা' , 'উপদ্রুত', 'ফ'ঃ 'উন্মার্গ' - 'জিরাফ' - এ রকম অসংখ্য ক্ষুদ্র পত্রিকা ঘিরে হাংরি কবি লেখকরা সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন । এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যথাক্রমে মলয় রায় চৌধুরী ও শৈলেশ্বর ঘোষ ।

এই আন্দোলনের কতগুলি বিশিষ্টতা ছিল । যেমন , এঁরাই প্রথম কতগুলি মেনিফেস্টোভিত্তিক সাহিত্য রচনা করেছিলেন । ছন্দ-কে কবিতা থেকে একেবারে বর্জন করেছিলেন । সাহিত্য চূড়ান্ত ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তির সর্বপ্রকার আত্ম-উন্মোচনের কথা বলেছিলেন । বলেছিলেন সবরকমের নিষিদ্ধতার আবরণ খুলে ফেলতে । ধর্ম , রাজনীতি , রাষ্ট্র এমনকি শিল্পরীতিকে ভেঙে ফেলার কথা বলেছিলেন হাংরিরা । মধ্যবিত্ত রুচি ও মূল্যবোধ ভেঙে , সামন্ত ও বুর্জোয়া শিক্ষাকে অস্বীকার করে আস্তিত্বের গহন অন্ধকার এবং অভিজ্ঞতার রুক্ষ্ম বাস্তবতাকে মেলাতে চেয়েছিলেন তাঁরা । যৌনতাকে রোম্যান্টিক ভাবে না ফুটিয়ে , একটি জৈবিক বাস্তবতা হিসেবে সরাসরি সাহিত্যে তাঁরা তুলে এনেছিলেন । হাংরি কবিলেখকদের ভাষা ছিল নিষিদ্ধ শব্দ , অপশব্দ , গালিগালাজ ও যৌনঅনুষঙ্গ বহুল শব্দরাজী দ্বারা পূর্ণ । রাষ্ট্রবিরোধী কথাবার্তা এবং যৌনতার প্রদূষণের দায়ে হাংরি জেনারেশনের কিছু সদস্যকে ভারতীয় দন্ড বিধির ১২০বি এবং ২৯২ ধারায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল । হাংরি জেনারেশন পত্রিকার ১৬ নং সংখ্যার জন্যই এটা হয়েছিল । যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন , তাঁদের মধ্যে মলয় রায় চৌধুরী , শৈলেশ্বর ঘোষ , সুভাষ ঘোষ , সমীর রায়চৌধুরী, প্রদীপ চৌধুরী, ইত্যাদি অনেকে ছিলেন ।যদিও শেষ পর্যন্ত মলয় রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধেই মামলা চলতে থাকে ।

[illegible] উচ্চ আদালতে গিয়ে বেকসুর খালাস পান তিনি । এ সমস্ত আলোচনা বিশদভাবে আমরা আগেই করেছি ।

এই আন্দোলন ষাট-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে বিশেষ উত্তেজনা তৈরী করেছিল । কিন্তু সেটাই বড় কথা নয় । হাংরি আন্দোলন খুবই পরিকল্পিত ভাবে তাঁদের সাহিত্য চর্চার লক্ষ নির্ণয় করেছিল । নিছক স্বতস্ফূর্ত প্রেরণার বশে এঁরা সাহিত্য ক্ষেত্রে আসেন নি । ১৯৬১ - ৬৩ সাল থেকে শুরু করে ১৯৮৭ - ৮৮ সাল পর্যন্ত হাংরিরা উল্লেখ যোগ্য সাহিত্যকীর্তি রচনা করেছিলেন । তবে ঐ সময় কালে তাঁদের মধ্যে কিছু বিভাজনও সৃষ্টি হয়েছিল । বিশেষ করে, মলয় রায় চৌধুরী কিছুদিন সাহিত্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একক নিঃসঙ্গতাকে আশ্রয় করেছিলেন। তবু আন্দোলন বিস্তারিত হয়েছে । কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গ , উত্তরবঙ্গ থেকে ত্রিপুরায় হাংরি মতাদর্শের অনেক কবি , লেখক আমরা পেয়েছি । এমনকি নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত হাংরি সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা লক্ষ করা গেছে । অনেক কম বয়সী কবি , লেখকরা হাংরি মতাদর্শের প্রভাবে নিজেদের তৈরী করে নিয়েছেন । আমাদের আলোচনার প্রথম পর্ব ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাঁদের কথা আছে ।

হাংরি জেনারেশন আন্দোলন আশ্রয় করেছিল প্রধানত কবিতাকে । তবে কথা সাহিত্য, নাটক এবং প্রবন্ধ সাহিত্যও তাঁদের স্পর্শ বঞ্চিত হয় নি । হাংরি কবিতার ক্ষেত্রে প্রধানতম ব্যক্তিরা ছিলেন, মলয় রায় চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, ফাল্গুনী রায় প্রমুখ । গৌন কবিরাও [illegible] ছিলেন । মলয়ের প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি হল, শয়তানের মুখ (১৯৬৪), জখম (১৯৬৫) আমার অমীমাংসিত শুভা (১৯৬৫) ইত্যাদি । এই কাব্যগুলিতে ব্যক্তি চৈতন্যের এক প্রবল জ্বালার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় । নিরাবেগ , নিষ্প্রেম এই কবিতাবলীতে ক্রোধ , চীৎকার , হতাশা , প্রতিবাদ , ক্ষোভ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় আগুনের হল্কার মতো ছড়িয়ে পড়েছে । মানুষের প্রবল যৌন তাড়নাও আমরা এখানে দেখতে পাই । আধুনিক সভ্যতার প্রতি কবির বিদ্বেষ লক্ষণীয় । প্রেম , মৃত্যু , বিচ্ছিন্নতার দৃশ্য ও স্তরগুলির মধ্যে এক আধুনিক যুবমানসকে খুঁজে পাওয়া যায় ।

শৈলেশ্বর ঘোষের উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হল , জন্মনিয়ন্ত্রন (১৯৬৭) অপরাধীদের প্রতি (১৯৭৪) , দরজা খোলা নদী (১৯৮১) , পূর্ণগ্রাস (১৯৮৫) এবং উৎসব (১৯৮৮) । মলয়ের মতই শৈলেশ্বরের কবিতাও প্রতিবাদ । তবে অস্থিরতার চেয়ে আক্রমন বেশী এবং ঐ আক্রমণ শেষে একধরনের নেতিবাচক দর্শনে আশ্রয় গ্রহণ করে । শৈলেশ্বরের কবিতা একদিকে নাগরিক , অন্যদিকে নৈসর্গিক । একদিকে ধূসর অতীত অন্যদিকে বিবর্ন ভবিষ্যতের মধ্যে শৈলেশ্বরের যাতায়াত । ইতিহাস ও মিথকে শৈলেশ্বর আশ্চর্য কৌশলে হাংরি কবিতার মধ্যে সঞ্চারিত করেন । অন্যভাবে বলা যায় , হাংরি বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাদ দিলে শৈলেশ্বরের কবিতা মূর্ত এবং বিমূর্তের এক আশ্চর্য আলো আঁধারের জগৎ ।

প্রদীপ চৌধুরীর কবিতা এক ধরনের বৈপরীত্যের গ্রন্থন । ব্যাক্তির সঙ্গে সময় ও সভ্যতার , কলকাতার যান্ত্রিকতার সঙ্গে সমুদ্র ও পর্বতময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রেমের আততির সঙ্গে ঘৃণার এক আশ্চর্য টানা পোড়েন দেখা যায় প্রদিপের কবিতার মধ্যে । তবে প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধিতায় , যৌন অসুস্থতার চিত্রণে এবং আত্ম জৈবনিক উৎকেন্দ্রিকতার প্রক্ষেপণে হাংরি বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর কবিতার ফুটে উঠেছে । ফাল্গুনী রায় হাংরিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রগলভ কবি । তাঁর কবিতার বিষয় , প্রকাশ ভঙ্গী সবচেয়ে উচ্চকিত ও স্পষ্টভাষী । সমাজ ও মানবদেহের ক্লেদকে তিনি এক করে দেখেন । নারী ও মাদক শুধু নয় , ফাল্গুনীর কবিতায় চেতনার কী যেন অনির্দেশ্য এক মত্ততাও বিদ্যমান ।

এভাবে হাংরি কবিতার মধ্যে বিভিন্ন কবি ব্যক্তিত্বের আলাদা আলাদা স্বাদ যেন আমরা অনুভব করি । প্রথাবিরোধী , কিছুটা বা অসামাজিক জীবন যাত্রার ছবি ফুটে উঠতে দেখি । কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাসুদেব দাশগুপ্ত ও সুভাষ ঘোষের মধ্যে সম্পর্ণ ভিন্নমুখী কৌশল লক্ষ করা যায় । সুবিমল আবার অন্য গোত্রের । সাধারণ ভাবে ক্ষুধা , নিঃসঙ্গতা , আতঙ্ক , অনিশ্চয়তা , শৃঙ্খলাহীনতা ও ব্যক্তির নৈরাজ্য এঁদের গল্পের বিষয় ।

তবে প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য তিনজনেরই ভিন্ন । বাসুদেবের গল্পের জগৎ রূপক ও রূপকথার । সুভাষের প্রতীক ও কোলাজ - চিত্রলতা নগরজীবনের মাটি ও আকাশকেই আঁকড়ে ধরে । আর সুবিমল ব্যক্তি জীবনের কতকগুলি অনুভূতির বর্ণনা বিস্তার করেন । মাঝে মঝে ঢাকার উপভাষা সুবিমলের গদ্য বা পদ্যের মাধ্যম হয়ে ওঠে । বাসুদেবের গল্পরস , সুভাষের চিত্ররস আর সুবিমলের বাঙাল রসিকতা হাংরি সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ ।

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনে মলয় রায় চৌধুরীর ক্ষুদ্র নাটকগুলি এবং ফাল্গুনী রায়ের ক্ষুদ্র চিত্রনাট্য গুলির উল্লেখ করতে হবে । ইল্লত (১৯৬৩) হিবাকুষা (১৯৬৪), নপুংপং (১৯৬৫) নামে তিনখানি নাটক মলয় লিখেছিলেন। তিনটি নাটকই অ্যাবসার্ডধর্মী । আধুনিক সমাজের ছবি , রাষ্ট্রযন্ত্রের একাধিপত্য , ব্যক্তির অসহায়তা ও প্রতিবাদ ইত্যাদি সব কিছুকেই মলয় এখানে নিজস্ব ভঙ্গী ও ভাষায় তুলে ধরেছেন । এ ছাড়া নারীকে মলয়ের নাটকে যন্ত্র , জন্তু ও মানুষের সংমিশ্রণে গড়া হয়েছে । এই নারী এই কালের নানা অসুখে তাড়িত ।

ফাল্গুনী রায়ের নাটকের মধ্যেও অ্যাবসার্ডিটি প্রধান । উপরন্তু সেখানে আছে নগ্নতা , মাদক দ্রব্য ও মধ্যবিত্ত নরনারীর মানসিকতার ছবি । ফাল্গুনীর নাটক বা চিত্র নাট্যগুলি আবার কাব্যধর্মীও । যীশুখ্রীষ্ট, বাইবেল, গীতা, জা পল সার্ত্র থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা - কী নেই ফাল্গুনীর এইসব রচনায় । সে যাই হোক , মলয় বা ফাল্গুনীর এই রচনা গুলি প্রচলিত গোত্রের নয় এবং কিছু কিছু অংশে যে বেশ আকর্ষণীয় তাতে সন্দেহ নেই । ফাল্গুনী রায়ের নাটক ও চিত্রনাট্যগুলি হল (১) কালো খ্রীষ্ট (১৯৬৭) ; চিত্রনাট্য : (২) অন্তিম জরায়ু (১৯৭২) (৩) মানুষ মানুষী (১৯৬৭) । এভাবে কবিতা , গল্প , নাটক রচনার মাধ্যমে হাংরি লেখকরা একদিকে যেমন সৃজনশীল সাহিত্য রচনার ধারাটিকে সচল রেখেছিলেন , অন্যদিকে তেমনই লিফলেট , প্রবন্ধ পুস্তিকা ছেপে তাঁদের জীবনাদর্শ , সাহিত্যাদর্শকে একটি তাত্ত্বিক মান্যতা দেবার চেষ্টা করেছিলেন । সেই সব রচনায় হাংরি সংগঠকদের , প্রধানত মলয় রায়চৌধুরী ও শৈলেশ্বর ঘোষের গভীর মননশীলতা ও জীবনবোধের পরিচয় মেলে । আমাদের গ্রন্থের প্রথমপর্ব তৃতীয় অধ্যায়ে সেই সব আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে ।

আজ থেকে প্রায় ৪৪ বছর আগে যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল আজও তার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি - এর অনুসন্ধান খুবই জরুরি । অথবা আন্দোলন চলাকালীনই বা তার কতটুকু ভূমিকা ছিল - এসব বিচার করা দরকার । লক্ষ করা গেছে যে , সে সময় হাংরি জেনারেশন আন্দোলন পূর্ববর্তী পত্রিকা 'কৃত্তিবাস', সমকালীন পত্রিকা 'শ্রুতি', 'এই দশক', 'কবিপত্র' প্রভৃতিকেও সংক্রামিত করেছিল । এমনকি বাংলাদেশেও 'sad Generation' নামে একটি ক্ষীণজীবী আন্দোলনের সহায়ক হয়ে উঠেছিল ।

পঞ্চাশ ও ষাট দশকের কবি , কবিতাপত্রকে যেমন হাংরি জেনারেশন আন্দোলন প্রভাবিত করেছিল , তেমনই সত্তর ও আশির অনেক কবি-ই হাংরিদের অনুসরণ করেছেন । পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ প্রভৃতি নানা জায়গায় হাংরি জেনারেশন সাহিত্য আন্দোলন এক ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে । যদিও হাংরিদের বিট জেনারেশন বা অ্যাংরি ইয়ংমেন মুভমেন্টের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবু দেখা যায় যে , এই আন্দোলনের বীজ ছিল ভারতবর্ষের একটি বিশেষ রাজনৈতিক ও অর্থসামাজিক পটভূমির বিবিধ কার্যকারণের মধ্যে । এই আন্দোলন ছিল স্বকীয়তায় ভরা। তাই বাংলা ভাষাভাষী নানা অঞ্চলে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন এত প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে । আমনকি অনেক প্রতিষ্ঠিত কবিকেও হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের অস্থিরতা স্পর্শ করতে পেরেছিল । তাঁদের কবিতায় সেই প্রকাশ মিলেছে ।

আসলে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন , বাংলাভাষায় দু ধরনের প্রভাব রেখে গেছে । একটা হচ্ছে আন্দোলনগত ; অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে সাহিত্য করবার জন্য যূথবদ্ধ আন্দোলন । অন্যটা হচ্ছে , সাহিত্যের বিষয় ও প্রকাশ ভঙ্গীগত । যার ফলে সমরেশ বসুর মতো লেখক বাসুদেব দাশগুপ্তের বসন্ত - 'উৎসব' গল্পের সাদৃশ্যে রচনা করেন 'বিবর' উপন্যাস । দুটি কাহিনীর নায়িকার নামই শুধু এক নয় , কাহিনী - প্রায় এক । হাংরিদের প্রভাবেই , বাংলা ভাষায় প্রাকৃত অপশব্দ , যৌনাঙ্গ কেন্দ্রিক শব্দ যেন জল চল হয়ে ওঠে । নবারুণ ভট্টাচার্যের, 'ফ্যাতারু' , 'কাঙাল মালসাট' প্রভৃতি উপন্যাস সে কথাই প্রমাণ করে । সাম্প্রতিক কিছু গ্রুপনাটকেও এসব শব্দের ব্যবহার হতে দেখি ।

মধ্যবিত্ত সংস্কার ভেঙে প্রান্তিক মানুষের যে জীবনযাত্রা ও আচরণকে হাংরিরাই গুরুত্ব দিয়েছিলেন ফ্যাতারু তো তারই প্রতীক। এখনও পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ হতে পেরেছেন হাংরিরাই। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক আশ্রয় নেবার প্রয়োজন আজ পর্যন্ত তাঁরা বোধ করেন নি । এটাও তাঁদের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক । যৌনতাকে সাধারণত বাণিজ্যকভাবে ব্যবহার করা হয় হাংরিরা কিন্তু তা করেন নি । রাজনীতিকে একটি বিশেষ মতবাদের কর্মকান্ড করে তোলা হয় । সে রকম রাজনীতিকেও হাংরিরা আশ্রয় করেন নি । অথচ নানাবিধ বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁরা কথা বলেছেন । অনেক সময় যৌন অভিব্যক্তির মধ্য দিয়েই প্রতিবাদ করেছেন তাঁরা । কিন্তু লক্ষে তাঁরা মানবতাবাদী হওয়ায় যৌনতা একটি অস্ত্র হয়ে উঠেছে । হাংরিদের মূল্যায়নে এসবও খুব গুরুত্বপূর্ণ।